কত না অশ্রুজল

উৎসর্গ

স্নেহভাজন শ্রীমান ফণী দেব ও আমাদের উভয়ের সখা
শ্রীমান সাগরময় ঘোষের করকমলে—

এই পুস্তকের সব লেখাই "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বেরোয়। সে-সময় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগণিত চিঠি আমার কাছে আসে। তাদের অনেকগুলো "কত না অশ্রুজলে" ভরা ছিল। একাধিক মাতা, ভগ্নী আমাকে পুত্রের, ভ্রাতার শেষ পত্র পাঠান। বস্তুতঃ যখন "দেশ" পত্রিকায় অধমের "দেশে-বিদেশে" প্রকাশিত হয় তখনো এত পত্র আমি পাইনি।

সে-সব রচনা আমার বান্ধবী অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিরুপমা ও তাঁর সিঁথির সিঁদুর শ্রীমান্ পশুপতি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে সঞ্চয় করে, কেটে-ছেঁটে পুস্তকরূপে প্রকাশ করলেন। ওঁদের প্রতি আমি কি সাধুবাদ জানাবো! প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে উত্তমোত্তম লেখকের সম্পাদনা করেন।

পরিশেষে শ্রীমান্ ব্রজকিশোরের কল্যাণ কামনা করি। শঙ্কর তাকে জয়যুক্ত করুন।

সৈয়দ মুজতবা আলী

কত না অশ্রুজল

॥ ১ ॥

একখানা অপূর্ব সংকলনগ্রন্থ অধীনের হাতে এসে পৌঁচেছে। পুনরায়, বারংবার বলছি অপূর্ব, অপূর্ব! এ-বইখানিতে আছে, মানুষের আপন মনের আপন হৃদয়ের গভীরতম আত্মপ্রকাশ। কারণ মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ অতি অল্প অবস্থাতেই মিথ্যা কয় বা সত্য গোপন করে। এবং একটি দেশের একজন মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী নয়; বহু দেশের বহুজনের। ফ্রান্স, জর্মনি, ভারতবর্ষ, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফিনল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, চীন, জাপান, কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি—বস্তুত হেন দেশ প্রায় নেই যার বহু লোকের বহু কণ্ঠস্বর এই গ্রন্থে নেই।

যুদ্ধের সময় সৈন্য তো জানে না কোন্ মুহূর্তে তার মৃত্যু আসবে। সে যখন ঐ সময় ট্রেন্‌চে বসে আপন মা, বউ, প্রিয়া বা বোনকে চিঠি বা তাঁদের জন্যে ডাইরি লেখে তখনও সে মিথ্যা কথা বলছে, এ সন্দেহ করার মত সিনিক বা ব্যঙ্গপ্রবণ অবিশ্বাসী আমি নই।

এ বইয়ে আছে গত বিশ্বযুদ্ধে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সৈনিকরূপে একে অন্যকে নিধন করতে হয়েছিল, তাদের শেষ চিঠি, ডাইরির শেষ পাতা। এ বিশ্বযুদ্ধ থেকে অল্প দেশই রেহাই পেয়েছিল সে কথা আমরা জানি। শান্তিকামী ভারত, এমন কি যুদ্ধে যোগদান না করেও নিরীহ এস্‌কিমোও এর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

এবং শুধু তাদেরই লেখা নেওয়া হয়েছে যারা এ-যুদ্ধে নিহত হয় বা যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই মারা যায় কিংবা যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে শান্তিপূর্ণ দেশে বাস করার সময় যুদ্ধের বীভৎসতা, আত্মজন বিয়োগের শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু এত দীর্ঘ অবতরণিকা করার কণামাত্র প্রয়োজন নেই। দু'একটি চিঠির অনুবাদ পড়ে সহৃদয় পাঠক বুঝে যাবেন, এ-অবতরণিকা কতখানি বেকার।

গত যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে পর জর্মন সৈন্যরা সেখানে কায়েম হয়ে দেশটাকে 'অকুপাই' করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গড়ে

তোলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট'। তারা মোকা পেলে জর্মন সৈন্যকে গুলি করে মারে, রেল লাইন, তাদের বন্দুক-কামানের কারখানা ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং আরো কত কী! এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আপন দেশেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে একটি ষোল বছরের ফরাসী বালক জর্মনদের হাতে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে সে তার জনকজননীকে একখানি চিঠি লেখে। এবারে আমি সেটি অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"...আমার প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল, বিশেষ করে আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ো; তাদের বলো যে (মাতৃভূমি) ফ্রান্সের প্রতি আমার অনন্ত বিশ্বাস। আমার হয়ে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকারা, মাসীরা ও ওদের মেয়ে—আমার বোনেদের—প্রগাঢ় আলিঙ্গন করো। আমার পাদ্রিসাহেবকে বলো আমি বিশেষ করে তাঁকে ও তাঁর আত্মজনকে স্মরণে রেখেছি; আমি মসেন্নোর (প্রধান পাদ্রি)-কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাকে যে-ভাবে গৌরবান্বিত করেছেন, আশা করি, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। মৃত্যুর সময় আমি আমার স্কুলের বন্ধুদেরও আদর-সম্ভাষণ জানাই। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সঞ্চয়ন (লাইব্রেরিটি) পিয়েরকে,[১] আমার ইস্কুলের বই বাবাকে, আমার অন্যান্য সঞ্চয়ন আমার সব চেয়ে প্রিয় আমার মাকে দিয়ে গেলুম। আমার বাসনার ধন স্বাধীন ফরাসীভূমি এবং সুখী ফ্রান্সবাসী দম্ভী ফ্রান্স, পৃথিবীর সর্বাগ্রণী নেশন ফ্রান্স আমার কাম্য নয়; বরঞ্চ কর্মনিষ্ঠ ফ্রান্স,[২]—কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদাশীল ফ্রান্স। আমি প্রার্থনা করি ফ্রান্সবাসী যেন সুখী

একাধিক পাঠক অনুযোগ করেছেন, অধমের রচনা ইদানীং বড্ডই টীকা কণ্টকাকীর্ণ। আমার নিবেদন, টীকা না পড়লে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যাঁরা নিতান্ত একটু-আধটু আশকথা-পাশকথা জানতে চান কিংবা এই আক্রাগণ্ডার বাজারে 'বই' কিনেছেন বলে প্রতিটি পিঁপড়ে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে গুড় বের করতে চান—এ টীকা শুধু তাঁদের জন্য।

১ পিয়ের খুব সম্ভব পত্রলেখক আঁরির (Henri = Henry) ছোট ভাই। তাই পিয়েরকে তার ছোটখাটো পুস্তক সঞ্চয়ন দিয়ে যাচ্ছে।

২ ফ্রান্সে যুদ্ধ হবার পর অনেকেই বিশ্বাস করতো, ফরাসীদের আলসেমিই তাদের ঐ পরাজয়ের কারণ।

হয়—সেইটেই সব চেয়ে বড় সত্য। তারা যেন শেখে জীবনে শিবম্‌কে আলিঙ্গন করতে।[৩]

আমার জন্য তোমরা কোনো চিন্তা করো না; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার সাহস ও সহজ রসবোধ (গুড হিউমার) বজায় রেখে যাবো; আমি যাবার সময় সেই 'সাঁব্‌র্‌-এ-ম্যজ্‌'[৪] গানটি গেয়ে যাব, যেটি তুমি, আমার আদরের মা আমাকে শিখিয়েছিলে।

পিয়েরকে[৫] শাসনে রেখো কিন্তু স্নেহের সঙ্গে। আর লেখাপড়ার কাজ চেক্‌ আপ্‌ করে নিয়ো এবং সে যেন ঠিকমতো খাটে[৬] তার উপর জোর দিয়ো। তাকে আলস্য-অবহেলা করতে দিয়ো না। আমি যেন তার শ্লাঘার পাত্র হই। সেপাইরা আসছে আমাকে নিয়ে যেতে। আমার হাতের লেখা হয়তো অল্প একটু কাঁপা-কাঁপা হয়ে গেল; তার কারণ পেনসিলটি বড্ড ছোট্ট; মৃত্যুভয় আমার আদৌ নেই; আমার আত্মা অত্যন্ত শান্ত।

বাবা, আমি তোমাকে অতিশয় অনুরোধ জানাই, প্রার্থনা করো। শুধু এই কথাটুকু বিবেচনা করো, এই যে আমি এখানে মরতে যাচ্ছি, সেটি আমাদের সকলের জন্য। এর চেয়ে শ্লাঘনীয় আমার কী মৃত্যু হতে পারতো? আমি স্বেচ্ছায় পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ করছি; স্বর্গভূমিতে আমাদের চারজনাতে[৭] ফের দেখা হবে। প্রতিহিংসাকামীদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুগামী পাবে। বিদায় বিদায়! মৃত্যু আমাকে ডাকছে। আমার চোখে ফেটা বেঁধে আমাকে গুলি করবে সে আমি চাই নে, আমাকে হাতে-পায়ে বাঁধতেও হবে না। আমি তোমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলি, বাধ্য হয়ে মরাটা

৩ 'শিবম্‌কে আলিঙ্গন'—এটা মনে হচ্ছে, জর্মন কবি গ্যোটে থেকে উদ্ধৃত। পত্রলেখক আঁরি জর্মনদের হাতে নিহত হচ্ছে, অথচ সে বিশ্বপ্রেমিক বলে বিশ্বকবি—জর্মন-গ্যোটেকে উদ্ধৃত করছে।

৪ সাঁব্‌র্‌ এবং ম্যজ ফ্রান্সের দুই নদী। আমাদের যে-রকম গঙ্গা-যমুনা। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' তুলনীয়।

৫ এক নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৬ দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর দ্রষ্টব্য।

৭ স্বর্গে বাপ, মা, পিয়ের ও সে নিজে এই চারজন সম্মিলিত হবে আশা করছে।

কঠিন কাজ। সহস্র চুম্ব।

ফ্রান্স—জিন্দাবাদ!

ষোড়শ বৎসরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

এচ্ ফেরুতে

হাতের লেখা আর ভুলচুকের জন্য মাফ চাইছি; আবার পড়ার সময় নেই।

পত্র-প্রেরক: আঁরি ফেরুতে, স্বর্গলোক, কেয়ার অব ভগবান।[৮]

॥ ২ ॥

এবারে একজন জাপানীর চিঠি তুলে দিচ্ছি:

জিরুকু ইওয়াগায়া (Jiroku Iwagaya), শিক্ষক,

জন্ম ১৯২৩ সালে। ১৯৪৪ সালে ফিলিপাইন যাবার সময় যুদ্ধজাহাজ-ডুবিতে সলিলসমাধি।

শিজুয়োকা, ১২ জুন ১৯৪৩

বুগাঁভিস[১] দ্বীপের কাছে যে নৌযুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে। প্রকাশ, একখানা বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ও একখানা জঙ্গী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এভাবে মানুষ কেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে অতলে লীন হবে? জাপানীরা মারা গেলে শুধু জাপানীরাই, বিদেশীরা মারা গেলে শুধু বিদেশীরাই অশ্রুবর্ষণ করে কেন? মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে সম্মিলিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে না কেন, আনন্দের সময়

৮ কনটিনেণ্টে পত্রলেখককে তার ঠিকানা দিতে হয় (যেমন আমাদের ইনল্যাণ্ড-লেটার)। তাই আঁরি তার ঠিকানা দিয়েছে। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, সে যে গর্ব করেছে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি (তার) হিউমার বজায় রেখে যাবে, সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা দম্ভ নয়। কারণ এই কটি শব্দই ইহ-জীবনে তার শেষ বাক্য।

যে-বই থেকে এই পত্রটি অনুবাদ করেছি তার নাম-ঠিকানা:

Die Stimme des Menschen Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt। 1939-1945 Gesam melt und herausgegeben von Hans Walter Baenl Piper Verlag, 1961, Muenchen.

১ সলমন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ—অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।

সম্মিলিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না কেন? এ তত্ত্বটি যে-কোনো শান্তিকামী জনের চিত্ত আলোড়িত করবে। যেহেতু একটা বিদেশী মরেছে অতএব জাপানীরা বেশ পরিতৃপ্ত। এটা আমার কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। তিন দিন চার দিন ধরে একটা লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষটায় অবসন্ন হয়ে জলে ডুবে গেল এটা কী নিদারুণ! মৃত্যুর সঙ্গে আমার যদি সমুদ্রে কখনো দেখা হয় তবে কি আমি তাকে সজ্ঞানে চিনতে পারবো?

৩ মার্চ ১৯৪৪

বিদায় নেবার পূর্বে আমি ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে 'তাজিমামরি'[২] গানটি গাওয়ালুম। আমি জানি না কেন, এটি শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এ গানটি আমি কখনই ভুলবো না; এটি আমাকে সব সময়ই স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি শিক্ষক ছিলুম।

মার্চ ১৯৪৪

আমি যুদ্ধে চললুম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাইনি। হয়তো আমার এ কথাটা কেউই বুঝবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি কোনো তাগিদ অনুভব করি না। আমার মনে হয়, আমাকে যেন একটা দ' টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

একাধিক জাতের বিশ্বাস এবং তারা যুদ্ধের সময় প্রোপাগাণ্ডা করে যে, জাপানীমাত্রই যুদ্ধের জন্য হামেহাল মারমুখো। এ চিঠি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ-ধরনের আরো চিঠি আছে। স্থানাভাবে তার অল্পাংশও তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের চিঠি অনুবাদ মারফত বহুবিধ মানবের চিন্তাধারা, হৃদয়ানুভূতি—এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলি সর্বজনীন—এগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

যুগোস্লাভিয়ার জনৈক নাম-না-জানা সৈনিক,

অজাত শিশুর প্রতি পত্র,

[যুদ্ধের সময়ে]

হে আমার সন্তান, এখনো তুমি অন্ধকারে ঘুমুচ্ছো এবং ভূমিষ্ঠ হবার জন্য

---

২ 'তাজিমামরি' গীতটি আমি যোগাড় করতে পারিনি। কোনো গুণিন পাঠক যদি সেটি সংগ্রহ করে অনুবাদসহ প্রকাশক মহাশয়কে পাঠান তবে লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শক্তি সঞ্চয় করছো; আমি তোমার সর্বমঙ্গল কামনা করি। তুমি এখনো তোমার প্রকৃত রূপ (Gestalt) পাওনি; তুমি এখনো শ্বাসগ্রহণ করছো না; তুমি এখনো অন্ধ। তবু, যখন তোমার সে লগ্ন আসবে, তোমার এবং তোমার মাতার সে-লগ্ন আসবে (তোমার সে মাতাকে আমি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসি) তখন তুমি বাতাস এবং আলো পাবার জন্য সংগ্রাম করার মতো শক্তিও পাবে। আলোকের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করার অধিকার তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। সেই কারণেই তুমি নারীদেহ থেকে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবে, অবশ্যই তুমি প্রকৃত কারণ না জেনেই জন্মগ্রহণ করবে।

বেঁচে থাকতে যে আনন্দ আছে সেটাকে তুমি রক্ষা করো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিও। এই যে জীবন—এটাকে ভালোবাসা উচিত, নইলে এটা বৃথাই নষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে মাত্রাধিক ভালোবাসা উচিত নয়।

নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রেখো; মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত রেখো; অশিবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্জন করার মতো শক্তি সর্বথা হৃদয়ে ধারণ করো। আমি জানি, আমাকে এখন মরতে হবে, এবং তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং আমার যত সব ভুলত্রুটির জঞ্জালের উপর তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত যে তোমাকে এই অরাজক আরামহীন সংসারের পিছনে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ-ছাড়া তো কোনো গতি নেই। আমি কল্পনায় তোমার কপালে চুম্বন রাখছি —শেষবারের মতো তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য। গুড্‌নাইট, বাছা আমার —গুড্ মরনিং এবং শুভ প্রভাতে তুমি জাগ্রত হও।

মিসাক মানুচিয়ান, তুরস্ক।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি-ইয়মনে (তুর্কী—আরমেনিয়ায়) জন্ম; ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ প্যারিসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ [প্যারিস]

[আমার মৃত্যুর পর] যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাই ধন্য, কারণ তাঁরা মধুর স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ফরাসী জাতি এবং অন্যান্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী আমাদের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি জর্মন জাতের প্রতি কোনো ঘৃণা অনুভব করি না…প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী তিরস্কার পাবে। জর্মন ও অন্যান্য জাত যুদ্ধশেষে শান্তিতে, ভ্রাতৃভাবে জীবনধারণ করবে; এ-যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। বিশ্বজন সুখী হোক।

গভীর বেদনা অনুভব করি আমি যে, আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে, এবং তুমিও সব সময় তাই চেয়েছিলে। তোমার প্রতি তাই আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধের পর তুমি অতি অবশ্য পুনরায় পরিণয় করে সন্তান লাভ করবে।

আজ রোদ উঠেছে। এ রকম দৃশ্য আর সুন্দর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি তোমাকে নিত্যদিন কতই না ভালোবেসেছি। তাই বিদায় বিদায়! বিদায় নিচ্ছি এ জীবনের কাছ থেকে, তোমাদের সকলের কাছ থেকে, আমার প্রিয়াপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর থেকে, এবং আমার ভালোবাসার বন্ধুজনের কাছ থেকে। আমি তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করছি, তোমার ছোট বোনকেও এবং দূরের এবং নিকটের পরিচিত সর্ব বন্ধুজনকে।

॥ ৩ ॥

এ-কথা অনেকের কাছেই অবিদিত নয় যে, প্রাচ্যে মাতার প্রতি বয়স্ক পুত্রের যতখানি টান থাকে, পশ্চিমে—বিশেষ করে ফ্রান্স জর্মনি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে—পুত্রের টান তার চেয়ে অনেক কম। এসব দেশের কবিরা মাতার উদ্দেশে কবিতা রচেছেন অত্যল্পই। তার একটা কারণ বোধহয় এরা বিয়ে করে মা'র সঙ্গে বাস করে না—বউ নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। আমাদের বড় এবং মাঝারি শহরেও এ রীতি কিছুটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

তা সে যাই হোক, যুদ্ধের সময় অনেক সৈন্যই মাতাকে বার বার স্মরণ করে। হৃদয় খুলে তার সব কথা জানায়। তাই যুদ্ধের সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে লেখা চিঠিতে পাঠক মানব-হৃদয়ের নূতন নূতন মর্মস্পর্শী পরিচয় পাবেন।

যুদ্ধ তার রুদ্রতম নিকটতম বদন দেখায় সিভিল উয়োর বা ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় এবং আশ্চর্য সে সময় মানুষের করুণাধারাও যে কী রকম উছলে পড়ে সেটা বহু চিঠিতে বহুভাবে প্রকাশ পায়।

গত বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইতালিতে ভ্রাতৃযুদ্ধ চলেছে। এ চিঠিটি সে সময়কার।

রবের্তো নান্নি : ইতালি, বল্না স্কুলের ছাত্র।

জন্ম ১৯২৮। প্যারাশুট থেকে ভূপৃষ্ঠে সংঘর্ষে ২৮ মার্চ ১৯৪৫[১] সালে নিহত।

২১ জানুয়ারি, ১৯৪৫

(মাতাকে লিখিত)

আজ এই প্রথম য়ুনিফর্ম পরে গির্জের উপাসনায় আমি যোগ দিয়েছিলুম।[২] আর বিশ্বাস করো মা আমার হৃদয় কী অনুভূতিতেই না ভরে উঠেছিল। ছেলেবেলায় তুমি যে আমাকে সঙ্গে করে গির্জেয় নিয়ে যেতে সে-সময়কার কথা ভাবছিলুম। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যত দিন যায় মানুষের বয়স বাড়ে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের গভীরে সে ছেলেমানুষই থেকে যায়। আমরা সমবেত কণ্ঠে 'অসংখ্য জনের প্রার্থনা গীতি' গাইবার সময় যখন পুণ্যময়ী 'মাতা'র নাম এল তখন শুধু যে আমারই দু'চোখ জলে ভিজে গেল তাই নয় আমার বন্ধুদেরও তাই হল। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার যে সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ পাবার অধিকার আমার আছে তার মূল্য আমি তখন বুঝতে পারলুম কারণ আমার বহু সাথীর পরিবারবর্গ শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আছে বলে তারা কোনো চিঠি পায় না।

আমার বিশ্বাস যে-নাম মানুষ বিপদের মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ডেকে ওঠে সে-নাম "মা"।

শত্রুপক্ষের যাকে আমি দু'বাহুতে করে ফার্স্ট এডের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম সে চেঁচিয়ে ডেকেছিল "মা"। যেতে যেতে তার মনের মধ্যে শুধু ছিল একটি মাত্র চিন্তা : তার মা। কাতর হয়ে আমাকে শুধোচ্ছিল, আমরা তার মাকে কিছু করিনি তো? আমি যতই 'না' বলছিলুম সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমাকে মিনতি জানাচ্ছিল আমি যেন সদা আমার মাকে অবশ্য স্মরণে রাখি, তোমার সম্বন্ধে খবর জানতে অনুরোধ করছিল, জিজ্ঞেস করছিল আমি তোমার কাছ থেকে চিঠি পাই কিনা, তোমার কোনো ফোটো আমার কাছে আছে

---

১ এর ঠিক এক মাস পরে ইতালিতে যুদ্ধের অবসান হয়। তাই ভাবলে দুঃখ হয় যে সতেরো বছরের ছেলেটির মা যখনই এ কথাটি ভাববে তখনই তার শোক কত না গভীর হবে।

২ জর্মন ইতালির ফ্যাসি সম্প্রদায় সৈন্যদের উর্দি পরে গির্জে যাওয়াটা পছন্দ করতো না। তারা গির্জেকে রাষ্ট্রের শত্রুভাবে দেখতো এবং উর্দি না পরে গির্জে যাওয়াটাও অতি কষ্টে বরদাস্ত করতো।

কিনা, কারণ তার আপন মায়ের কোনো ছবি তার কাছে ছিল না এবং তাই তোমার ফোটোতে সে তার আপন মায়ের ছবিও দেখতে চেয়েছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর[৩] নিয়ে যারা অবহেলার সঙ্গে আলোচনা করে—কণামাত্র জানে না ঐ দিন আমাদের পিতৃভূমির জন্য কী দুর্ভাগ্য আর পরিপূর্ণ বিনাশ নিয়ে এসেছে—তারা যদি আমি যা এইমাত্র বর্ণনা করলুম সে দৃশ্যের সম্মুখে থাকত! কারণ, বুঝলে মা, যে লোকটাকে আমি গুলি করে আহত করতে বাধ্য হয়েছিলুম, যাতে করে সে আমার উপর আগেই গুলি না করতে পারে; সে আর আমি তো একই ভাষাতে কথা বলি, এবং "মা" বলে সে ডেকে উঠেছিল, এই এখন আমি তোমাকে যে নাম ধরে ডাকছি…

এবারে একটি কবিতার গদ্যানুবাদ।

আমির হামজা: মালয়, রাজপরিবারজাত কবি।

জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১, সুমাত্রায়। যুদ্ধাবসানের অরাজকতার সময় ১৯৪৬ সালে সুমাত্রায় নিহত।

(প্রিয়মিলন তৃষ্ণা)

কী মধুর! হে সমারোহময় মেঘরাশির শোভাযাত্রা
তুমি ঢেকে নিয়েছো সুনীল আকাশের নীলাঞ্জন।
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে এই কুটিরের 'পরে
দূরের প্রবাসী তিয়াসী এক পথিকের কুটিরের 'পরে—
এক লহমার তরে, এক পলকের তরে—
আমি তোমাকে শুধু শুধোতে চাই,
তোমাকে হে মেঘ তোমাকে শুধোতে চাই
তুমি কোন্ দিকে যাবে মনস্থির করেছ?
কোন্ দেশে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে?
হে মেঘ, আমার প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও আমার বিরহ ব্যথা
তাকে কানে কানে বলো আমার বিরহ বেদনা
তার তরুণ সোনালী হাঁটু দুটিকে তুমি আলিঙ্গন ক'রো,
যেন আমি নিজে সে দুটিকে আলিঙ্গন করছি।

এ কবিতা তো আমাদের বহুদিনকার চেনা কবিতা!!

৩ ঐ দিনই প্রথম খবর প্রকাশ পায়, ইতালির রাজা তাঁর মিত্রশক্তি

॥ ৪ ॥

ইভান ভ্লাদ্‌কফ: বুলগারিয়া।

জন্ম দ্রিয়ানভো-তে ১লা জানুয়ারি ১৯১৫।

মৃত্যু ২২ নভেম্বর ১৯৪৩, বুলগারিয়ার পুলিস কর্তৃক নিহত।

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

যে একটি মাত্র বাসনা আমার আছে সেটি বেঁচে থাকার। তোমার শ্বাস চেপে ধরে বন্ধ করে দিল, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ধীরে ধীরে তোমার চৈতন্য লোপ পেল; গারদের কুটুরি আরো ছোট হয়ে গেল, এ-কুটুরিতে কখনো বাতাস ঢোকে না। তৎসত্ত্বেও বেঁচে থাকবার জন্য কী অদম্য স্পৃহা!

আর আমার ছোট ছেলেটি! এখন থেকেই সে আমার অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যে কথাগুলো সে আমায় বলেছিল সেগুলো এখনো আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে: বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমার জন্য একটা ট্রাম-লাইন কিনে দেবে আর ছোট একটি গাড়ি, আর এক জোড়া জুতো!

আমার পুত্র আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে। আমার আদরসোহাগ সে কামনা করে, আমার কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়। আমি যখন তাকে বললুম, এরা আমাকে তোর কাছে যেতে দেয় না, তখন সে আমাকে বলল, 'তুমি যে আমার কাছে আসতে চাও না, তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না—না বাবা?' শিশুসন্তানের এ কী সরল ভালোবাসা, তার আত্মাটি কত না বিরাট ভালোবাসা ধরতে জানে!

কিন্তু এই এঁরা যাঁরা আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এঁদের কি তবে শিশুসন্তান নেই? এঁরা কি নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন না, অন্যের প্রতি কি এঁদের কোনো সমবেদনা নেই? অতি অবশ্যই সর্বদাই এঁরা কোনো কিছু দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে জানেন। যখন তাঁদের উচিত আমাদের মৃত্যুর চরম দণ্ডাদেশ না দিয়ে লঘুতর দণ্ড দেওয়া—অন্য সর্ব কারণ বাদ দিয়ে হোক না সে শুধু আমাদের শিশুসন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে—তখন তাঁরা বলেন, শাসন-

জর্মনিকে ত্যাগ করে মার্কিন-ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছেন, ফলে দেশে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যে সৈন্য আহত হয় সে ছিল পার্টিজান দলের। (বর্তমান লেখকের ভেন্দেত্তা দ্রষ্টব্য)।

দণ্ডের আইন সে অনুমতি দেয় না। এ কী মূর্খতা! কিন্তু বোধ হয় এঁরা আপন শিশুসন্তানের প্রতি আমাদের মতো এ গভীর ভালোবাসা পোষণ করেননি। কারণ তাই যদি হত তবে তাঁদের আচরণ অন্য রকমের হত। আমার এখনো স্মরণে আসছে জেনারেল কচো স্টয়ানফের কথা—আমাকে কি বলেছিলেন: "বিচারকেরা সন্তানদের কথা স্মরণ রাখেন।" কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি নে, হয়তো কখনোই বুঝতে পারবো না, তাই যদি হবে, সন্তানদের কথা যদি তাঁরা স্মরণেই রাখেন তবে এ রকম দণ্ডাদেশ দেন কি প্রকারে?

'রাষ্ট্র শক্তিমান এবং রাষ্ট্র কাউকে পরোয়া করে না (ডিফাই)।' কিন্তু তাই যদি হবে তবে এরা আমাকে গুলি করে মারছে কেন?

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

পুত্রকে—

আমি জানি পিতৃহীন হয়ে তোমার জীবনধারণ কঠিন হবে এবং তোমাকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু যে-সমাজতন্ত্রের জন্যে আমি এ-জীবন আহুতি দিচ্ছি সে ব্যবস্থা আসবে[১] এবং তোমাদের জীবনযাপনের জন্য মহত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

তুমিও সংগ্রামী হও এবং ন্যায়ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তোমার মাকে ভালোবাসবে, হে প্রিয়পুত্র! জীবনের বিপদ-আপদে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

বুলগারিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি বড়ই জটিল। পাঁচশত বৎসর তুর্কদের কবলে পরাধীনতার পর বুলগারিয়া ১৮৭২-এ রুশদের সাহায্যে স্বাধীনতা পায়, কিন্তু গৃহ-যুদ্ধ লেগেই থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে বুলগারিয়ার জনসাধারণ ছিল রুশ-মিত্র, পক্ষান্তরে রাজা বরিস ও তাঁর ফৌজী অফিসাররা ছিলেন হিটলার-প্রেমী। কারণ এই রাজ্যবিস্তার-লোভী দলকে হিটলার অনেক লোভ দেখিয়ে হাত করেন এবং প্রকৃত-

১ কিন্তু পত্রলেখকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এর ঠিক এক বৎসর পর বিজয়ী রুশ সেনা নাৎসিদের বিতাড়িত করে বুলগারিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সময় বিস্তর নাৎসিমিত্র নবীন রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আশা করি, পত্রলেখক যে কামনা করেছিলেন এবারে সেটা পূর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ নবীন রাষ্ট্র পত্রলেখকবৈরী-নাৎসিমিত্রদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পূর্বে তাদের শিশু-সন্তানদের কথা ভেবেছিল।

পক্ষে সেখানে তাঁরই চেলাচামুণ্ডারা বুলগার অফিসারদের সাহায্যে নৃশংসভাবে রাজত্ব চালাতো। পত্রলেখক স্পষ্টত নাৎসিবৈরী জনসাধারণের অন্যতম ও নাৎসি-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

জনৈক জর্মন সৈন্যদ্বারা লিখিত :

হেরবের্ট্ ডুকস্টাইন : জর্মনি।

জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ মাগডেবুর্গ্।

মৃত্যু ২ জুন, ১৯৪৪, যোআন্নিনা, গ্রীস-এ যুদ্ধে নিহত।

গ্রীষ্ম ৯৪৪

ডিটমার বা মণিকা—আমার অজাত সন্তান!

যাত্রা এখনো আরম্ভ হয়নি—তোমার যাত্রা আমার যাত্রা কারোরই না। সেই বিরাট ঘটনার প্রাক্কালে আমরা উভয়েই প্রতীক্ষমাণ, তুমি তোমার—তোমার জন্মগ্রহণ করার, আর আমি আমার—যুদ্ধ এবং কাল-ঘূর্ণাবর্ত আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে। সেই হেতু এ-পত্র প্রধানত তোমার মায়ের উদ্দেশে লেখা—যে মাতা তাঁর আপন দেহ দিয়ে তোমার আমার মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করেছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি—যতদিন তোমার হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন তোমাকে নিয়তি-নির্দিষ্ট যে-পথে যেতে হবে সে-পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়।

আমার হৃদয় সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে, যতখানি শক্তি সে ধরে—কিন্তু হায়, সে-শক্তি বুঝিবা তার নেই যে তোমার বিরাট অভিযানের প্রথম পদক্ষেপগুলো দেখা যাবে—শুভেচ্ছা জানায় তোমার মাতাকে ইহসংসারে তোমার সর্বশ্রেয়া যিনি এবং তোমাকে—

—এখনো যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি, তোমার পিতা।

হ্স্যু হ্সিআও-হ্সিএ্যান, চীন।

১৯১৩-এ যুদ্ধে নিহত।

(একটি ক্ষুদ্র কবিতা)

সংঘ-প্রাচীরের পিছনে
আমাদের বন্ধুত্ব হল নিবিড়তর।
আমরা বিরাট বিরাট যত সব প্ল্যান করলুম
আমাদের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা ছিল সুদূরব্যাপী…

কিন্তু বিদায়ের সময় শুধু নাড়লাম মাথা—
একটি মাত্র কথা না বলে—একে অন্যের দিকে।
কেন না সেনাবাহিনী তখন এসে দাঁড়িয়েছে
প্রাচীর দুর্গতোরণের সম্মুখে ॥

॥ ৫ ॥

যুদ্ধের সময় মাতারাই যে তাদের সন্তান হারিয়েছে তাই নয়, শিশুও মাকে হারিয়েছে—বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময়। তাই এ-যুদ্ধে মাকে লেখা মেয়ের চিঠিও আছে।

হিটলার গদীতে বসার আগে থেকেই তাঁর শত্রু কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচারের নামে পরিহাস করা হত বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই বিনা-বিচারে কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্‌পে বন্ধ করে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হত।

যুদ্ধ না লাগলে হয়তো হিটলার হিমলার এদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন না। কিন্তু হিটলার রুশ-রণাঙ্গনে যতই হারতে লাগলেন ততই তাঁর নিষ্ঠুরতা জিঘাংসা উত্তেজিত হতে লাগল—এই বিদ্রোহী পক্ষের প্রতি। হিটলার তখন স্ত্রী-পুরুষে আর কোনো পার্থক্য রাখলেন না। এমন কি নবজাত শিশুর মাতাও তাঁর বর্বরতা থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী হান্‌স্ কপ্‌পিসহ স্ত্রী হিল্‌ডে কপ্‌পি গ্রেপ্তার হন। এঁরা দুজনেই হিটলারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সোস্যালিস্ট ছিলেন। কারাগারে হিল্‌ডে একটি শিশুপুত্রের জন্ম দেন। পিতার নামেই এই শিশুর নামকরণ করা হয় 'হান্‌স্'—এ রেওয়াজ পৃথিবীর বহু দেশে আছে। 'ছোট' হান্‌সের ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক মাস পর পিতা 'বড়' হান্‌স্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মাতা হিল্‌ডেকে আট মাস পরে ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্ট। তখন তাঁর বয়স ৩৪।

মাতাকে লেখা কন্যার পত্র

আমার মা, গভীরতম ভালোবাসার মা-মণি,

সময় প্রায় এসে গিয়েছে যখন আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। এর ভিতর কঠিনতম ছিল আমার ছোট হান্‌সের কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়া—সেটা হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে কী আনন্দই না

দিয়েছে! আমি জানি, সে তোমার স্নেহনিষ্ঠ মাতৃহস্তে অতি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ পাবে এবং আমার তরে মা মণি—প্রতিজ্ঞা করো—তুমি সাহসে বুক বাঁধবে। আমি জানি, তোমার বুকে বাজছে, এই বুঝি তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে, কিন্তু তুমি নিজেকে শক্ত করে নিজের হাতে চেপে ধরো—খুব শক্ত করে। তুমি ঠিক পারবে—তুমি তো কঠিনতম বাধাবিঘ্নের সামনে সর্বদাই জয়ী হয়েছ—এবারেও পারবে না মা? তোমার কথা যতই ভাবি, তোমাকে যে নির্মম বেদনা আমি দিতে যাচ্ছি সেই কথা—এটাই আমার কাছে সব কিছুর চাইতে অসহনীয়—এই ভাবনা যে, জীবনের যে-বয়সে আমাকে দিয়ে তোমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তখনই আমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে। তুমি কি কখনো—কোনো দিন—আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? তুমি তো জানো মা, আমার যখন বয়স কম ছিল—অনেক রাত্রে ঘুম আসতো না—তখন যে-চিন্তা আমার মনকে সজীব করে তুলতো সেটা—আমি যেন তোমার আগে ও-পারে যেতে পাই। এবং তার পরবর্তীকালে আমার মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল; সে আকাঙ্ক্ষা দিবারাত্র, জানা-অজানায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো—এ সংসারে একটি সন্তান না এনে কিছুতেই আমি মরবো না। তা হলে দেখো মা, আমার এই দুই মহান কামনা এবং তাই দিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণ সফলতা পেয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি আমার বড় হান্‌সের মিলনে। ছোট হান্‌স্—আমি আশা ধরি—আমাদের দু'জনার ভিতর যা ছিল ভালো, সেইটে পেয়েছে। এবং যখনই তুমি তাকে তোমার বুকে চেপে ধরবে, তোমার এই শিশুটি সর্বদাই তোমাকে সঙ্গ দেবে—আমার চেয়ে বেশী, আমি তো আর কখনো তোমার অত কাছে আসতে পারবো না। ছোট হান্‌স্—আমার আশা—যেন সুদৃঢ় শক্তিশালী হয়, সে যেন মুক্তহৃদয় হয়, দরদী সেবাশীল হৃদয় ধরে এবং তার বাপের অকলঙ্ক ভদ্রচরিত্র পায়। আমরা একে অন্যকে নিবিড়, বড় নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলুম। প্রেমই আমাদের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

শক্তি দিয়ে যুঝে যেবা দেহ করে দান,
প্রভু রাখে তার তরে মহান নির্বাণ॥

মা আমার, আমার অদ্বিতীয়া কল্যাণী মা, আর আমার ছোট হান্‌স্—আমার সর্ব ভালোবাসা সর্বকাল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; সাহস ধরো—আমি যে রকম সাহস রাখবো বলে দৃঢ়প্রত্যয়।

নিত্যকালের
তোমার মেয়ে হিল্‌ডে

মাতাকে নিহত করে যারা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে তাদের কি নাম দিয়ে ডাকি? হিটলার সর্বদাই ইহুদি বেদের পরিচয় দিতেন তাদের Untermensch = Undermen নাম দিয়ে অর্থাৎ মানুষ যে স্তরে আছে ইহুদি বেদে তাদের নিচের স্তরে। তাই তাদের গ্যাসচেম্বারে পুরে মারা হয়। অথচ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার থেকে বলতে পারি, এই দুই জাতই মাতা মাত্রকেই অবর্ণনীয় অসাধারণ প্রীতিস্নেহের চোখে দেখে। এইবারে পাঠক চিন্তা করুন Untermensch পদবী ধরার হক্ক সবচেয়ে বেশী কার?

মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে হিল্‌ডের যে দুটি চরম কামনা ছিল সে-দুটি পূর্ণ।

আর সান্ত্বনা দিই যে তাকে দীর্ঘকাল বৈধব্যশোক সইতে হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন ঐ কটি মাসই তার কি করে কেটেছিল? আর ঐ কটি মাসেই তার পিতা বড় হান্‌স্ কী গর্ব, কী বেদনাই না অনুভব করেছিল!

আর সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে মাত্র ন'মাসের শিশু মাতৃবিচ্ছেদের শোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন, সে যে মাতৃদুগ্ধ না খেয়ে অন্য দুগ্ধ খাচ্ছে সেটা কি সে ইন্‌স্‌টিন্‌ক্ট দিয়ে (অনুভূতি-জাত সরাসরি জ্ঞান) বুঝতে পেরেছিল?

মনকে যতই চোখের ঠার মারি না কেন, যতই সান্ত্বনা খুঁজি না কেন এ-চিঠি গিলতে গিয়ে আমাদের সর্ব বুদ্ধি বিবেচনা সর্ব অনুভূতি চেতনা অসাড় হয়ে যায়।

এই পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয় কন্যা মৈত্রেয়ীর অনুজা। তিনি অমৃতের সন্ধানে ইহবৈভব ত্যাগ করেছিলেন (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহমং তেন কুর্যাম্)। ইনি মাতা ত্যাগ পুত্র ত্যাগ করলেন সত্যশিবের সন্ধানে।

এই অতিশয় অসাধারণ পত্রের পর অন্যের পত্র কি পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে? কি আমি তো কোনো ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করার জন্য চিঠিগুলি বাছাই করে করে ফুলের তোড়া সাজাচ্ছি না। যেমন যেমন পড়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করছে সেগুলো অনুবাদ করে দিচ্ছি এবং আমি বাঙালী বলে আশা করছি বাঙালী হৃদয়ও এগুলো গ্রহণ করবে।

তাই চীন দেশের একটি কবিতা।

বাচ্চাটির বয়স যখন পাঁচ তখন তার বাপ যুদ্ধে মারা যায়। এবং তাকেও কৈশোরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যুদ্ধে যেতে হল। কবিতাটি ঈষৎ মডার্ন স্টাইলে ক্লাশ-ব্যাক করে রচিত। মডার্নদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না; ভূমিকা

হিসেবে উপরের দুটি ছত্র লিখতে বাধ্য হলুম প্রাচীনপন্থী পাঠকদের জন্য।

য়েন য়ুই : চীন।

যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আহত, তারই ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

(সমরাঙ্গনের পুরোভূমিতে তরুণ)

এ তো এক ফোঁটা ছেলেমাত্র—আর এরি মধ্যে যুদ্ধ।
হিম্মতে সে ভরপুর তবু হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরছে।
তার বয়স তখন মাত্র পাঁচটি হেমন্ত – যখন বাপ যুদ্ধে মারা গেল।
বাড়ি দৈন্যে ঢাকা পড়লো, খাদ্য বস্ত্র খেলনা নেই।

ছেলেটির বয়স ক্রমে চোদ্দ হল, তাকেও যুদ্ধে নিয়ে গেল।
দুঃখ বেদনায় মাতৃহৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।
সমস্ত গ্রীষ্মকাল জুড়ে চললো রক্তপাত আর বহ্নি-দাহনের তাণ্ডব,
ছেলের সংবাদ—সে কোন সুদূরে মরে গেছে না জয়ী হবে ?

তখন—বিদায় নেবার সময় হায় রে নিষ্ঠুর নিয়তি—
ছেলেটি জামাকাপড় পরেছিল বাচ্চাদের মতন তখনো।
তারপর সে বাড়ি ফিরলো—বাপেরই মতো হয়েছে লম্বা
মায়ের চোখের দিকে তাকালো, মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়লো।

চোখের জল ঝরে পড়ে মায়ের কাপড় দিলে ভিজিয়ে
অতীত কি কেউ কখনো ভুলতে পারে ?
বাপ যা চেয়েছিল ছেলেকে সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হল
আবার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল— একটি কথাও বলে নি সে ॥

॥ ৬ ॥

জাঁদরেল থেকে জোয়ান—তা তিনি জর্মন হন বা ফিনই—বস্তুত যারাই রুশদের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে কষ্টসহিষ্ণুতা আর দার্ঢ্যে রুশ সৈন্যের জুড়ি নেই। যে অবস্থায় অন্য যে-কোনো দেশের সৈন্য ভেঙে পড়বে —বোধ হয় একমাত্র জাপানী ছাড়া—সেখানে রুশ জোয়ান খানিকক্ষণ ঘাড় চুল-কোবে—কোনো কিছু ঠিক ঠিক ঠাহর করতে তার বেশ একটু সময় লাগে—

তারপর এক হাতের তেলোতে আর এক হাত দিয়ে যেন অদৃশ্য ধুলো ঝাড়ছে ঐ 'মুদ্রাটি' এঁকে বলবে 'নিচ্চিভো'। 'ইট ইজ নাথিং', 'ডাজ্‌নট ম্যাটার'-এর দূরের অনুবাদ। 'কুছ পরোয়া নহী' 'কৈ বাত নহী' তবু অনেক কাছের অনুবাদ।

কিন্তু দার্চ্য—ঐটেই আসল কথা। কিন্তু ঐটেই কি শেষ কথা?

(কবিতা)

সেমেন গোদসেন্‌কো : সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জন্ম ১৯২২। মে ১৯৪২এর যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে ১৯৫৩ সালে মৃত্যু।

কুড়িটি বচ্ছর আমাদের বয়স হল,
তারপর এই যুদ্ধের বৎসরে,
সর্বপ্রথম আমরা দেখলুম রক্ত, দেখলুম মৃত্যু—
সরল, সোজাসুজি, মানুষ যে রকম স্বপ্ন দেখে অক্লেশে।
আমার স্মৃতিপট থেকে কিছুই মুছে যাবে না;
যুদ্ধে প্রথম মৃত জনের সঙ্গে দেখা,
বরফের উপর প্রথম রাত্রি যাপন, শীতে জমে গিয়ে
একে অন্যকে পিঠ দিয়ে ঘুমুলুম।
আমি আমার পুত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব মৈত্রীর দিকে—
তাকে যেন কক্‌খনো যুদ্ধ না করতে হয়—
সে যেন আমাদের মতো কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে
মিত্রগণের সঙ্গে ধরণীর বুকে পা ফেলে চলে।
সে যেন শেখে : ন্যায্যভাবে
রুটির শেষ টুকরো ভাগাভাগি করতে।
...মস্‌কোর হেমন্ত, স্মলেনস্‌কের শীত ঋতু,
আমাদের অনেকেই মারা গিয়েছে।
কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ঝঞ্ঝা, বসন্তের ঝঞ্ঝা
পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এই নব ফাল্গুন।
বিরাট যুদ্ধ এই করে
মানুষের বুকের পাটা ভরে দেয় সাহস দিয়ে।
মুষ্টি হয় দৃঢ়তর, বাক্য হয় গুরু-ভার।
এবং বহু কিছু তখন হয়ে যায় পরিষ্কার।
...কিন্তু এখনো তুমি বুঝতে পারো নি—
এই সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি হয়েছি আগের চেয়ে কোমলতর।

অর্থাৎ বাইরের কার্যকলাপে, সংগ্রামে শান্তিতে রুশজন যতই দার্ঢ্য ধরুক না কেন অন্তরে সে পুষে রাখে কোমলতা, করুণা, মৈত্রী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিশ্বাস ধরি।

আধুনিক রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। কাজেই বলতে পারবো না, কবি গোদসেন্‌কো রুশ দেশে কতখানি খ্যাতিপ্রতিপত্তি ধরেন। তবে তাঁর আর একটি কবিতা আমার বড় ভালো লেগেছে।

বাইরে যতই বড়ফট্টাই করুক না কেন, হিটলারের অনেক চেলাই যে ভিতরে ভিতরে গড্‌ড্যাম্‌ কাপুরুষ ছিল সেইটে কবি প্রকাশ করেছেন অতি অল্পতেই। ভল্‌গা-অঞ্চলের স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ তখন (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজন, এমন কি জর্মন জাঁদরেলরাও তখন জেনে গিয়েছেন যে জর্মনির জয়াশা আর নেই। জয়াশা ত্যাগ করে মুণ্ডহীন দেহে যত্রতত্র বিচরণ করাটা তখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ছিল না। কবিতাটি স্তালিনগ্রাদে লেখা।

স্তালিনগ্রাদ, মে—নভেম্বর, ১৯৪৩

ফেব্রুয়ারি শেষ হল।
নীলাকাশ
দেওয়ালের ফুটোগুলোর ভিতর দিয়ে
যেন চিৎকার করছে।
প্রতি চৌরাস্তায় তীরের চিহ্ন—
জর্মন সৈন্যদের পথনির্দেশ করছে
কোথায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
এ তো ইতিহাস।
এ তো স্মরণের কাহিনী।
সংগ্রামের চিৎকার ভল্‌গা-অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছে।
এখন, কিভাবে ইস্কুলগুলো ফের বানাতে হবে
তাই নিয়ে দিবারাত্তির মহকুমা-শহরে গভীর আলোচনা হচ্ছে
বাচ্চারা নিয়ে এল অতিশয় সযত্নে
একখানা বেঞ্চি—কোনো জখম-চোট লাগে নি
যেন কাঁচের তৈরি পলকা মাল,—মাটির নিচের ঘর থেকে।

…সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল
—হঠাৎ-আলোতে-অন্ধপ্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল
এক জর্মন সৈন্য।
ওঃ! কী কাঁপতে কাঁপতে সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।
তার ওভারকোট ছেঁড়া, টেনা টেনা—পা দুটো নড়বড়ে।
ঐ শেষ জর্মন সৈন্য স্তালিনগ্রাদে।
একদা বার্লিনে সে যে হামাগুড়ি দিতো হুবহু সেইভাবে।

(নাৎসি-প্রধানদের সম্মুখে—অনুবাদক)

এভাল্ট্ ফন্ ক্লাইস্ট-শ্নেনৎসিন।
জন্ম ২২ মার্চ ১৮৮৯।
ফাঁসিতে মৃত্যু ১৫ এপ্রিল ১৯৪৫।

জনৈক ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানের পত্রাংশ। ইনি হিটলারের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন :

'ভগবানের দিকে যে জাত যতখানি নিয়োজিত করেছে, সেই দিয়ে তার মূল্য বিচার করতে হয়। একটা অ-ক্রিশ্চান জাতও ক্রিশ্চানদের তুলনায় (যেমন আমরা—অনুবাদক) ভগবানের অনেক নিকটতর হতে পারে। আজকের দিনের ক্রিশ্চানরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে।'

॥ ৭ ॥

কনসানট্রেশন ক্যাম্পের (ক. ক) কেলেঙ্কারি কেচ্ছা এতদিনে হটেনটটরাও শুনে গিয়ে থাকবে কিন্তু তার 'গৌরবময়' যুগে সে তার কীর্তিকলাপ এতই ঢেকে চেপে সারতে পেরেছিল যে সাধারণ নিরীহ জর্মন ক-ক'র ভিতরে কি হয় না-হয় সে সম্বন্ধে নানা রকম গুজব শুনতে পেতো বটে, পাকা খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। তদুপরি সুবুদ্ধিমান জর্মন মাত্রই জানতো, এ-বাবদে অত্যধিক কৌতূহল প্রকাশ করা আপন স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃষ্টতম পন্থা নয়। যেমন ১৯৪৫-এ যখন যুদ্ধ জয়ের কোনো আশাই ছিল না তখন হিটলার-হিমলার আইন জারী করেন যে, কেউ যদি বলে যে এ-যুদ্ধে জর্মনির জয়াশা নেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে ; ঐ সময় এক জর্মন তার বউকে গোপনে বলে, 'যুদ্ধে জয়লাভ করার ভরসাটা বরঞ্চ ভালো।

মুণ্ডহীন ধড় নিয়ে হেথাহোথা ছুটোছুটি করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদপেই ভালো নয়।'

গল্পটি সেই সময়কার।

ট্যুনিস আর শ্যেল দুই নিরীহ, সদাশান্ত জর্মন। দু'জনাতে দোস্তী। পথিমধ্যে দেখা। ট্যুনিস শুধোলে, 'হ্যাঁ রে শ্যেল, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বল তো!'

'হুঁ : : !'

'সে কি রে? কথা কইছিস না কেন? আমি তো শুনলুম, তোকে কনসান-ট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে তো নানান কথা শুনি! কি রকম ছিলি সেখানে?'

শ্যেল বললে, 'ফার্স্ট ক্লাস। উত্তম আহারাদি। পরিপাটি ব্যবস্থা। সকালে বেড্-টী। জামবাটি ভর্তি চা। একটি আপেল, দু'খানা খাস্তা বিস্কুট। তারপর আটটা-ন'টায় ব্রেকফাস্ট। ডাবরভরা সর-দুধ, কর্‌নফ্লেক, চাকতি চাকতি কলা, উত্তম মধু। সঙ্গে তো টোস্ট, মাখন, চীজ আছেই। তারপর দু'খানা অ্যাব্‌বড়া আস্ত মাছ ভাজা—ফ্রেশ মাখমে। তারপর দুটো ফুল-সাইজ পোচ, ডিম ভাজা বা মমলেট—যা তোর প্রাণ চায় - বেকন সহ, কিংবা হ্যামও নিতে পারিস। তারপর—'

ট্যুনিস সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললে, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ন'সিকে খাঁটি কথা কইছি। ক-ক'র বাইরে বসে তোরা তো নিত্যি নিত্যি খাচ্ছিস lunch-এর নামে লাঞ্ছনা, supper-এর নামে suffer। আমরা খাচ্ছিলুম…' পুনরায় সসিজ, কটলেট, এস্‌পেরেগাস, চিকেন্ রোসটের সবিস্তর বর্ণনা।

ট্যুনিস বললে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। হালে ম্যুলারের সঙ্গে দেখা। সেও মাস ছয় ক-ক'তে কাটিয়ে এসেছে। সে তো বললে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। সে বললে—'

বাধা দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে শ্যেল বললে, 'বলতে হবে না, সে আমি জানি। তাই তো বাবুকে ফের ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

শ্যেল আর ওখানে ফিরে যেতে চায় না। তাই ইংরিজিতে যাকে বলে সে তার বর্ণনা-টোস্টে প্রেমসে লাগাচ্ছে প্রয়োজনাতিরিক্ত গাদা গাদা মাখন।

কিন্তু শ্যেল-বর্ণিত ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছিল ক-ক'তে তবে ভিন্ন ভাবে। যাকে বলে—

উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম।
কালে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম॥

১৯৪৫-এর মে মাসে যুদ্ধশেষে বিজয়ী রুশ সেনা যেমন যেমন জর্মনির অন্তর্দেশে ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে ক-ক'র বন্দীদের খালাস ক'রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করলো—কারণ এই বন্দীরা ছিল হিটলারবৈরী, জার্মানের দুশমন।

ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে চিঠি লিখছে এক চেকোস্লোভাক বন্দী। চিঠিখানি দীর্ঘ। আমি কাটছাঁট করে অনুবাদ দিচ্ছি:

য়ারোস্লাভ য়ান পাউলিক; চেকোস্লোভাকিয়া।
জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।
মৃত্যু ১৩ মে ১৯৪৫।

উত্তর জর্মনি, মে ১৯৪৫

ওলাফ ঝড়ের বেগে, যেন হোঁচট খেয়ে ঢুকলো আমার গারদে। রুপোলী চুলে মাথাভরা ওলাফ। খোঁড়া-পা ওলাফ, তার ক্রাচ ছুটিয়ে নিয়ে। তার সেই মধুর হাসি হেসে সে আমায় আলিঙ্গন করলে।

মুক্তি মুক্তি মুক্তি।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

আমরা সবাই এখন মুক্ত, স্বাধীন। এমন কি ডাকাত, খুনীরাও মুক্তি পেয়েছে। সবাই মিলে লেগে গেল আশপাশে ডাকাতি লুটতরাজ করতে। আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না। ঐ যে পেটুক ম্যুলার বলে, আমি ওসব ব্যাপারে একটা আস্ত বুদ্ধু। তদুপরি আমি ভুগে ভুগে অত্যন্ত দুর্বল; রোগে কাতর, সর্ব নড়নচড়নে অথর্ব। আর এই হট্টগোলের মাঝখানে এই প্রথম অনুভব করছি সেটা কতখানি। এদিকে আসছে বাসন বাসন ভর্তি আলু, রুটি, চিনি। অমুক (পত্রলেখক ইচ্ছে করেই নামটা ফাঁস করেন নি—অনুবাদক) একটা খাসা, বেড়ে সুটকেস লুট করেছে—ভেতরে আছে, শার্ট-কলার-গেঞ্জি-রুমাল এবং চিনি, কোকো, সিগার, মাখন, এক বোতল 'হৃদয়ভেদী' ব্র্যাণ্ডি, হেনেসি ব্র্যাণ্ডির চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার সোওয়াদটা আমার জিভে এখনো লেগে আছে।

ওদিকে আঙিনার উপর ডাঁই ডাঁই আলু। তন্দুরের ভিতর গাদা গাদা পাঁউরুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তৈরি হয়ে উড়ে উড়ে বাইরে চলে আসছে। পেপে আমাকে একটা ছেঁড়া স্বেটার, একটা ছোরা আর এক জোড়া জুতো

দিয়েছে (ক-ক'র বন্দীরা দুরন্ত শীতে খড়, ন্যাকড়া দিয়ে পা বাঁধতো—অনুবাদক)। সত্যিকার জুতো! যতই চেয়ে দেখি প্রাণটা কী যে আনন্দে ভরে আসে!

রুশ সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ি, বাইসিকল আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 'নমস্কার, নমস্কার! কি রকম আছেন?' (জ্‌দ্রাসভুইয়েতে, কাক্ পজিভাইয়িতে?) বলছে তারা। তারা তাদের গাড়ি থেকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে সিগরেট, রুপোলী-মোড়কে প্যাঁচানো ৫০ গ্রামের তামাক, মিষ্টি, মাখন-চর্বি, টিনের যাবতীয় খাদ্য, প্যাঁজ, টুথ-পেস্ট, দুধের গুঁড়ো, সিরাপ।

সকালবেলা খেলুম; আণ্ডাবেকন, জামবাটি ভর্তি পরিজ, সঙ্গে বিস্তর মার্মালেড, রুটি মাখন প্যাঁজ, সত্যিকার কফি, চিনিসহ।

(দ্বিতীয় চিঠি)

হয়েছে। আমার একটি অনবদ্য, পুরো পাকা আমাশা হয়েছে। ফরাসী পাচকরা কালকের দিনে যা রেঁধেছিল (ঐ সময়ে একাধিক ফরাসী পাচকও ক-ক'তে বন্দী ছিল ও দ্রব্যাদি তথা মালমসলা পেয়ে বহুদিন পর মুখরোচক জিনিস তৈরি করছিল—অনুবাদক)—কলিজা-ভাজা তার সঙ্গে সরে-দুধে মাখানো আলুভাতে, তাবত বস্তু প্যাঁজ-ফোঁড়নে, ওঃ সে কী সুন্দর, কী মধুর!

এখন আমাকে কি করতে হচ্ছে, ঐ সবের সামনে দাঁড়িয়ে?

দুধ আর আঙুর রস! ঐ আমার পথ্যি।

দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে।

হায় আমার খিদে নেই, রুচি নেই।

আমার প্রিয়া, আমার ছোট্ট বউটি এখন কি করছে, কি ভাবছে?

কাল তাকে পাবার জন্য আমার বুক যা আকুলি-বিকুলি করছিল।

মনে হচ্ছে, এইবারেই নাক-বরাবর ওরই দিকে ছুটে যাবো।

হায়, যুদ্ধশেষের পাঁচদিন পরই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

॥ ৮ ॥

ভিন্ন ভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে।

জর্মনির দুই নম্বরের মোড়ল হারমান গ্যোরিঙ যখন বন্দী অবস্থায় ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমায় আসামী তখন জেলের গারদে যে সব মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে নিতেন। এক মোকায় তিনি বলেন,

'তোমরা মার্কিন। ইয়োরোপীয় জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝবে কি প্রকারে? শোনো:

একজন ইংরেজ—শিকারী (স্পোর্টস্‌ম্যান)

দুজন ইংরেজ—একটা ক্লাব স্থাপনা,

তিনজন ইংরেজ—হার ম্যাজেস্‌টি কুইনের জন্য একটা কলোনি জয়।' তারপর হেসে বলতেন,

'একজন ইতালীয়—গাইয়ে,

দুজন ইতালীয়—ডুয়েট গাইয়ে,

তিনজন ইতালীয়—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন!' হাঃ হাঃ হাঃ।

'এবারে শুনুন,

একজন জর্মন—পণ্ডিত,

দুজন জর্মন—একটি নূতন পলিটিকাল পার্টি স্থাপনা (এ-বাবদে অবশ্য আমরা, বাঙালীরা এখন হেসে খেলে জর্মনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি)।

তিনজন জর্মন? হাঃ হাঃ—বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা!' তারপর ফিসফিস করে বলতেন, 'আর জাপানীরা?

একজন জাপানী—রহস্যময়!

দুজন জাপানী—সেও রহস্যময়!

তিনজন জাপানী?' এখানে এসে গোয়েরিঙ 'রহস্য'পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন, তারপর বলতেন,

'তিনজন জাপানী—সেও রহস্যময়।' বলেই ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য করতেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাল্লুকী থাবা দুটো দিয়ে তাঁর বিশাল উরুতে থাবড়াতেন—যে উরুর একটা দিয়ে অক্লেশে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের দুটো কোমর হোতে পারে।

আমার এবং আমার বন্ধুজনেরও ঐ ধারণা। যেন অনুভূতির কোনো বালাই-ই জাপানীদের আদৌ নেই। কিন্তু পরের পৃষ্ঠার চিঠিটি পড়ুন:

গরু কিকিয়ু

জন্ম : ১৯১০

মৃত্যু : ফিলিপিনের যুদ্ধে, ২০ আগস্ট, ১৯৫৪

স্ত্রী য়াকোকে লেখা :

মানচুরিয়া

বেশীদিন তো হয়নি তোমার সঙ্গে ছিলুম অথচ ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গ পাবার জন্য আবার আমার কী দুরন্ত আকুলি-বিকুলি। আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি অল্পকালই, তবু তোমার সে-সময়কার চলাফেরা ওঠাবসার কত না ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আর সব চেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠো তুমি, যেখানে তুমি কোমল, মৃদু। আমাদের উভয়ের শিশুসন্তানটি জন্ম দেবার পর থেকে তুমি আরো সুন্দর হয়ে উঠেছো। তোমার সৌন্দর্যে যেটুকু শুষ্কতা ছিল সেটা রসঘন হয়ে গিয়েছে, তুমি পেয়ে গেলে এক নবীন পবিত্র সৌন্দর্য—মাতৃত্বের সৌন্দর্য। আমার স্মরণে আছে সেদিনকার ছবি, যেদিন আমি টোকিও ছেড়ে চলে এলুম —সামান্য একটু প্রসাধন করে তুমি তখন বসে আছো খাটের উপর।

তখন কী সরল হাসিটি তোমার! অথচ যখন তুমি আমার কল্যাণ কামনা করে বিদায় নিতে এলে আমাদের আঙ্গিনায়, তখন, এই বুঝি, এই বুঝি তুমি কান্নায় ভেঙে পড়বে। নিতান্ত সেই নীরবতা ভাঙবার জন্য আমি তোমাকে বললুম, 'সাবধানে থেকো।' তারপর আমি ইজুমি আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লুম। আমি তখন মনে মনে আমাদের বাড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ভাবনাচিন্তা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করছিলুম, আমার মাতৃভূমির সব-কিছু যেন সেই সময়েই অন্তর্হিত হল। আমার এই অনুভূতিটি তোমার পক্ষে বোঝাটা হয়তো কঠিন হবে কিন্তু তুমি আমার হয়ে একবার আমার এই অবস্থাটি কল্পনায় বুঝতে চেষ্টা করো। আকার মনে হয়েছিল, ঐ বিদায় মুহূর্তে যেন আমার দেহ উর্ধ্বপানে ধেয়ে গিয়ে অনন্তে চলে গেল।

কিন্তু এখন? আজ রবিবারের এই সকালে আমার সর্ব দেহমন ধেয়ে চলেছে তোমা পানে।

বুঝিয়ে বলি; আমার হৃদয় কামনা করছে, তোমার অক্ষিপল্লব মৃদু মৃদু স্পর্শ করতে, তোমাকে শান্ত আলিঙ্গনে ভরে নিতে। তুমি যখন স্মিতহাস্য করো তখন তুমি বড় সুন্দর এবং সবচেয়ে সুন্দর তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি। হ্যাঁ, তোমার বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র নয়, কিন্তু মানতেই হবে, সে বর্ণ পরিপক্ক গোধূম বর্ণ—তোমার চর্ম

সম্পূর্ণ অকুঞ্চিত—কোমল। তোমার বক্ষ পূর্ণস্তন—মাতৃত্বের স্ফীতবক্ষ। এবং বর্ণ সেখানে প্রায় স্বচ্ছ শুভ্র। আমি তোমার বুকের উপর শিশুটির মতো ঘুমিয়ে পড়তে চাই। বহুবার কামনা করেছি, তোমার সুডৌল গোল বাহুতে মাথা রেখে আরাম লাভ করতে। তোমার সুন্দর সুবিন্যস্ত ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিতে দিতে আমি মৃদু হাস্য করি আর তুমি প্রত্যুত্তরে মোহনীয়া মৃদুহাস্য দিয়ে আমাকে জাদু করছো। এরকম ধারা যত আমার কামনা এগিয়ে যায় ততই তোমাকে কাছে পাবার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে। না—এরকম ধরনে আমি আর লিখতে পারবো না। এ লাইনটি পড়ে তুমি হয়তো হেসে উঠবে, কারণ এটা আমার স্বভাবের বিপরীত। কিংবা হয়তো তুমি আশ্চর্য হচ্ছো, তোমার কাছে আমার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে—নয় কি? কিংবা হয়তো ভাবছো, আমি শিশু—'বুড়ো খোকা' এবং তাই আমাকে সোহাগ করতে চাইছো—না?

এ-সব নির্মল স্মৃতি আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে আর সে-সময়কার কথা বার বার মনে পড়ে।

তোমার পূর্ণ বক্ষ আমার চোখের সামনে মায়াময় কায়া ধরে ফুটে ওঠে। আমার ইচ্ছে যায় যে নিটোল বক্ষে হাত বুলোই—ধীরে অতি ধীরে—তোমার মধুর নাসিকা, তোমার মুখ চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই। তুমি তখন মধুর হাসি হেসে উঠবে, আমাকে আদর সোহাগ করবে। বলো দেখি, অন্য কোথা; কোথায় আছে এই বিশ্বভুবনে, এরকম হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য?

সুস্থ শরীর-মনে থেকো। তোমার চিত্তটিকে সৌন্দর্যময়, প্রেমময় করে রেখো। এরকম যে-মা তার কাছে আমি ফিরে আসছি শিগগিরই।

আমাকে আলিঙ্গন করো, তোমার পূর্ণ বক্ষ, উষ্ণ স্তন দিয়ে।

একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকো—বাস, ঐটুকু শুধু।

হায়! বহু যুগ পূর্বে শ্রীরাধার সখী তাঁকে বলেছিলেন, 'ধৈর্যং কুরু, ধৈর্যং কুরু গচ্ছং মম মথুরাবে' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসেননি।

পূর্বে নিবেদন করেছি জাপানীরা রহস্যময়। কিন্তু এ চিঠি তো আদৌ রহস্যময় নয়। এ তো সেই রামগিরির বিরহী যক্ষ, মালয়ের কবি আমির হামজার মতো উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

আর এ-পত্রে প্রেম ও কামের কী অনবদ্য সমন্বয়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণ করে জর্মনি জয়ের জন্য ইংলণ্ড

তার তাবৎ কমনওয়েলথের এবং অন্যান্য সৈন্য সেখানে জমায়েৎ করেছিল। তারা এসেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আরো মেলা দেশ, এবং প্রধানত, সবচেয়ে বেশী আমেরিকা থেকে।

ঐ সময়ে জনৈক ক্যানাডাবাসীর পত্র—তার বউকে।

ডনাল্‌ড্‌ আলবেরট ডানকান, কানাডা।

১৯৪৪ সালে, জুলাই মাসের শেষের দিকে, ফ্রান্সে সৈন্যাবতরণের সময় নিহত।

ইংল্যাণ্ড ১৪ মে, ১৯৪৪

...ইংল্যাণ্ড এখন আর ইংরেজের (জমিদারী) নয়। এ-দেশটা এখন সম্পূর্ণ দখল করেছে মার্কিনরা। একই সঙ্গে চার-চারটে বেস্‌ বল খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে হাইড পার্কে। ইংরেজরা অবশ্যই অনেকখানি সহিষ্ণু, কিন্তু একথা নিশ্চিত মনে বলা যেতে পারে, তারা মার্কিনদের সঙ্গে গভীর পীরিতি-সায়রে নিমজ্জমান হয়নি! মার্কিনদের কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি! তদুপরি কেড়ে নিয়েছে ছুঁড়ীদের, বাসা বেঁধেছে সেরা সেরা হোটেলে। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংরেজও কড়ির তাগদে প্যারিসে তাই করেছিল। এই কলকাতাতেই আমরা মার্কিনদের সে রোওয়াব দেখেছি!) কিন্তু ইংরেজ করবে কি? ফ্রান্সে নেমে জর্মনিকে পরাজিত করতে হলে যে ইয়াংকিদের প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ড, ২৪ জুন, ১৯৪৪

...এসব তো হল, ওলো, প্রাচীন প্রিয়া (ওল্ড গারল)! বাচ্চাদের আমার হয়ে আদর দিয়ে বলো, আমি ইউরোপ থেকে ওদের জন্য সুন্দর টুকিটাকি নিয়ে ফিরে আসবো—যখন নিষ্প্রদীপ বিশ্ব আবার আলোকোজ্জ্বল হবে।

ফেরেনি। এক মাস পরে রণাঙ্গনে তার মৃত্যু।

॥ ৯ ॥

আডাম ফন্‌ ট্রটৎস্থ (Zu) জল্‌ৎস্থ, জর্মন।

জন্ম: ১৯০৯

মৃত্যু: ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বার্লিনের প্লোৎসেন্‌জে কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

ইহলোক থেকে মাতার কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

সবচেয়ে আদরের মা!

তবু ভালো, তোমাকে সামান্য কয়টি ক্ষুদ্র ছত্র লেখার সুযোগ শেষটায় আমি পেয়েছি—তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তুমি সব সময়ই আমার কাছে ছিলে, এবং এখনও আছ—আরও নিবিড় হয়ে কাছে আছ। তুমি আমি যে অনন্ত অনন্ত-কালীন যোগসূত্রে বাঁধা, আমি সেটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জোর আঁকড়ে ধরে আছি। এ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঈশ্বর আমাকে তাঁর দাক্ষিণ্য দিয়ে ভরে রেখেছেন এবং সব—প্রায় সব কিছুর জন্য—আমাকে আনন্দময় সরল-স্বচ্ছ শক্তি দিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ-জীবনে আমি কিভাবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কৃতকার্য হতে সক্ষম হই নি। কিন্তু এ-সবের চেয়েও সবচেয়ে বড় কথা: এই যে তোমাকে কঠিন শোক পেতে হবে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, এবং বৃদ্ধ বয়সে তুমি যে আমার উপর নির্ভর করতে, সেই নির্ভর থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

তোমায় আমায় আবার মিলন হওয়ার পূর্বে একটি শেষ চুম্বন—কৃতজ্ঞতা আর স্নেহে ভরা।

তোমার পুত্র তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসে।

—আডাম

"তোমার পূত আত্মায়, হে প্রভু আমি নিজেকে সমর্পণ করি…"

ইহলোক থেকে পত্নীর কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে, ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

প্রিয়া কণিকা ক্লারিটা,

দুঃখের বিষয়, সম্ভবত এই আমার শেষ চিঠি। আশা করি ইতিপূর্বে লেখা আমার দীর্ঘতর পত্রগুলো তোমার কাছে পৌঁচেছে।

আর কিছু বলার পূর্বে এবং সর্বোপরি আমি যা বলতে চাই: নিতান্ত অবাঞ্ছিত-ভাবে তোমাকে যে গভীর শোক দিতে হল, তার জন্য আমি মাফ চাইছি।

আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, আমি চিন্ময়রূপে পূর্বেরই মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, এবং দৃঢ়তম প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।

আকাশ আজ নির্মল, ঘন নীল (পীকক্ ব্লু) এবং গাছে গাছে মর্মরধ্বনি। আমাদের আদর-সোহাগের মিষ্টি মিষ্টি কথা বাচ্চা দুটোকে শিখিয়ো, তারা যেন

পরমেশ্বরের এ-প্রতীকগুলো বুঝতে পারে এবং তাদেরও গভীরে যে-প্রতীকগুলো আছে, সেগুলোও চিনতে শেখে।—কৃতজ্ঞতা সহ, কিন্তু গ্রহণ করার সময় যেন থাকে সক্রিয় বীর্যবান সাহস।

আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি।

তার পরও অনেক অনেক কিছু বলার রইল। কিন্তু তার জন্য আর সময় নেই।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন (আমাদের 'ঈশ্বর রক্ষতু'—অনুবাদক) আমি জানি, তুমি কক্ষনো পরাজয় স্বীকার করবে না। আম জানি, তুমি জীবন-সংগ্রামে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে, এবং যদিও সে-সংগ্রামে তোমার মনে হয় তুমি একা, তবু জেনো, আমার অদেহী স্বরূপ অহরহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি প্রার্থনা করছি, তুমি যেন শক্তিলাভ করো, তুমিও আমার জন্য সেই প্রার্থনা করো। এই শেষের ক'দিনে পুরগাতোরিয়ো এবং মেরি স্টুয়ার্ট পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল।...এ-ছাড়া পড়বার মতো এ ধরনের বিশেষ কিছু আমার ছিল না—কিন্তু মনের ভিতর অনেক-কিছু উল্টে-পাল্টে দেখেছি এবং শান্তচিত্তে সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছি। তাই বলছি, আমার জন্য অত্যধিক শোক করো না—কারণ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, সব কিছুই অত্যন্ত সরল, পরিষ্কার, যদিও সেগুলো গভীর বেদনাদায়ক।

আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে, এই যা সব ঘটলো, তার ফলে তোমাদের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন হল কি না? তুমি কি রাইনবেক্ যাবে, না যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে? অবশ্যই তাঁরা সকলে তোমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন—আমার প্রিয়া, ছোট্ট বউটি আমার! আমার পূর্বের পত্রগুলোতে তোমাকে বলেছিলুম আমার যে বহু বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে—এটা আমার অন্তরতম কামনা। তুমি ওদের সকলের সঙ্গে সুপরিচিত; তাই আমার সাহায্য ছাড়াও তুমি আমার শুভেচ্ছা ঠিকমতো তাঁদের জানাতে পারবে।

আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অনুভব করছি তুমি আমার সঙ্গে আছ।

ভগবান তোমাকে ও বাচ্চাদের আশীর্বাদ করুন।

তোমার প্রতি অবিচল প্রেমনিষ্ঠ,

—আডাম

এ চিঠি দুটি অন্যান্য চিঠির তুলনায় অসাধারণ বলে নাও মনে হতে পারে।

কিন্তু আডাম ছিলেন অতিশয় অসাধারণ পুরুষ। অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি ছেলেবেলা থেকেই এবং হিটলার তাঁর অভিযান আরম্ভ করার সময় থেকেই তিনি বুঝে যান, এই সব নীতি-বিবর্জিত অখ্রীষ্টান আন্দোলন জর্মনি তথা তাবৎ ইয়োরোপকে মহতী বিনষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আপন দেশে লেখাপড়া করার পর তিনি অক্সফোর্ডে রোড্‌স্ স্কলাররূপে বেলিয়েল কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। খোলাদিল সাদা মনের মানুষ ছিলেন বলে সে-সময় তিনি একাধিক ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। যুদ্ধের পর যখন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হচ্ছিল তখন তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু শ্রীযুত হুমায়ুন কবীরকেও মাল-মসলা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়।

হিটলারকে সরাবার জন্য গ্রাফ ফন্ স্টাউনফেনবের্গ তাঁর পায়ের কাছে, টেবিলের তলায়, পোর্টফোলিওর ভিতর একটি মারাত্মক টাইম বম্ রেখে বাইরে চলে যান। কিন্তু কিম্বৎ হিটলারকে বাঁচিয়ে দিল। যদ্যপি সেই কনফারেন্স-রুমের একাধিক লোক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, হিটলারের বিশেষ কিছুই হল না।

ক্রোধোন্মত্ত হিটলার এই চক্রান্তকারীদের উপর দাদ নেবার জন্য দোষী নির্দোষী প্রায় পাঁচ হাজার জনকে ফাঁসি দেন। আডাম ছিলেন স্টাউফেনবের্গের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁকে এই কর্মে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরও ফাঁসি হয়।

অসাধারণ দৃঢ়-চরিত্র ধরতেন বলেই আডাম তাঁর মা বউকে শেষ চিঠি লেখার সময় সজ্ঞানে যতখানি পারেন অনুভূতি চেপে রেখেছিলেন—পাছে ওঁদের মনে আরো না লাগে। অথচ তিনি লিখতে পারতেন বড় সুন্দর মরমিয়া জর্মন।

ঐ সময়ের অল্প পূর্বে একদল ছাত্র ম্যুনিকে প্রথমত গোপনে, পরে অর্ধপ্রকাশ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তারই একজন ধরা পড়ে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে তার মাকে লেখে—

'মা মণি,

তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি যখন আদ্যন্ত চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয় আমার সমস্ত জীবন একই রাস্তা ধরে চলেছিল যার অন্তে আছেন—স্বয়ং ভগবান। এখন কিন্তু শোক করো না, যে, রাস্তার শেষাংশটুকু আমাকে এক লম্ফে পেরুতে হল। শিগ্‌গিরই আমি এ জীবনে তোমার যত না কাছে ছিলুম, তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে চলে আসব।

ইতিমধ্যে তোমাদের সকলের জন্য একটি রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছি!'

মৃত্যুর প্রাক্কালেও এ-রকম চিঠি! এতখানি রসবোধ! ফাঁসিতে 'লম্ফ' দিতে হয় বই কি, আর স্বর্গপুরীতে মায়ের জন্য রাজসিক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবে সে।

॥ ১০ ॥

শিশুকন্যাকে লেখা মায়ের চিঠি।

রোজে (গোলাপ) শ্লোএজিন্‌গারের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাৎসীবিরোধী আন্দোলন চালানোর সময় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তিনি বন্দী হন এবং ৫ই আগস্ট ১৯৪৩-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর স্বামী বোডো শ্লোএজিন্‌গার ছিলেন জর্মন মিলিটারি পুলিসে দোভাষী। তাঁর স্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়েছে, এ খবর পেয়ে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

"আমার সোহাগের ক্ষুদে, দড়[১] মারিয়াননে

অনুমান করতে পারছি নে তুমি কবে এ চিঠি পড়তে পারবে। তাই এটি তোমার ঠাকুরমা বা বাবার কাছে রেখে যাচ্ছি, যাতে করে তুমি বড় হয়ে এটি পড়তে পারো। এখন তোমার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, কারণ খুব সম্ভব আমরা একে-অন্যকে আর দেখতে পাবো না।

তা সে যাই হোক না কেন, তুমি যেন স্বাস্থ্যবতী, সুখী এবং সবলা হয়ে বড় হয়ে ওঠো। আমি আশা করছি, পৃথিবী তার যে-সব সুন্দরতম জিনিস দিতে পারে সেগুলো তুমি উপভোগ করবে—আমি যে রকম উপভোগ করেছি—এবং তোমাকে যেন সে-সব দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে না যেতে হয়—যেগুলোর ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা: তোমাকে কর্মদক্ষ ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। এ দু'টি থাকলে বাকী সব আনন্দ-সুখ আপনার থেকেই আসে।

১ মূলে আছে ক্লাইন গ্রোস (ইংরিজীতে হবে লিট্‌ল্ বিগ) স্পষ্টত পরস্পর-বিরোধী। তবে জর্মনরা আদর করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকমধারা বলে। কিংবা হয়তো মেয়েটি বয়সে শিশু হলেও গঠনে দার্ঢ্য ধরতো, যার থেকে মা অনুমান করে যে, কালে সে তন্বঙ্গী না হয়ে পূর্ণাঙ্গী হবে।

তোমার স্নেহ-ভালোবাসা মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিয়ো না। এ সংসারে তোমার বাবার মতো কম লোকই আছে যারা তাঁর মতো সৎ এবং প্রেমে নির্মল। তাই সমস্ত প্রেম উজাড় করে দেবার আগে একটু ধৈর্য ধরতে শেখো। তা হলে প্রেমে ধোঁকা খাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু এমন একজন যেদিন আসবে, যে তোমাকে এতই গভীর ভালোবাসে যে, তোমার সর্ব যন্ত্রণা সেও সঙ্গে সঙ্গে সইবে—এবং যার জন্য তুমিও সইতে প্রস্তুত—এ-রকম পুরুষকে তুমি তোমার প্রেম নিবেদন করতে পারো। আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, তাকে পেয়ে তার সঙ্গে যে আনন্দ তৃপ্তি তুমি উপভোগ করবে তার থেকে তুমি বুঝতে পারবে, তার প্রতীক্ষায় তুমি যে ধৈর্য ধরেছিলে, সেটা নিষ্ফল হয়নি।

তোমার জন্যে আমি বহু বৎসরের আনন্দ প্রার্থনা করছি ; আমার কপাল মন্দ, আমি পেয়েছি অল্প কয়েক বৎসরই। এবং তোমাকে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হতে হবে : যখন তোমার নবজাত শিশুটিকে তোমার বুকের ওপর রাখবে তখন হয়ত আমার কথা তোমার স্মরণে আসবে। তোমাকে যখন আমি প্রথম বারের মতো দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম সেটি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত—তুমি তখন মাত্র একটি গোলাপী পুঁটুলি।

তার পরে স্মরণে আন, আমরা রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে জীবনের কত না গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি—আমি চেষ্টা করছিলুম তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। আবার স্মরণে আন, আমরা যে সমুদ্রপারে তিন হপ্তা কাটিয়েছিলুম—তিন মধুর সপ্তাহ। সেখানকার সূর্যোদয় এবং তোমাতে আমাতে খালি পায়ে বেলাভূমি বেয়ে বেয়ে বানসিন থেকে উকেরিৎস্ গিয়েছিলুম ; তারপর জলে রবারের দোলনাতে তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম ; তারপর আমরা দুজনাতে এক সঙ্গে বই পড়তুম। বাছা, তোমাতে আমাতে কতই না সৌন্দর্য উপভোগ করেছি এবং এগুলো তোমাকে নতুন করে উপভোগ করতে হবে, এবং তারও বাড়া অনেক কিছু বেশী।

হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটি কথা বলতে চাই, মৃত্যুবরণ করার সময় আমাদের মনে বড় বেদনা লাগে যে আমাদের প্রিয়জনকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি ; আমরা যদি দীর্ঘতর দিন বেঁচে থাকতে পারতুম তা হলে আমরা সেটা স্মরণে এনে নিজেদের অনেক বেশী সংযত করতে পারতুম। হয়ত আমার এ কথাটি তুমি স্মরণে রাখবে তাতে করে তোমার জীবন—এবং সর্বশেষে তোমার মৃত্যু—তুমি নিজের জন্যে এবং অন্যদের জন্যেও সহজতর করে তুলতে পারবে।

এবং যতবার পার সুখী হও আনন্দে থাক—প্রত্যেকটি দিন মহামূল্যবান!

যে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা [redacted] কাটাই তার জন্য হাহাকার!

আমার স্নেহ তোমার সমস্ত জীবনভর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছি—এবং যারা সব্বাই তোমাকে ভালোবাসে। বিদায়! বিদায়!! ও আমার সোহাগের ধন—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমারই কথা আমার গভীরতম স্নেহের সঙ্গে হৃদয়ে রেখে,

তোমার মা

॥ ১১ ॥

য়োরমা হাইসকানেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড

জন্ম: ৩১ জুলাই ১৯১৪

মৃত্যু: জুন ১৯৪১

সোভিয়েৎ-ফিন্ সংগ্রামে সীমান্তে নিহত সৈনিকের রোজ-নামচা থেকে উদ্ধৃত।

ডিসেম্বর ১৯৩৯ (ফিনিশ সীমান্তে) যুদ্ধের প্রথম দিনই আমি সুভিলাহতির গির্জা-চুড়োয় উঠলুম; সেখান থেকে আবার পর্যবেক্ষণ করবো সীমান্তে যেখানে সংগ্রাম চলচে…এখান থেকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ; অকস্মাৎ একটা চিন্তা আমাকে যেন ঝাঁকুনি দিল: ঐ যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদেরই একজন নিহত হতে পারে। তখন লক্ষ্য করলুম গির্জা-চুড়োতে আমি একা নই।

প্রতিরক্ষার জন্য রাখা একটা বালুর বস্তায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাবালক বাচ্চা—বয়স এই এগারো-বারো। পরনে চামড়ার কোট, হাতে একটা দুরবীন। ঐটে দিয়ে সে দক্ষিণ পানে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল—সেখান থেকে যুদ্ধের ক্ষীণ কোলাহল-ধ্বনি আসছিল। আমি তো অবাক—এ রকম অকুস্থলে তো ওর মতো ছোট্ট একটা বাচ্চার থাকার কথা নয়। বনের গাছগুলো ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠেছে এই গির্জা-চুড়ো; যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এটাকে হানতে পারে।

'এখানে তুমি কি করচো?'

বড় সুন্দর তাজা গলায় উত্তর এল: 'কেন? আমাকে তো জঙ্গী হাওয়াই জাহাজের গতিবিধি পাহারা দেবার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'তোমার বাড়ি কোথায় ?'

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হাউটাভারা-য়।'

আমি তাড়াতাড়ি শুধোলুম, 'তোমার বাপ মা··· ?'

অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, যেন এ নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না —'বাড়িতে বই কি !'

বাচ্চাটি আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকালে—দূরবীন দিয়ে তদারকী কর্ম সে তখনকার মতো ক্ষান্ত দিয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি আর কোনো প্রশ্ন শুধোতে পারছি নে। বাচ্চাটি কি জানে তার বসতগ্রাম হাউটাভারা শব্দার্থে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ? ঐ তো সীমান্তের শেষ গ্রাম। এটাতে কোনো সেনা-সেনানী নেই। কিন্তু ওরই উপর সকাল থেকে শত্রুপক্ষ সব কামান এক জোট করে গোলা হেনেছে। এ-গ্রাম তো সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই তো তার বাড়ি—সে বাড়ি কি আর আছে ? তার বাপ-মা পরিবারের আর পাঁচজন ? তাদের সঙ্গে এর কি আর কখনো দেখা হবে ?

কিন্তু সে কি জানে এ সব ? না, না, আমি এ-প্রশ্ন ওকে শুধোতে পারবো না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের আগুন আরো জোরে জলে উঠেছে।

'তুই কি এখানেই থাকবি না অন্য কোথাও যেতে চাস ?'

'কেন ? এখানেই তো আমার থাকবার কথা—নয় কি ? তবে আমাকে দিয়ে আর কোনো দরকার নেই ?' (অর্থাৎ সে চলে যেতে চায়নি—অনুবাদক)

বহুকাল ধরে তার এই শেষ কথাগুলো আমার কানে বেজে যেতে লাগলো— বহুকাল ধরে, তার কাছ থেকে, সেখানে থেকে বিদায় নেবার পরও।

জানেন শুধু ভগবান, এই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন শিশু যুদ্ধের তাড়নায় কোথায় ঘুরে মরেছিল—ফিনল্যাণ্ডের ডিসেম্বরের দারুণ শীতে—প্রভুই জানেন, সে অন্তত আশ্রয়টুকু পেয়েছিল কি না।

জেল থেকে বোনেদের প্রতি লেখা বোনের শেষ পত্র—কবিতায়।

···আটদিন ধরে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ
আমার এ অবস্থা কি কখনো ভুলতে পারবো ?

শেকলগুলো আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমাকে নির্জন কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে। হে প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করছো কেন ?…(খ্রীষ্ট নাকি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এই হাহাকারই করেছিলেন —অনুবাদক)

আমার বোনেরা—মিমি, মিনা—তোমরা কি এখনো তোমাদের বোন লোরেনস্‌কে স্মরণে আনো,

সে তোমাদের ভালোবাসে।

দুঃখবেদনা আমাদের সম্মিলিত করে একই পথে চালাবে,

এই তো ছিল আমাদের শপথ এবং একই অনুভূতি আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

আমাকে তারা শিকল দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু আমার হৃদয়টাকে নয়।

আমি আশা রাখি, আমি বিশ্বাস রাখি, আলোকে আলোকে আলোকিত সূর্যরশ্মিময় ভবিষ্যৎ।

কাল যদি আমার মৃত্যু হয় !

তবে কীই বা হবে ?

শুধু আমি মুক্তি পাবো আমার পায়ের শৃঙ্খল থেকে !

এই মেয়েটির নাম লোরেনস্‌—বোনেদের নাম মিমি মিনা। কিন্তু পারিবারিক নাম চিঠিতে নেই বলে এঁদের কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি। যেটুকু জানা গিয়েছে তা এই :

ফ্রান্স জয় করার পর জর্মনি তার বৃহদংশে আপন রাজত্ব চালায়। তখন সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগ্রাম চলে মাদমোয়াজেল লোরেনস্‌ তারই একজন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জেনে এই তার শেষ পত্র।

॥ ১২ ॥

রণদামামা বাজিয়ে সগর্বে যখন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন তখন তিনি বার্লিনের প্রধানতম রাজপথের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হলেন। তাঁর মনে পড়ল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সূচনার কথা। তখন কী

উৎসাহ-উত্তেজনার সঙ্গে কাইজারের সেই 'যুদ্ধং দেহি' আহ্বানে জর্মনির জনগণ সাড়া দিয়েছিল।[১] তারা যে এবারে—তাঁর এবং গ্যোবেল্‌স-এর কর্ণপটহবিদারক শত প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও—এরকম জড়ভরতের মতো চোখেমুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য মেখে পোলাণ্ডগামী যুযুধানদের দিকে শুধুমাত্র তাকিয়েই থাকবে—ঘন ঘন সাধুবাদ, করতালি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম-সঙ্গীত, প্রজ্বলিত মশালসহ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'কদম কদম বাড়িয়ে' তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানানো, সৈন্যদের ধরে ধরে পথমধ্যে তরুণী যুবতীদের যদৃচ্ছা চুম্বনালিঙ্গন—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সব ঝুট সব ঝুট—; হিটলার ও ইয়ার গ্যোবেল্‌স তো রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলেন।

আসলে জনগণ সংগ্রাম চায়নি; তারা চেয়েছিল শান্তি। বিশেষ করে হিটলার তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি-প্রসাদাৎ, বছর তিনেক পূর্বে দেশকে যে আর্থিক সাচ্ছল্য এনে দিয়েছিলেন তারা চেয়েছিল নির্বিঘ্নে শান্তিতে সেটি দীর্ঘকালব্যাপী উপভোগ করতে। আর ভবিষ্যতে সুখভোগের জন্য হিটলার যে সব গণ্ডায় গণ্ডায় অঙ্গীকার করে বসে আছেন, সেগুলোর তো কথাই নেই। তার অন্যতম: বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি জর্মনির চাষী মজুর প্রত্যেক পরিবারকে এক-একখানি সরেস 'ফল্কস্‌ভাগেন' (Volkswagen = folk-car = জনগণরথ) দেবেন—বস্তুত তখন থেকেই অনেকে আগাম কিস্তি-আমানত দিতে শুরু করেছে। মোটরগাড়ি তা হলে শিকেয় উঠলো!

বললে প্রত্যয় যাবে না, সুশীল পাঠক, এই যে জর্মনির প্রাশান অফিসার-গোষ্ঠীকে বহু বহু যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদেরও অধিকাংশই এ সংগ্রাম চাননি। এঁদের একাধিক জন সংগ্রাম আসন্ন জেনে, এরই এক বৎসর পূর্বে, হিটলারের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ তুলে নিরাশ হয়ে আপন আপন পদে ইস্তফা দেন। আর অর্থনৈতিকদের তো কথাই নেই। শাখ্‌ট্‌-এর মতো 'অর্থনৈতিক জাদুকর'ও যখন দেখলেন হিটলার তাঁর সাবধান-বাণী শুনলেন না তখন তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হিটলার ক্ষুদ্র রাজ্য পোলাণ্ডকে আক্রমণ করে যদি আশা করেন যুদ্ধ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে তবে সেটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক দুরাশা। সেই খণ্ড-যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত

১ হিটলার স্বয়ং সেই জনতায় ছিলেন। অধুনা এই মহানগরীতে প্রদর্শিত একটি 'হিটলার-ছবি'তে সেটি দেখানো হয়েছে। আসলে যে ফোটো থেকে এ অংশ তোলা হয়েছে সেটি পাঠক পাবেন, ফটোগ্রাফার হফমান রচিত 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড' পুস্তকে।

হবেই হবে। এবং সেই সুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বসংগ্রাম চালাবার মতো কাঁচা মাল-মেটিরিয়েল জর্মনির নেই। (এবং শেষটায় প্রধানত এই কারণেই হিটলারের পতন হয়, এবং তিনি ক্রোধোন্মত্ত স্যামসনের ন্যায় সমস্ত 'গাজা'—এস্থলে তাবৎ ইয়োরোপ—তাঁর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রসাতলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।)

শুনেছি, যেখানে হোক, যে-কোনো প্রকারেই হোক একটা লড়াই বাধিয়ে দেবার জন্য হামেহাল তেরিয়া হয়ে থাকে একটি গোদা দল—অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণকারী বিরাট বিরাট কারখানার মালিকগণ। শুনেছি এরা নাকি গ্যাটের কড়ি খরচা করে অনুন্নত দেশে সিভিল উয়োর লাগিয়ে দিয়ে পরে হরষিত হৃদয়ে উভয় পক্ষ-কেই বন্দুক কামান বোমা বিক্রি করে খরচার হাজার গুণ মুনাফা তুলে নেয়। (শকুনির যদি এ প্রকারের 'সুবুদ্ধি' থাকতো তবে সে নিশ্চয়ই গো-কুলে মড়ক লাগাত।)

এ স্থলে কিন্তু শুনেছি, সমরাস্ত্র-নির্মাণকারী জর্মনরাও হিটলারের যুদ্ধ কামনা করেননি। এঁদের অধিকাংশই জানতেন, এ যুদ্ধে জয়াশা নেই। ফলে মুনাফা তো যাবেই যাবে, তদুপরি শত্রুপক্ষ দেশ দখল করে এস্তেক কারখানাগুলোর সমূচা যন্ত্রপাতি—লক্ স্টক্ ব্যারেল—আপন আপন দেশে চালান দেবে।

তাঁরা অবশ্য তখন জানতেন না, ধন তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি লাগবে।

এবং তাও হয়েছিল—ইতিপূর্বে যা কখনো হয়নি—যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ এইসব ডাঙর ডাঙর অস্ত্রপতিদের বিরুদ্ধে জোর মকদ্দমা চালায়; রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদিকে ফাঁসি দেবার পর। জেল তো এঁদের অনেকেরই হয়েছিল—ফাঁসি হয়েছিল কি না, আমার মনে নেই। (অবশ্য শুনেছি, এখন ফের তাঁরা, অথবা তাঁদের বংশধররা—বন্দুক কামান তৈরি করে খনে বেচেন মিশরকে খনে ইজরাএলকে!)

এবং পাঠক আরও প্রত্যয় যাবেন না, হিটলারের আপন খাস চেলা-চামুণ্ডা-দের অনেকেই এ-যুদ্ধ চাননি!—মায় তাঁর দু'নম্বরী ইয়ার বিমান-বহরাধিপতি গ্যোরিং। এঁরা মোকা পেয়ে কলাকৌশলে তখন এতই ধনদৌলত জমিয়েছেন যে বার্লিনের কুট্টি সম্প্রদায় এঁদের চপ-বেচপের চাউস চাউস মেরৎসেডেজ মোটর দেখতে পেলে কখনো চেঁচিয়ে, কখনো আপসে মৃদুস্বরে বলতো 'মহারাট্শা!'—মহারাজা শব্দের জর্মন উচ্চারণ। গ্যোবেল্স তো একবার উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'এদের যদি এখন "জ্যুস্ প্রিমে নক্টিস্" দেওয়া হয় তবেই এরা সর্বার্থে মধ্যযুগের

। ১৩ ।

ব্যক্তিগত কথা বলতে আমার বাধে। কিন্তু প্রাগুক্ত মহিলা তাঁর শোক সংবরণ করে তাঁর সম-দুখে-দুখী হৃদয়ের প্রকাশ দেওয়াতে আমিও কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে আপন অভিজ্ঞতা নিবেদন করি।

আমি বার্লিন যাই ১৯২৯-এ। হিটলার তখন ম্যুনিকের স্থানীয় উষ্ণমস্তিষ্ক রাজনৈতিক পাণ্ডা মাত্র। ১৯৩০-এ আমি রাইনল্যাণ্ডের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। সেখানে হিটলারের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না বললেই চলে।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয় আমার এক সতীর্থ পাউল (Paul) হরস্টারের সঙ্গে। সে পড়তো আইন শাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী ও আরবী—ইচ্ছা ছিল ডক্টরেট নেবার পর ফরেন আপিসে ঢুকবে। আমারও অপ্-শনাল ছিল আরবী। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয় ও অত্যল্পকালের মধ্যেই গভীর সখ্য…। পাউলের বাপ-মা বাস করতেন নিকটবর্তী ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ শহরে। এক উইক-এণ্ডে সে আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। মা কখনো ইণ্ডিয়ান দেখেন নি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন স্থির করতে পারছেন না, আমার জন্য কোন্ কোন্ বস্তু রান্না করবেন। আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে—কোন্ একটা কথাচ্ছলে পাউল বললে যে আমার মা সুদূর ভারতে প্রতিদিন আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে। শোনা মাত্র পাউলের মা তাঁর দু'হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে ফের রান্নায় মন দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা ড্রইংরুমে কফি আর গৃহনির্মিত অতুলনীয় ক্রীমবান্ (পাটিসাপটার অতি দূর সম্পর্কের ভাই) খাচ্ছি এমন সময় একটি অতিশয় সুপুরুষ যুবক এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একটি সুন্দরী। কিন্তু এ-যুবক যত্রতত্র সর্বত্র যে রকম পুরুষ-নারী উভয়ের বিমোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সঙ্গের যুবতীটি ততখানি না। পর-স্পরের পরিচয়াদির লৌকিকতা অবহেলে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোজাসুজি আমার কাছে এসে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললে, 'আমি আপনাকে চিনি; পাউলের বন্ধু। আর আমি ঐ রাসকেলটার দাদা কার্ল। এবং এই রমণীটি আমার শিরঃপীড়া, অর্থাৎ আমার ভামিনী।'

আমি ঘন ঘন হাত ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললুম, 'আমার কাছে শিরঃপীড়ার

অত্যুত্তম ভারতীয় হেকিমী দাওয়াই আছে। দেব আপনাকে? কিন্তু ডাক্তারের ফীজ দিতে হবে। শিরঃপীড়াটি দূরীভূত হলে সেটি—অপরাধ নেবেন না, স্যর—সেটি কি আমি পেতে পারি?'

কার্ল তো তার পাঁজরের দু-পাশ দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে, কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে দুলে দুলে গমগম করে হাসে আর বার বার বললে, 'আমার তো ধারণা ছিল, পুরবীয়ারা (প্রাচ্য দেশীরা) রসিকতা করতে জানে না। সর্বক্ষণ মোক্ষ, নির্বাণ, স্যাল্‌ভেশনের চিন্তায় মশগুল!—তা, ব্রাদার, কিছু মনে করো না। আমার 'শিরঃপীড়া'র একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছেন—এক্কেবারে কামানের গোলা। গেল বছরে মিস্ রাইনল্যাণ্ড হয়েছেন। নেবে সেটি?'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম কার্লের বউ লজ্জায় একেবারে পাকা টমাটো।

ঝপ করে একটা সোফাতে বসে বললে, 'কিন্তু তোমাতে আমাতে আর "আপনি" চলবে না। বুঝলে? তারপর, হ্যাঁ, কি যেন বলতে এসেছিলুম। আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে পার্টি। পাউল তোমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে তো!'

আমি বললুম, 'অতি অবশ্যই। প্লেজার অনার! কিন্তু সেই যে আরেকটি শিরঃপীড়ার কথা বলছিলেন, তিনিও আসবেন কি?'

তারপর আর কার্লকে পায় কে? তার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না।

শেষটায় কার্ল তার বউকে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'মায়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নি।' তারপর বউকে ফিসফিস করে শুধোলে, 'ওকে তো ডাকা হয়নি। লাস্ট মোমেণ্টে আসতে পারবে কি? তুমি দেখো তো।'

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সোজা গিয়ে মায়ের কোলে দুম্ করে বসে পড়ল—ট্যারচা হয়ে। বাঁ হাত দিয়ে মায়ের বাঁ বাহু চেপে ধরে, ডান হাত দিয়ে মায়ের ঘাড় পেঁচিয়ে নিয়ে মায়ের গালে ঘন ঘন চুম্বন।

স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা বলছেন, 'ওরে গরিল্লা, ওঠ, ওঠ, আমার লাগছে!'

আমি জানতুম, তখন সে-ঘরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জন আমি—যদ্যপি আমি কোনো পীর প্যাকম্বর্ নই—নিতান্ত বিদেশী এবং তারো বাড়া ভারতীয় বলে। তাই আমি অক্লেশে বুঝতে পারলাম, কার্ল আমাকে ছেড়ে তার মায়ের কাছে চলে গেল কেন। সামান্য ড্রইংরুমে 'কে কার পাশে বসে, তাতে কিবা যায় আসে!' কিন্তু সে তার মা'কে বোঝাতে চেয়েছিল, যে-ই আসুক যে-ই থাক, তার কাছে তার মা-ই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

কার্লের বউ ক্লারা আমাকে বললে, 'আমার বোন নিশ্চয়ই আসবে। তার অন্য

এনগেজমেণ্ট থাক আর না-ই থাক।'

আমি বললুম, 'তার অন্য এনগেজমেণ্ট হয়তো তার লাভার, তার ইয়ংম্যানের সঙ্গে। তাকে নিরাশ করাটা কি উচিত হবে, এই আনন্দের দিনে ? তাকেও ডাকুন না—অবশ্য যদি আপনাদের অন্য কোনো অসুবিধা না থাকে।'

ক্লারা আমার দিকে বিস্মিত নয়নে তাকালে।

আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ঘাবড়াচ্ছেন যে আমাতে আর আপনার বোনের লাভারেতে খুনোখুনি হবে—না ? নিশ্চিন্ত থাকুন, কিচ্ছুটি হবে না। সে কি আপনার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেড়েছিল ?'

'এ যাবৎ করেনি। কেমন যেন গড়িমসি করছে ?'

দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললুম, 'আজ রাত্রেই সে প্রস্তাব পাড়বে।'

'? ? ?'

'আমি আপনার বোনের সঙ্গে একটুখানি ভাবসাব করতেই সে রেগে, চটে, হিংসায় জর্জর হয়ে, আমাকে ঢিড দেবার জন্য আজ রাতদুপুরেই সে প্রস্তাব পাড়বে। হল ?'

সে সন্ধ্যায় কার্লের বাড়িতে জব্বর পার্টি হল। আমার তিনটি জিনিস মনে আছে।

কার্ল যখন আমাদের নাচের জন্য পিয়ানো বাজাচ্ছিল তখন আমার নজর গেল তার হাত দু'খানির দিকে। সেই হাতের আঙুলগুলি তন্বঙ্গী দীর্ঘ, অথচ সেগুলির তুলনায় বাকি হাত আরো ছোটো। এতে যেন কোনো প্রোপরশন নেই। কিন্তু কী সুন্দর! এ-রকম হাতের বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। বার বার আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো আমার মায়ের হাত দুটি।

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি।

এমন সময় কে যেন আমার খাটের বাজুতে এসে বসলো। আধো ঘুমে শুধালুম, 'কে ?'

'আমি পাউলের মা। আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, এই যে আমার পাউল, সে সপ্তাহের ছ'দিন থাকে বন শহরে, প্রতি শনিবার ছুটে আসে আমার কাছে। আর বন তো এখান থেকে দূরে নয়। ডাকগাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ মাত্র। তবু আমি এই ছ'দিন কী ছটফটই না করি।

'আর তোমার মা ? তিনি থাকেন কত সমুদ্রের ওপারে।

'তাঁর দিন কাটে কি করে ?

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাস দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

তারপর আমার কপালে চুমো দিলেন। আমার মনে হল, এ তো আমারই মায়ের চুমো।

॥ ১৪ ॥

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে হিটলারের দল জর্মন পার্লিমেনটে এত অধিক সংখ্যক আসন পেয়ে গেল যে তার গুরুত্ব জর্মনির বাইরে তো বটেই, ভিতরে অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। কম্যুনিস্টরা ঠিক-ঠিকই বুঝেছিলেন কিন্তু স্তালিন তখন আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত এবং বিশ্বভুবনজোড়া প্রলেতারিয়া রাজ্য স্থাপনের সদিচ্ছা তিনি তখন প্রায় ত্যাগ করেছেন। জর্মন কম্যুনিস্টরা বাতুশকা স্তালিনের কাছ থেকে সাহায্য পেল অত্যল্পই।

পাঠক হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, আমার সতীর্থ পাউল হর্‌স্টারের অগ্রজ কার্ল কিন্তু ঠিক-ঠিক বুঝে গিয়েছিল, দেয়ালে কি লিখন লেখা হয়ে গেল—

'আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি কোন্ অভিশাপ গেল লিখি।'

১৯৩২-এর বড়দিনের পরবে গেলুম ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ।

রান্নাঘরে বসে কার্ল-পাউলের মা'র সঙ্গে রসালাপ করছি।

এমন সময় কার্ল এসে ঘরে ঢুকল। প্রথম মাকে গণ্ডা দুই চুমো খেয়ে আমাকে দিলে গণ্ডা খানেক। কুশলাদির লৌকিকতা বর্জন করে সরাসরি শুধালো—

'হেই, ভাইয়া, জর্মন পলিটিক্স কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিস ?—এক বছর তো হয়ে গেল এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে এসেছিস !'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'পফুই (অর্থাৎ ছিঃ !), এমন কথা বলতে নেই। মুখে ঘা ('কুষ্ঠ' ঘা-টা আর বললুম না) হবে। জর্মনি কাণ্ট-গ্যোটে, বেটোফেন-ড্যুরারের দেশ। কিন্তু, বাওয়া, তোমাদের পলিটিক্সের জট ছাড়ানো আমাদের গান্ধীরও কম্ম নয়। হালে একখানা চটি বই কিনেছি। জর্মনির ছাব্বিশ না আঠাশখানা পার্টির (বাপ্‌স !) ঠিকুজি-কুলজি দপে দপে তাতে বয়ান আছে। পড়েছিলুম কবে ! এখনো মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছে।'

পরম অবহেলা ভরে বললো, 'ছোঃ ! তোদের না থ্রী হান্‌ড্রেড মিলিয়ান গডেসেস্ আছে ! হিসেব রাখিস কি করে ? তোদের আবার 'লাকি' দেশ—কার্ড ইনডেক্‌সিঙের গব্বযন্ত্রনা সেখানে এখনো পৌঁছয়নি। তা সে-সব কথা

যাক্। ইতিমধ্যে তোকে একটি মহামূল্যবান সদুপদেশ দিচ্ছি—তোর সেই রাম-আহাম্মুখীর সাক্ষাৎ ডক্টরেট্-সার্টিফিকেট ঐ পার্টি পঞ্জীটি সিকি দরে বিক্রি করে দে—তোর চেয়েও প্রাইজ-ইম্বেসাইল এ-দেশে রাইন নদের সামোন মাছের মতো আবজাব করছে। নইলে শিকের হাঁড়িতে (ওদের ভাষায় মাটির নিচের সেলারের কয়লা গুদোমে) তুলে রেখে দে। দরকার মাফিক ওরই পাতা ছিঁড়ে ঘরের স্টোভে আগুন ধরাবি। কিন্তু সে-কথাও থাক। আসল তত্ত্ব কথাটা শোন্।'

তারপর সত্যি অত্যন্ত সিরিয়স মুখে বলল—কার্লকে এই প্রথম আমি গম্ভীর হতে দেখলুম—'বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জানিস, হিটলার রাইখস্টাগে অনেকগুলো সীট পেয়ে গিয়েছে ?'

আমি হেসে উঠলুম। এ-যেন পর্বতের মূষিকপ্রসব!

ইতিমধ্যে পাউল রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করলুম, আমার হাসির সঙ্গে হামদরদী দেখিয়ে দোহারের মতো স্মিত হাস্য সে করলো না—যা সে আকছারই করে থাকে। মায়ের মুখে কোনো ভাবের খেলা নেই।

কার্ল কোনো দিকে খেয়াল না করে আমাকে সরাসরি শুধোলে, 'তুই হিটলারের "মাইন কাম্পফ্" (বাঙলাতে মোটামুটি আমার সংগ্রাম) পড়েছিস ?'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'রক্ষে দাও বাবা! ও-বই আদ্যন্ত পড়া আমার কর্ম নয়। একে তো তোমাদের এই জর্মন ভাষাটি এমনই প্যাঁচানো-জড়ানো, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড, এবং নিদেন বিশ-ত্রিশটি লাইনের ন্যাজ না খেলিয়ে তোমাদের একটা সেন্‌টেন্স সম্পূর্ণ হয় না, তদুপরি তোমাদের ঐ হিটলার বাবু যেন মাথায় গামছা বেঁধে বেল্ট টাইট করে, মোজা উপর বাগে টেনে নিয়ে, গণ্ডারের চর্বির টনিক খেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছেন, সরল জিনিস কি কৌশলে দুরূহ করা যায়—অবশ্য আমার জর্মন জ্ঞান যা, সেটা তো "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট"! তবে, হ্যাঁ, বিস্তর হোঁচট খেয়ে চোট-জখম-হজম করে খাবলা মেরে মেরে মোদ্দা কথা কটি ধরে নিয়েছি।'

কার্ল "মাইন কাম্পফ্"-এর ভাষা বাবদ সায় দিয়ে বলল, 'তোর জর্মন ভাষা-জ্ঞানের কথা উঠছে না। ঐ আকাট ব্যাটা হিটলার তো আসলে কথা কয় পশ্চিম-অস্ট্রিয়ার অতিশয় চোতা জর্মন ডাইলেক্টে। তদুপরি তার গায়ে রয়েছে চেক রক্ত, কেউ বা বলে দু-চার ফোঁটা ভ্যাগাবণ্ড জিপসি "নাপাক" খুনও তাতে মেশানো রয়েছে। এ রকম দু'আশলা, সাড়ে তিন আশলা লোক, তদুপরি "উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে"—সে আবার লিখবে জর্মন! তা তার

লেখার ধরন যত না মারাত্মক, তার চেয়ে তার প্রোগ্রামটা ঢের ঢের বেশী মারাত্মক। ইহুদি জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, ফ্রান্স দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং সর্বশেষে রাশার বৃহদংশ দখল করে সেখানকার চাষাভূষোদের রীতি-মতো গোলাম বানিয়ে, যাকে বলে স্লেভ লেবার, জর্মনদের জন্য ফোকটে দেদার দেদার রুটি মাখন আণ্ডা বেকন লুট করতে হবে। সেও না হয় বুঝি, এই বিরাট দুনিয়ায় কত না তরো-বেতরো গুণ্ডা-গ্যাংগস্টার হয়—অতি অবশ্য আমার ধর্ম-বুদ্ধি এতে একদম সায় দেয় না, কিন্তু যে করাল বিভীষিকা আমি চোখের সামনে দেখছি সেটা এই যে, হিটলারের এই শয়তানী স্বপ্ন সফল তো হবেই না, মাঝখান থেকে লক্ষ লক্ষ জর্মন যুদ্ধে মারা যাবে, তাবৎ জর্মন দেশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এই যে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ব্রাদার কার্ল, এসবের অধিকাংশ ভোট পাবার জন্য পোলিটিক্যাল প্রোপাগ্যাণ্ডা। আমাদের রাজা ইংরেজ বলে, তাদের খেদমৎ করলে খুব শীগগিরই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাবো, কংগ্রেস বলে, ইংরেজকে তাড়িয়ে দিলে আমরা রাজা না, মহারাজা হয়ে যাবো। আমি অবশ্য জিনিসটা বড্ড ক্রুড ভাষায় বলছি। কম্যুনিস্টরা বলে—'

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, কার্লের মুখের উপর দিয়ে যেন একটা উড়ো মেঘের ছায়া পড়ে মিলিয়ে গেল। আমি শুধালুম, 'কার্ল, তুমি কি কম্যুনিস্ট?'

'এককালে ছিলুম। বছর দুই হল পার্টি মেম্বারশিপ রিজাইন দিয়েছি। ঐ সময় থেকে চাঁদাও আর দিইনি।'

'কেন?'

'সে কথা আরেক দিন হবে।'

গোটা ১৯৩১টা আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলুম যে, ড্যুস্‌ল্‌-ডর্ফ যেতে পারিনি। এমন কি ১৯৩১-এর বড়দিনটাতেও ফুরসত করে উঠতে পারলুম না।

১৯৩২ পরীক্ষা পাস করে জর্মনি ত্যাগ করার পূর্বে একদিনের তরে ড্যুস্‌ল্‌-ডর্ফ গেলুম হরস্টার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। আমার কপাল মন্দ, কার্ল শহরে ছিল না। বড় বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, বন হয়ে ইতালিতে এসে জাহাজ ধরলুম।

১৯৩২ কেটে গেল। পাউলের চিঠিপত্র পাই।

১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর বা কর্ণধার হলেন।

তার দু'মাস পরে পাউলের একখানা অতি ক্ষুদ্র চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। কার্লকে জর্মনির 'গোপন পুলিস' অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে নির্জন কারাবাসে রেখেছে। বেল পাওয়ার কোনোই আশা নেই। তার বিরুদ্ধে গোপন বা প্রকাশ্য কোনো আদালতে যে মকদ্দমা উঠবে তার সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ।

॥ ১৫ ॥

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফেরার পর ৩৩-এর সম্পূর্ণ বছরটি কাটাই দেশের ছোট শহরে মায়ের সঙ্গে। সুদীর্ঘ, প্রায় তিন বৎসরের পর ফের মায়ের কাছে ফিরে এসেছি। এর পূর্বেও, অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আমি মায়ের কাছে এসেছি পূজো আর গরমের ছুটিতে, মাত্র কয়েকদিনের, কয়েক সপ্তাহের জন্য। আমি পেয়েছি মায়ের সঙ্গ-সুখ, মাও পেয়েছে আমার সঙ্গ-সুখ—ফের আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, সেই আসন্ন বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ তলওয়ার সূক্ষ্ম একটি চুলে ঝুলছে অবশ্য অহরহ মায়ের মাথার ওপর। কে বেশী আনন্দ পেয়েছিল সেটির মীমাংসা আমি নিজে করবার হক্ক ধরি নে। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে-সব মাতা ও সন্তান আছেন তাঁদের হাতেই শেষ রায়ের জিম্মেদারী ছেড়ে দিলুম। আর যে-সব সন্তানের মা তাদের অল্প বয়সে স্বর্গলোকে চলে গেছেন সে-সব দুঃখীদের কথা আমি মোটেই ভাবতে চাই নে।

আমি জানি, আমার যে-সব পাঠিকা মা, তাঁরা আমাকে একটা মূর্খ ধরে নিয়ে (এবং আমি সে 'ধরে-নেওয়াটা'-র বিরুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ আপত্তি মুহূর্তেক তরে তুলবো না, কারণ আমার পিঠপিঠ দাদা এখনো আমাকে নিত্যনিয়ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ 'পদ্মভূষণে'র পরিবর্তে 'গণ্ডমূর্খ' 'অলিম্পিক ইডিয়েট' খেতাব দেয়) বলবেন, 'অতি অবশ্যই মাতা পুত্রের সঙ্গ-সুখ পুত্রের তুলনায় বহু গুণে, বহু উৎকর্ষে, বহুতর আনন্দ-ঘন চরমা তৃপ্তি পরমারাম পায়। শুধু তাই নয়, পুত্রের জন্যও সে সঙ্গে সঙ্গে এক মহামিলনের মহানন্দময় মহোৎসবের সৃষ্টি করে—কারণ মা তার স্বভাবজনিত নিঃস্বার্থপরায়ণতায় চায়, সন্তানও যেন তারই মতো—এমন কি তারও বেশী পরিপূর্ণানন্দ লাভ করে। কিন্তু সন্তান কি সেটা পারে? পুত্র যুবা। সে চায়, মায়ের ভালোবাসার বাইরেও অনেক-কিছু—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থবৈভব; তদুপরি সে কামনা করে অন্য রমণীর যৌবন-মদিরাভরা প্রণয়—এও কি তখন সম্ভবে, যে, সে তখন শিশুকালে যে-রকম একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মাতৃস্তন শোষণ করেছিল আজও সেই রকম তার মাতৃস্নেহসিক্ত সঙ্গসুজাত

আনন্দযজ্ঞ থেকে সেই প্রকারেই একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রতিটি মধুকণার সৌরভঘন আনন্দরস নিঃশেষে শোষণ করবে? সেই শিশু জন্মলাভের পরই মায়ের বামস্তন ওষ্ঠাধর দ্বারা অবিরত নিষ্পিষ্ট করে যেন মাতৃদেহের শেষ রক্তবিন্দু লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তার বামহস্ত মাতার দক্ষিণ স্তনের উপর রেখে সেই ক্ষুদ্র হস্তাঙ্গুলির কোমল পরশ ছুঁইয়ে আরো দুগ্ধ আরো অমৃতের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মধ্যে মধ্যে তার অতি হ্রস্ব, অতিশয় স্ফীত বাম পদ দিয়ে মাতার দেহে মধুর মধুর পদাঘাত করছে।

সুশীল পাঠক! তুমি হয়তো ভাবছো, আমি যশোদানন্দন শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণের কাব্যচ্ছন্দে বাঁধা মাতৃদুগ্ধ পান এতশত যুগ পরে কেন গদ্যময় নিরস ভাষায় পুনরায় পরিবেশন করছি! (কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত বৈষ্ণব জন বিশেষ করে আমার মুরব্বী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ, আমার এ অনধিকার চর্চা অবহেলে এবং সস্নেহে ক্ষমা করবেন।) নিবেদন, আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

এই যে আমি আমার মাকে অনেকখানি হতাশ-নিরাশ করলুম (অবশ্য সব মা-ই সেটা মাফ করে দেয়), তার তুলনায় আমার মা কি করলে?

আমার বয়স যখন চৌত্রিশ তখন আমার মা ১৯৩৮ সালে আমাকে ছেড়ে ওপারে চলে গেল। সেই বিচ্ছেদের পর আমি আরও চৌত্রিশ বৎসর ধরে এ-সংসারে সেই মায়ের বিরহযন্ত্রণা কতখানি নিতে পারি, তারই চেষ্টা করছি।

এইবারে আমি পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য খুলে বলছি—

যে-মা আমার ছ' মাস এক বৎসর এবং সর্বাধিক, পৌনে তিন বৎসরের বিচ্ছেদ সইতে পারতো না বলে দিনে দিনে ফরিয়াদ করতো, সে-ই মা-ই আমার জন্য রেখে গেল চৌত্রিশ বৎসরের বিচ্ছেদ-বেদনা।

করজোড়ে স্বীকার করছি আমার মা আমাকে যতখানি ভালোবেসেছিল তার তুলনায় আমার ভালোবাসা নগণ্য। কিন্তু মাকে দিয়েছিলুম মাত্র পৌনে তিন বৎসরের বেদনা। তার বদলে মা আমাকে দিলে চৌত্রিশ বৎসরের বিরহ। আমি কোনো ফরিয়াদ, কোনো নালিশ করছি নে। আল্লা আমার মায়ের পূতাত্মা তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে মাকে তাঁর বহু দুঃখ বহু বিরহযন্ত্রণা থেকে শাশ্বত নিষ্কৃতি দিয়ে তাঁকে সর্বানন্দাতীত চরমানন্দ দিয়েছেন।

স্পর্শকাতরতাহীন পাঠক শুধোবেন, কার্লের কথা কও। তোমার মায়ের কথা এস্থলে টেনে আনছো কেন?

কার্লকে জেলে নিয়ে যায় ১৯৩৩-এর বসন্তে। তারপর এল ইস্টারের পরব।

ঐ সময় আমি পাউলের সঙ্গে প্রতি বছর ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ গিয়ে সপরিবারে কার্ল এবং পাউল পরিবারের সঙ্গে পরব পালন করতুম। ঐ সময়ে প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন এবং সপ্তাহান্তে তিনি পুনরুত্থান করেন।

১৯৩২-এর এই পরবের সময় আমি দেশে। কার্ল পাউল আমাকে রঙিন কার্ড পাঠায়; সঙ্গে দীর্ঘ আবোল-তাবোল-ভরা নানা প্রকারের কেচ্ছা-কাহিনী।

১৯৩৩, কার্ল জেলে। কিন্তু মানুষ কি অসম্ভবের আশা ত্যাগ করতে পারে? আমার ছিল দুরাশা, হয়তো হিটলার-রাজ এই সময়ে একটা মহানুভব ব্যত্যয় করে কার্লকে চিঠি লিখতে দেবে।

না। এমন কি পাউলও চিঠি লেখেনি। শুধু কার্ল পাউলের পিতা আমাকে একটি পিকচার কার্ড পাঠিয়েছে। তার উপরে বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হস্তে, কোনো-গতিকে লেখা আমার প্রতি আশীর্বচন।

ইতিমধ্যে প্রতি সপ্তাহে প্রতি চিঠিতে বার বার পাউলকে শুধোই (তখন অ্যারমেল হয়নি), 'কার্লের খবর কি? কার্লের খবর জানাও।'

পাউল উত্তরে আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তার বাপ মা, কার্লের বউ বাচ্চা সম্বন্ধে অনেক-কিছু লেখে।

তার পর একটা চিঠিতে লিখলো, 'ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফের জেলে সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে নিভৃতে বলেছে, আমি যেন আমার দাদার অত-খানি তত্ত্বতাবাশ না করি। নইলে আমাকেও তারা জেলে পুরতে বাধ্য হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

তখনো নাৎসি পার্টি পরবর্তী যুগের চরমতম পৈশাচিক বর্বরতায় পৌঁছয়নি। তাই জেলের কর্তা পাউলকে এই সহানুভূতির উপদেশ দিয়েছিল।

এ-চিঠি পেয়ে আমি দুর্ভাবনা দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়লুম।

তারপর দু'মাস ধরে, পূর্ণ দু'মাস ধরে পাউল সম্পূর্ণ নীরব। আমার তখন কি অবস্থা সেটা বোঝাই কি প্রকারে?

আমার মা আমার মনমরা ভাব বেশ লক্ষ্য করেছে। একদিন শুধোলে, 'হ্যাঁরে তোর কি হয়েছে! বিদিশি চিঠি পেলেই তুই শুয়ে পড়িস কেন?'

আমি সব কথা খুলে বললুম।

কার্লের মাও মা, আমার মাও মা।

আমার মা বললে, সে কার্লের জন্যে দোওয়া মেঙে তার জন্য নফল নমাজ পড়বে।

ততদিনে বড়দিন এসে গেছে। বড়দিন শেষ হল।

কিন্তু পাউল কিংবা তার বাপ মা কারো কোনো চিঠি নেই।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে পাউলের চিঠি এল।

সংক্ষেপে লিখেছে :

'ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় দাদা আত্মহত্যা করেছে। কোনো এক সদাশয় জেল-গার্ড দাদাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেয়—গোপনে। দেশলাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে সিগারেটের খোলে সে লিখে গিয়েছে, "মাকে সান্ত্বনা দিয়ো।" গার্ডটিই আমাকে সেটা পৌঁছিয়ে দেয়।'

চিঠি যখন পড়ছি আমার মা তখন সম্মুখে ছিল। শুধোল, 'হ্যাঁরে কি খবর পেলি? তোর বন্ধু ভালো আছে তো?'

আমি সত্য গোপন করিনি।

মা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেমাজের ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

কার্ল-এর কথা শেষ হয়েছে। তথাপি বিবেচনা করি কোনো কোনো সহানুভূতি-শীল তথা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা জানতে চাইবেন যে কি-সব দুর্দৈব কোন্ সব নিপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একদিন কারাগারের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে কার্লের কাছে দিব্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হল যে এ-জীবন নিরর্থক ; কিংবা হয়তো কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা প্রকাশ করে বললেন, কার্ল অংশতঃ মতিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বেচ্ছায় এ-সংসার থেকে বিদায় নেয়—কার্ল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় কি কখনো তার সে মায়ের কাছে থেকে চিরবিদায় নিতে পারতো, যে-মাকে সে এতখানি প্রাণঢালা সোহাগ করতো, তার জায়া তার শিশু-কন্যাকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত? কবি বলেছেন—

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

এরই কাছাকাছি একটি অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, কার্লেরই সমগোত্রীয় হিটলারবিরোধী এক শহীদ। ইনি জর্মনিতে কার্লের মতো অজানা অচেনা জন নন। উলরিব ফন্ হাসেল ছিলেন ইতালিতে জর্মন রাজ্যের মহামান্য রাষ্ট্রদূত। বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে তিনি ইংলণ্ড থেকে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া পর্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুদেশে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আমন্ত্রণে বহু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। হিটলারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া মাত্রই তিনি সেই সম্মানিত রাষ্ট্র-দূতের পদত্যাগ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারকে নিধন করার যে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল

হয় তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থাৎ কার্লের আত্মহত্যার এগারো বৎসর পর।

ফন্ হাসেল কিন্তু এক হিসাবে কার্লের চেয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। নির্জন কারাগারে তিনি কাগজ-কলম পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর 'আত্মচিন্তা'র কিছুটা লিখে যাবার সুযোগ পান।

সেই 'আত্মচিন্তা' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য জেনে তিনি মাত্র তিনটি ছন্দে গাঁথা ছত্রে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশাভরা অনুভূতি প্রকাশ করেন :

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো মৃত্যুদ্বার দিয়ে
আমরা তখন যেন স্বপ্ন-সম্মোহিত
এবং অকস্মাৎ আমাদের করে দিলে মুক্ত।'[১]

সেই রবীন্দ্রনাথের 'এই দুয়ারটুকু'। এটি 'পার হতে' কার্ল, ফন্ হাসেল কারো কোনো সংশয় ছিল না।

১৯৩৩-এর বড়দিনে কার্ল ওপারে চলে যায়।

১৯৬৪-এর গ্রীষ্মে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ফের জর্মনি যাই।

বন শহরের আমার এক প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে বাস করছি। পাউলকে চিঠি লিখলুম। সে জানালে, ইতিমধ্যে তার মা কার্লের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তার বাপ পেনশন পেয়েছেন। পাউল লিখেছে, 'না পেলেই ভালো হত; বুড়ো একটা কিছু নিয়ে থাকতে পারতো। এখন সে তার জাগ্রতাবস্থার অধিকাংশ সময় কাটায় রান্নাঘরের সেই ভাঙা কৌচটার উপর যেখানে বসে বসে মাকে সঙ্গ দিত; পূর্বেরই মতো—কিন্তু এখন একা একা, এবং প্রায় সমস্ত দিনরাত্রি—আগে অন্ততঃ ন'ঘণ্টাটাক আপিসে কাজকর্ম করতো। আর সমস্তক্ষণ আগেরই মতো সিগার ফোঁকে। তবে, আগে ফুঁকতো তামাম দিনে গোটা ছয় মোলায়েম সিগার; এখন গোটা আঠারো এবং এ-দেশের সবচেয়ে কড়া সিগার। আমি অনুরোধ করাতে মাসি এসেছে। মাসি মায়েরই মতো ভালো রাঁধতে পারে। আগে বাবাই সে-কথা বার বার স্বীকার করেছে। এখন শুধু খুঁত-খুঁত করে।' লক্ষ্য করলুম, পূর্বের প্রথামতো পাউল যথারীতি আমাকে ড্যুসলডর্ফ যাবার নিমন্ত্রণ জানায়নি।

১ অধুনা অনেকেই জর্মন শিখছেন, তাই মূল পাঠ তুলে দিলুম ;—
"Du kannst uns durch des Todes Nueren
Trtaumend fuehren
Und machest uns Uns auf einmal frel."

বেদনা পাওয়ার কথা ছিল ; আমি পেলুম শান্তি স্বস্তি।

পাউল বন-শহরে এসে আমাদের ছাত্রাবস্থার পাব-এ রাঁদেভু স্থির করল।

কুশল আলিঙ্গনাদির পর পূর্বের প্রথামতো সে আধ লিটার বিয়ার অর্ডার দিয়ে গেলাসটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেষটায় একচুমুকে আধ গেলাস শেষ করে বললে, 'কাঁই বা তোকে বলি, যা তুই শুনতে চাস।' কার্ল ধরা পড়ার এক মাস পর এল ঈস্টার পরব। কর্মে তার বিশেষ মতিগতি ছিল না কিন্তু ধর্মের পরব, লৌকিকতা নিয়ে সে হই-হুল্লোড় করতে বড় ভালবাসতো। নানা রঙের কাগজে ডিম মুড়ে সেগুলোকে চিত্র-বিচিত্র করা থেকে শুরু করে, নিতান্ত বাচ্চাদের মতো সেগুলোকে কল্পনাতীত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকনো, তারপর আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বিকট চিৎকার লাফালাফি দাপাদাপি করে সেগুলো খোঁজা, তার বউ যেগুলো লুকিয়েছিল সেগুলো খুঁজে পাওয়াতে রেড্-ইণ্ডিয়ান স্টাইলে তার তাণ্ডব নৃত্য, তার উৎকট উদ্দাম জয়োল্লাস —এসব কথা সে নিশ্চয়ই জেলে বসে বসে ভেবেছিল।

আমার চোখে জল এল। বললুম, 'পাউল, তোর মনে আছে '৩২-এর পরবে কার্ল তোর মারফত আমাকে এক ডজন রঙিন ডিম পাঠিয়েছিল ?'

পাউল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললে, 'তুই তো সর্ব ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করিস তোর অজানা নয়, অনেক ক্যাথলিক ঈস্টারকে বড়দিনের চেয়ে বেশী সম্মান দেয়। ঐ সময় প্রভু যীশু মৃত্যুবরণ করার সময়েও তাঁর নিপীড়নকারীদের ক্ষমা করে যান। এই ঈস্টার সপ্তাহটি ক্ষমা, দয়া, মৈত্রীর সপ্তাহ। আমার সর্ব নৈরাশ্য তখন দুরাশা দিয়ে চেপে ধরে ঈস্টার ফ্রাইডে থেকে ঈস্টার মানডে অবধি চার দিন রোজ গিয়েছি জেলখানায়, যদি এই ক্ষমাদয়ার সপ্তাহে ওরা একটু নরম হয়। মাকে না জানিয়ে।' পাউল থামলো।

আমি বললুম, 'বুঝেছি, তুই বলে যা। আমি দেশে থাকতে সব শুনতে চেয়েছিলুম। এখন আর না। তুই সংক্ষেপে সার।'

পাউল বললে, 'তার দু'মাস পরে এল তার মেয়ের নামকরণ দিবস।[১]

কার্ল ঐদিনই করতো তার বাড়ির সবচেয়ে জব্বর পরব। মেয়েকে সাজাতো

১ ক্যাথলিকরা জন্মদিন পালন করে না। ঠাট্টা করে বলে, শ্যাল কুকুরেরও তো জন্মদিন আছে। তারা পালন করে যে সন্তের নামে বাচ্চার নাম দেওয়া হয়েছে (যেমন পাউল, মারিয়া=মেরি, ইত্যাদি) তাঁর সেণ্ট পদবি প্রাপ্তির দিন। এটাকে বলে, নামেন্সটাথ্।

শুভ্রাতিশুভ্র সাদা রেশমী জামা-কাপড়ে আর হল্যাণ্ড থেকে কেনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেস্ ঝালরে।

কার্ল জেলে। হয়তো ভাবছে মা কি করে বাচ্চাটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আজ সে রকম পরব হচ্ছে না কেন?

তার পর এল কার্লের বাৎসরিক বিবাহোৎসব।

এ সব কটা পরব পড়ে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসে। শুধু তার বউ আর আমাদের মা'র নামকরণ দিবস পড়ে জানুয়ারি থেকে মার্চে।

এ সব কটা দিনে কার্ল কারাগারে কী বেদনা অনুভব করেছিল তার খানিকটা কল্পনা আমি করতে পারি। আর সেই দরদী গার্ড আমাকে তার শেষ মেসেজ দিয়েছিল সে আমাকে কিছুটা বলেছিল। কার্ল নাকি তাকে তার পরিবারের প্রতি পর্বদিন ওকে ঐ সম্বন্ধে একটু-আধটু বলতো।

তার পর বড়দিন এল। সে আর যে সইতে পারলো না। সে কথা তোকে তো চিঠিতে লিখেছিলুম।'

তার দু'একদিন পর আমি একটু সুযোগ পেয়ে পাউলকে শুধালুম, 'আচ্ছা পাউল, কার্ল তো হিটলার জর্মনির সর্বেশ্বর হওয়ার দু'বৎসর পূর্বে পার্টি ছেড়ে দেয়. চাঁদা বন্ধ করে! তবে ওকে ধরলো কেন?'

পাউল ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'কিন্তু পার্টি কি ছাড়ে (আমাদের ভাষায় কমলী নহী ছোড়তী)? কার্ল ছিল পার্টির সব চেয়ে সেরা যুক্তিতর্কসিদ্ধ মেম্বার এবং উত্তম বক্তা। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পর যে-সব মাতব্বর কম্যুনিস্ট-দের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের প্রায় সকলেরই নোটবুকে কার্লের নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। আমি ওদের দোষ দিই নে; কিন্তু নাৎসিরা স্বভাবতই ধরে নিল এ-রকম একজন সর্ব-কম্যুনিস্ট-মান্য লোককে বন্ধ করে রাখাই সেফার।'

পাঠক হয় তো শুধোবেন 'কত না অশ্রুজল'-এ আমি কার্লের শেষ চিঠিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গোড়ার দিকেই ছাপালুম না কেন? কিন্তু যেখানে আমি অত্যুৎকৃষ্ট শেষ বিদায়ের চিঠিগুলো অনুবাদ করছি, সেখানে মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে তিনটি মাত্র শব্দ, সেগুলোর কী অধিকার ওদের সঙ্গে সমাসনে বসার?

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, নাৎসি পার্টির কি কোনো গুণ ছিল না, তারা কি সুদ্ধুমাত্র পাপাচারই করেছে? এর উত্তরে একটি ক্ল্যাসিক্যাল নীতিবাক্য সম্বলিত ছোট্ট কাহিনী মনে আসে। এক দরিদ্র গ্রাম্য পাদ্রী গিয়েছেন শহরে—বিশপের সঙ্গে দেখা করতে, সকালবেলা বিশপ তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে গেলেন, বেচারির পেটে তখনো কিছু পড়েনি। বাটলারকে হুকুম দিলে সে রুটি মাখন আর একটি ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। পাদ্রী মৃদু আপত্তি জানিয়ে খেতে আরম্ভ করলে হঠাৎ বিশপের নাকে গেল পচা ডিমের গন্ধ। চশমার উপর দিকে অর্ধোন্মুক্ত পচা ডিম ও পাদ্রীর দিকে যুগপৎ তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আপনাকে একটা পচা ডিম দিয়েছে!' পাদ্রী সাহেব তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললেন, 'না হুজুর না, ইট্ ইজ অলরাইট—' তারপর একটু থেমে বললেন, '—অ্যাট প্লেসেস্'—অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায়।

তাই 'পাদ্রী সাহেবের ডিম' বলতে বোঝায়, পৃথিবীতে কি এমন কোনো পচা ডিম পাওয়া যাবে, যার সর্বশেষ অণুটুকুও পচে গিয়েছে? তেমন করে খুঁজলে অন্তত দু-একটি পরমাণু পাওয়া যাবে, যেগুলো সম্পূর্ণ পচে যায়নি।

নির্গলিতার্থ: ইহভুবনে এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যার ভিতর 'নেই কোনো গুণ, শুধু কপালে আগুন'।

বস্তুত হিটলার তথা নাৎসি পার্টির অনেক গুণই ছিল, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শ্মশান-মশানে পরিণত জর্মনি যে বছর পাঁচেকের ভিতর আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলো, তার জন্য কিছুটা ধন্যবাদ পাবেন হিটলার ও তাঁর নাৎসি পার্টি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা কি প্রকারে একটা দেউলে দেশকে (১৯৩৩-এর জর্মনি) মাত্র পাঁচটি বৎসরের ভিতর পরিপূর্ণ শক্তিমান বিত্তবান করা যায় (১৯৩৮-এর জর্মনি) সেই ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। সেই সঙ্ঘবদ্ধ তপস্যালব্ধ চরিত্রবল বহুলাংশে প্রয়োগ করে যুদ্ধশেষের বিধ্বংসিত-জর্মনি পুনরায় শ্রী-সমৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না, নাৎসিরা পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদীকে নিহত করে।

আবার তারপর এটা ভুলে গেলে আরও একটা মারাত্মক ভ্রম করা হবে যে, হিটলারের দৃষ্টান্ত থেকে বিশ্বমানবের মোক্ষম শিক্ষালাভ হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। বস্তুত ন্যুরন্‌বের্গের মোকদ্দমার সময় যে-সেরা

মার্কিন মনঃসমীক্ষণবিদ্, ডাক্তার কেলি প্রধান প্রধান আসামী গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদির মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালেসিস) দীর্ঘকাল ধরে করেন, হিটলার সম্বন্ধে নানা দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্য এঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন (আসামীদের সকলেই হিটলারকে বহু বৎসর ধরে অব্যবহিত অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন) এই ডাক্তার কেলি আপন 'সোনার দেশ', ইহলোকে 'গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ' মার্কিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে প্রামাণিক পুস্তক মারফত বলেন, এই মার্কিন মুল্লুকেই যে-কোনো দিন এক নয়া-হিটলার নয়া-তাণ্ডব নৃত্য নাচাতে পারে, নাচতে পারে।

কেলি তাঁর পুস্তক প্রকাশ করেন সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮-এ। তারপর দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে, খবরের কাগজে পড়লুম, এক গণ্যমান্য মার্কিন অধ্যাপক অস্ট্রেলিয়াতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, (কাটিং রাখিনি, মোদ্দাটা সাদামাটা ভাষায় বলছি) এখনো বিস্তর হিটলার রয়েছে ; তারা সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

এই মোক্ষম হক্ক বাক্যটি আমরা যেন কখনো না ভুলি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, হিটলার কি শুধু ইহুদী এবং তাঁর জর্মন-বৈরীদেরই (যেমন আমার সখা কার্ল, তথা কবীর-সখা ট্রটৎস্কু জল্‌ৎস্) নির্যাতন করেছেন ? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়। পোলিশ, চেকস্লোভাক-বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধে বন্দী রাশান অফিসার আরও বহুবিধ লোক তাঁর দীর্ঘ হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এমন কি, কয়েক হাজার নিতান্ত নিরীহ বেদের পালও কনসানট্রেশন ক্যাম্পে, গ্যাস-চেম্বারে প্রাণ দেয় ; কি এক অজ্ঞাত অখ্যাত ককেশাস না কোন্ এক অঞ্চলে ধৃত এক অতিশয় ক্ষুদ্র উপজাতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তারা স্লাভ না 'আর্য' ? জর্মন তথা বিশ্বের সর্ব বিশ্বকোষ এদের সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। শেষটায় হিটলারের খাস-প্যারা হিমলার-চিত্রগুপ্ত—যিনি কনসানট্রেশন-নরকের কার্ড ইনডেক্‌সিং-এর চীফ সেক্রেটারি—তিনি রায় দিলেন, আল্লায় মালুম কোন্ দলিলদস্তাবেজ 'বিদ্যাবুদ্ধি'র উপর নির্ভর করে—যে, এরা স্লাভ, অর্থাৎ নাৎসি-'ধর্মানুযায়ী', বেকসুর বধ্য। ওরা মরে। যুদ্ধশেষে তাবৎ খবর পাওয়ার পর বিশ্বপণ্ডিতরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন এরা আর্যদেরই কোন্ এক নাম-না-জানা উপজাতি। এবং কেউ কেউ বলেন, এই উপজাতি সমূলে নির্বংশ হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, না, দু-একটা উটকো হেথা-হোথা বেঁচে আছে এবং বংশরক্ষার জন্য বধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি সঠিক জানি নে।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহুদীরাই—সুদ্ধমাত্র ইহুদী পরিবারে

জন্ম নেবার 'অপরাধ'-এর ফলেই—প্রাণ দিয়ে খেসারত দেয় সর্বাধিক।

এ বাবদে অন্যতম উৎকৃষ্ট দলিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষাতেই উৎকৃষ্টরূপে অনূদিত হয়েছে। একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ইহুদী মেয়ের ডাইরি বা রোজ-নামচা। যুদ্ধের সময় লেখা। বাংলাতে বইখানির নাম 'আন্ ফ্রাঙ্কের ডায়ারী', অনুবাদক শ্রীঅরুণকুমার সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি মেয়েটির রোজনামচা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি; পরে সুযোগ পেলে সবিস্তার আলোচনা হবে। ডাইরিকে উদ্দেশ করে মেয়েটি লিখছে—

'শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৪২

আজ তোমাকে কেবল খারাপ খবর শোনাবো। আমাদের ইহুদী বন্ধুদের দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইসব হতভাগ্য ইহুদীদের সাথে গেস্টাপো পুলিস যে কি নির্দয় ব্যবহার করছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এদের গরু-ছাগলের গাড়িতে বোঝাই করে ড্রেণ্টের (Drente) ওয়েস্টারবর্ক (Wester-bark) বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়েস্টারবর্কের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একশো লোকের জন্য মাত্র একটি হাত-মুখ ধোবার কল। পায়খানা নেই বললেই চলে। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের একই জায়গায় শোবার ব্যবস্থা। এর ফলে, ব্যাপকভাবে নরনারীর চরিত্রস্খলন হচ্ছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, এমন কি অল্পবয়সী মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে পড়ছে।

বন্দিশালা থেকে পালানো অসম্ভব। বন্দিশালার অধিবাসীর মার্কা হিসাবে এদের সকলের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। খাস হল্যাণ্ডেই যখন এই অবস্থা তখন দূরদেশে স্থানান্তরিত করে এদের উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যে, তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ রেডিও থেকে বলা হচ্ছে যে, তাদের গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছে।

বোধ করি, এইটিই হত্যা করার সব-চেয়ে সহজ পন্থা। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। মিয়েপের মুখে এইসব ভয়ঙ্কর গল্প শোনবার সময়, আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, অথচ না শুনেও পারছিলাম না।

সম্প্রতি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার বাড়ির দরজার সামনে বসে ছিল। হঠাৎ পুলিসের গাড়ি তার বাড়ির সামনে এসে থামল, আর গাড়ি থেকে গেস্টাপো পুলিস নেমে তাকে হুকুম করল, 'গাড়িতে উঠে এসো'। পঙ্গু হতভাগিনী চলতে পারে না, কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে গেল। জর্মনরা তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল।

জর্মনদের আর একরকম অত্যাচারের নাম হল প্রতিশোধমূলক হত্যা। ব্যাপারটা এই রকম—নিরীহ নাগরিকদের জামিনস্বরূপ জেলে পুরে রাখা হয়। যখনই হল্যাণ্ডের কোথাও জর্মনদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তার প্রতিশোধস্বরূপ, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে জেল থেকে টেনে বের করে গুলি করা হয়। তারপর তাদের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে ছাপানো হয়। এই হল হিটলারতন্ত্রের আসল রূপ। এরা আবার নিজেদের আর্য বলে গর্ব করে।

তোমারই আন'

ভরা ডুবি (আন ফ্রাঙ্ক)

আজকালের মধ্যেই তো ৬ই জুন। শুধু ইয়োরোপের না, বিশ্বের ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঐ দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যে জাহাজ ভর্তি করে ফ্রান্সের নরমাঁদি উপকূলে মার্কিন-ইংরেজ অবতরণ করে। এরকম বিরাট নৌবহর নিয়ে এ-আকারের একটা অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সারা বিশ্বে এটা 'ডী ডে' নামে পরিচিত এবং সুদ্ধমাত্র কূলে অবতরণের ঐ একটি দিবস নিয়েই এত কেতাব লেখা হয়েছে যে একটা মানুষ দশ বছরেও সেগুলো পড়ে শেষ করতে পারবে না। এবং নূতন নূতন বই লেখা হচ্ছে। এর বুঝি শেষ নেই। তাই বোধ হয় এটাকে 'দীর্ঘতম দিবসও' বলা হয়, যদ্যপি জ্যোতিষ অনুযায়ী এটি দীর্ঘতম দিবস নয়।

ফিল্মও হয়েছে। তারই বদৌলত যাঁদের যুদ্ধ বাবদে কৌতূহল সীমাবদ্ধ তাঁরাও অনেকখানি ওয়াকিফ-হাল হয়ে গিয়েছেন। যদ্যপি ফিল্মটি বড্ডই একপেশে ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সুশীল পাঠক তোমাকে অভয় দিচ্ছি, আমি এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবো না—যে-সব মহারথীরা এ-বিষয়ে বিরাট বিরাট ভলুম ভলুম কেতাব লিখেছেন পার্কার শীফার মঁ ব্লাঁ ফাউনটেন পেন দিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে আমার ভোঁতা কঞ্চির কলম!

আমার বর্তমান উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ঐ ১৯৪৪ সালের মার্কিনিংরেজ অভিযানের প্রায় দেড়-দুই বৎসর পূর্বের থেকেই সারা ইয়োরোপময়—এমন কি প্রাচ্যেও—জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল ওরা জর্মনিকে হুড়ো দেবার জন্য ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে জর্মন নিমিত আটলানটিক উয়োলে হানা দেবে কবে, কোন্ জায়গায়? এই জল্পনা-কল্পনা সর্বাপেক্ষা

উৎকণ্ঠ আকণ্ঠ আগ্রহে, আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ইয়োরোপের সর্বত্র লুক্কায়িত কিংবা কনসানট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ইহুদীরাই ছিল প্রধানতম।

আন্ ফ্রাঙ্ক তার ডাইরিতে মার্চ মাসে অর্থাৎ 'ডী ডে'র তিন মাস পূর্বে লিখছে: 'সেটা ছিল রবিবার, রাত্রি ন'টা। উইনস্টন চার্চিল সেদিন বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সে বক্তৃতার মধ্যে সত্যিকারের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছিল না—ছিল হিটলার-নিপীড়িত অগণিত নরনারীর প্রতি আশ্বাসের বাণী। সেই সময়টা মনে হয়েছিল যে আমাদের এই গোপন-আবাসে আমরা অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই। এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলছে।'

কিন্তু আন্ সরলা হলেও এ-বাবদে রীতিমতো বুদ্ধিমতী। ঐ গোপন আবাসে যে আটটি প্রাণী প্রতিদিন জল্পনা-কল্পনা করছে তার নীর সরিয়ে ক্ষীরটুকু সযত্নে সংগ্রহ করে তার ডাইরিতে লিখে রাখছে, এদের ভিতর বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সেই আন্। আর খাসা রসিয়ে রসিয়ে—

একজন হয়তো বললে, কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর জন সবজান্তার মতো বলল, তা কি হবে? ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে আক্রমণ করা কি এতই সোজা! আবার একজন বললে, 'একবার ফ্রান্সে নামতে পারলে, এক মাসের মধ্যে বার্লিন পৌঁছে যাবে।' আর একজন রণবিশারদ্ বলে উঠলেন, 'এক বৎসরের কম কিছুতেই বার্লিন পৌঁছতে পারবে না।' আন্ এর অভিমত দিয়ে এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছে। এবং এর কথা আখেরে ফলেছিল। 'ডী ডে' হয় ৬ই জুন; তার এগারো মাস পরে ৮ই মে জর্মনি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন, ইংরিজিতে নাকি সিক্‌সেস্ অ্যাণ্ড সেভেনস, ফার্সীতে শশ্ (ষষ্ঠ) ও পন্‌জ (পঞ্চ) বলে—অবশ্য অল্প ভিন্নার্থে। মোদ্দা: এগারো মাস যা, বারো মাস তা।

কিন্তু এইমাত্র বলেছি, আন্ সুচতুরা বালা।

কারণ যদ্যপি সে বলেছে, 'এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলেছে', তথাপি সে অন্তরে অন্তরে জানে মার্কিনিংরেজ বাবুরা নিছক খয়রাতি কর্ম করার জন্য, দু-হাতে চ্যারিটেবল হসপিটাল ছড়াতে ছড়াতে 'ডী ডে'-তে ফ্রান্সে নামবেন না। তাই ঐ দিবসের এক মাস পূর্বে লিখছে, 'আমাদের এখানে সকলেই এখন আশা করছে যে মিত্রপক্ষের (অর্থাৎ মার্কিনিং-রেজ) অভিযান খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে; কারণ রাশিয়া সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেবে, এ তারা কিছুতেই হতে দেবে না।'

অতিশয় হক্ কথা। আন্ ঐ বয়সেই বাবুদের 'সচ্চরিত্রে'র কিছুটা চিনে গিয়েছে, নিছক ঈশ্বরপ্রসাদাৎ! আমরা ইংরেজকে বিলক্ষণ চিনি, চোখের জলে নাকের জলে হাড়ে হাড়ে।

কিন্তু মুক্তি পাবার আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনার মাঝখানেও দেখুন, এই কুমারীটি কি রকম শান্তভাবে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ওজন করে দেখছে। 'ডী ডে'র ঠিক এক পক্ষ পূর্বে সে লিখছে: '...আশা এবং উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছে গেছে। কেন এখনো আক্রমণ হচ্ছে না, ইংরেজরা কেন এত দেরি করছে, তারা কি কেবল তাদের নিজের দেশের জন্য লড়ছে, হল্যাণ্ডের প্রতি কি তাদের কোনো দায়িত্ব নেই? কিন্তু ইংরেজদের আমাদের প্রতি কীই বা দায়িত্ব আছে? আমরা আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি? জর্মন অধিকৃত দেশগুলোর মধ্যে কবার কটা বিদ্রোহ হয়েছে? নিজের মুক্তি নিজেরই অর্জন করতে হয়—অন্য দেশের কি মাথাব্যথা পড়েছে যে কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত পাঠাবে? আক্রমণ একদিন হবেই, কিন্তু তা আমরা চাইছি বলে নয়, ইংরেজ এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থে।'

এই চরম দ্বন্দ্বের মাঝখানে মেয়েটির ভগবানে বিশ্বাস, অন্তিমে সত্যের সর্বজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রত্যয় এবং সর্বোপরি তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্ত্যে নবীন উষার উদয়, নবীন জীবনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে এ বালাটির পরিপূর্ণ আশাবাদ—তার পরিচয় আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিছুতেই প্রকাশ পাবে না।

তবু মাঝে মাঝে মেয়েটি কিন্তু ভেঙে পড়তো।

একদিন লিখছে, 'প্রিয় কিটি, এক নিদারুণ হতাশা এবং অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখন মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধ বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। যুদ্ধ মিটে যাওয়া যেন বহু দূরের রূপকথার রাজ্যের ব্যাপার বলে এখন মনে হচ্ছে।' তার দেড় মাস পরে বলছে, 'আবার আমার অবস্থা ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে। এই গোপন আবাসে এখন সবই বিষাদময়।...হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—দুটোর যে-কোনো একটা তাড়াতাড়ি ঘটুক। ভগবান এই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা থেকে আমাদের রেহাই দাও।

তোমারই আন্'

কিন্তু এর মাত্র এগার দিন পরেই—

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

'মঙ্গলবার, ৬ই জুন, ১৯৪৪ (অর্থাৎ ডী ডে—লেখক)

প্রিয় কিটি,

আজ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল। ফরাসী উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করছে।...

জর্মনির খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে ফরাসী উপকূলে ব্রিটিশ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণ করেছে।...

আমাদের গোপন আবাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি যা এতদিন আমাদের কাছে ছিল সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মতো, তা কি সত্যিই আমাদের কাছে এল? সত্যিই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে বিজয়লাভ করব?

হতাশার অন্ধকার ছিন্ন করে আবার আশার আলোক জেগেছে।'

কিন্তু পাঠক, এর পর দিনের পর দিন, মিত্রশক্তি যেমন যেমন ফ্রান্স জয় করে এগিয়ে আসতে লাগলো, আর আন্ সোল্লাসে তার ডাইরিতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করলো তার উদ্ধৃতি আমি দেব না। আপনারা ডাইরিখানা পড়ে দেখবেন। সে প্রতিদিন আশা করছে মিত্রশক্তি হল্যাণ্ড জয় করে তাদের মুক্তিদান করবে। এবং এইটুকু বলবো, এ-যুদ্ধের শেষাঙ্ক সম্বন্ধে যে-সব বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে আন্ ফ্রাঙ্কের ডাইরি সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু হায়! হায়!' শেষরক্ষা হল না।

২১ জুলাই আন্ বেতারে শুনলো, হিটলারকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, আর হিটলার হন্যে হয়ে দোষী-নির্দোষী হাজার হাজার জর্মনকে ফাঁসী দিচ্ছেন। আন লিখছে, 'এই রকম করে হতভাগারা যদি নিজেরা মারামারি করে মরে, তাহলে ইংরেজ-আমেরিকা আর রুশদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। আমাকে কি বড় খুশী মনে হচ্ছে? সত্যি, আমি যে আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে এই অক্টোবর মাসেই আবার আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

একে তুমি আকাশ-কুসুম কল্পনা বলছ? বার্লিনের দিকে ধাবমান সৈন্যদের পদধ্বনি বলছে, না এ আকাশ-কুসুম নয়। এ সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।'

কিন্তু হায়, পাড়ে এসে ভরাডুবি হল। এর কয়েকদিন পরেই জর্মন পুলিস আন্‌দের গুপ্তাবাস আবিষ্কার করে সবাইকে গ্রেপ্তার করে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাল। তারপর কি হয়েছিল সেটা, কঠোর পাঠক, দয়া করে আমাকে পুনরাবৃত্তি করার হুকুম দিয়ো না।

আন্ ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে আমার হয়তো আরো অধিক-কিছু লেখাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যেই হাতে-কলমে সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, একাধিক দরদী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আন্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বাবদে আমার মতো নগণ্য লেখক একজন প্রখ্যাত বাঙালী লেখকের সহৃদয় একখানি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

সম্প্রতি এর্নাকুলাম থেকে একটি মহিলা (ইনি আমার '—'এর মালায়ালাম অনুবাদ প্রকাশ করেছেন) জানতে চেয়েছেন—আন্ ফ্রাঙ্কের লেখা The Diary of a Young Girl বইখানার বাংলা অনুবাদ কে করেছেন, তাঁর ঠিকানা কি এবং প্রকাশক কারা। এখানে বসে কি করে খবরটা সংগ্রহ করা যায় যখন ভাবছি, 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় আপনার 'পঞ্চতন্ত্রে' এ বিষয়ে অনুবাদকের নাম পেয়ে গেলাম। এঁদের ঠিকানা কি আপনি জানেন ?—ইত্যাদি।

আন্ সম্বন্ধে যখন সেই সুদূর কেরালায়ও এতখানি কৌতূহল রয়েছে তখন আমার পক্ষে হয়তো এ-নিয়ে আর অত্যধিক বাগ্‌বিন্যাস করা উচিত হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো কাঁচা লেখক একটি বিষয়েই এমনি মজে যান যে সে দ' থেকে আর সহজে বেরুতে পারেন না। আমার হয়েছে তাই। কিংবা বলতে পারেন, 'একে তো ছিল নাচপাগলী বুড়ী, তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।' কিংবা তারো বাড়া :

কী কল পাতাইছো তুমি
বিনা বাইদ্দে (বাদ্যে) নাচি আমি !!

অতএব বহুদাস্তশীল পাঠকের সামনে আন্-এর আরো একটু সামান্য পরিচয় নিবেদন করি।

আন্-এর রসিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। তার তেরো বৎসর বয়সে ক্লাস টিচার আদেশ দিয়েছেন 'বাচালতা' সম্বন্ধে রচনা লিখতে। আন্-এর 'বাচালতা'র শাস্তিস্বরূপ !

'ফাউন্টেন পেনের ডগা কামড়াতে কামড়াতে ভাবতে লাগলাম—কি লেখা যায় ? হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বরাদ্দ তিন পাতা লিখে ফেলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। আমার যুক্তি হল, বক বক করা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। যদিও বাচালতাকে সংযত করার চেষ্টা করা উচিত, তবুও এই দোষ থেকে আমার একেবারে মুক্ত হওয়া উচিত হবে না, কারণ আমার মা, আমারই মতো এবং সময় সময় আমার চেয়েও বেশী কথা বলেন। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব-

ধর্ম কি করে ত্যাগ করতে পারি ? আমার যুক্তি শুনে মিঃ কেপ্টরকে (শিক্ষককে) হাসতে হল।'

আমরাও হাসছি। কিন্তু আন্-এর শেষ দুর্গতির কথা স্মরণে আছে বলে চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে। সেই প্রাচীন দিনের এক হতভাগ্যের গান,

'I am dancing with tears in my eyes'.

সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আন্ তাদেরই সঙ্গে লুক্কায়িত একটি ইহুদি ছোকরার প্রেমে পড়ে। তখন লিখছে—আমি কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

'রবিবার ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

কালকের দিনটা আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। প্রথম চুম্বন। প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এক স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই জন্যেই কালকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কাল সন্ধ্যাবেলা পিটারের ঘরে আমরা দু'জনা চৌকির ওপর বসে ছিলাম। খানিকক্ষণ পরে ও আমার কাঁধের উপর হাত রাখল। আমিও ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও তখন আমাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। এর আগেও আমরা অনেকবার এই রকম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসেছি, কিন্তু এবার আমাদের সান্নিধ্য অনেক নিবিড় ও উষ্ণ। আমার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছিল।...ঐ সময় আমার যে কি আনন্দ হচ্ছিল, তা লিখে বোঝাতে পারব না...তার পরের মুহূর্তগুলো আমার ঠিক মনে নেই। নিচের দিকে যাবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছি, ও তখন হঠাৎ আমায় চেপে ধরে আমার কপালে, গালে, গলায় এবং বুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। আমি কোনো রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে নিচে পালিয়ে এলাম।

আজকের আবার ঐ মুহূর্তগুলির জন্য প্রতীক্ষা করছি।

তোমারই আন্।'

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র সাড়ে সতেরো। মনে হচ্ছে, এটি নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর প্রথম প্রণয়।

এর পূর্বে আন্ অতিশয় সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার 'দেহের বহির্ভাগে বিস্ময়কর যা ঘটেছে', কিন্তু বলছে : 'দেহের অভ্যন্তরে যা ঘটেছে তা আরো রহস্যঘন বিস্ময়। ইতিমধ্যে আমি তিন বার ঋতুমতী হয়েছি।...এখন আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত সব কামনা জাগছে। কোনো কোনো দিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে নিজের স্তন দুটোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়। এ

বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।...'

এ স্থলে উদ্ধৃতিটি অসম্পূর্ণ রেখে বলি, ধন্য ধন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র। তিনি কী করে জানলেন বালিকা যখন কিশোরী হয় তখন তার দেহানুভূতি হৃদয়ানুভূতি!

ওগো তুমি পঞ্চদশী,
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে॥
যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলো ছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে॥'

এই যে "যেন অরণ্যমর্মর / গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর" ঠিক সেই অনুভূতিই তো আন্ প্রকাশ করছে যখন সে বলছে 'এ-বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।'

ততোধিক আশ্চর্য, ঠিক ঐ সময়েই প্রেমবোধের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবোধও জাগ্রত হয়েছে। তার দয়িত পিটারের কথা ভাবতে ভাবতে বলছে,

'এর উপর আরো বিপদ, ও ধর্ম ও ভগবান মানে। ধর্ম মানুষের এক বিরাট অবলম্বন—স্বর্গীয় বিধানের উপর ক'জন লোক পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারে?

(রবীন্দ্রনাথের 'আমার গুরুর আসন কাছে / সুবোধ ছেলে ক'জন আছে?' —লেখক) কিন্তু যারা পারে, তারা সত্যিই সুখী। আর নিজের বিবেক যখন ধর্মের বিধানের সঙ্গে যোগ খেয়ে যায় তখন যে শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই!'

এ-অধম স্তম্ভিত। 'ধর্মের বিধানে'র সঙ্গে যে প্রায়ই বিবেকের দ্বন্দ্ব লাগে সেটা সে ঐ অতি অল্প বয়সে হৃদয়ঙ্গম করলো কী করে!

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় ইহুদিদের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রাইন নদীর পারের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর। এরই এক পরিবারে আন্ ফ্রাঙ্কের জন্ম ১২ই জুন, ১৯২৯-এ[১]। ১৯৩৩-এ হিটলার গদিনশীন হলে পর আন্-এর পিতা

১ আন্ তিন-তিনবার তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন তাঁর জন্মদিন ১২ জুন।

সপরিবার হল্যাণ্ডের আম্‌স্‌টের্ডাম চলে যান। (আইনস্টাইনও ঐ বৎসরে আমেরিকা যান)।

স্বয়ং আন্‌ লিখছেন (তখন তাঁর বয়স তেরো): 'আমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা জর্মনিতে রয়ে গেলেন তাঁরা নাৎসিদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। তখন আমার দু'-মামা আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতাম। ১৯৩৮ সালে যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানো শুরু হল, তখন আমার বুড়ী দিদিমা আমাদের কাছে চলে এলেন। তাঁর বয়স তখন ৭৩।'

১৯৪০-এর মে মাস থেকে আরম্ভ হল হল্যাণ্ডবাসী তাবৎ ইহুদিদের বিপর্যয়। হিটলার হল্যাণ্ড দখল করে এমন সব আইন পাস করলেন যাতে করে ইহুদিদের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো।

হিটলার হল্যাণ্ড বিজয়ের দুই বৎসর পরও আন্‌ লিখছেন:

'হাজার রকম বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন কাটতে লাগল। আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না। তবুও তখন অবস্থাটা একেবারে অসহ্য হয়নি।'

বেচারী আন্‌—আন্‌ কেন, কজন ঐ ১৯৪২-এ জানতো যে হিটলার ১৯৩৯ সালেই মনস্থির করে গোপনে হুকুম দিয়েছেন, নির্যাতন উৎপীড়ন দিয়ে আরম্ভ করে শেষটায় ইহুদিদের সবংশে ও সমূলে নিধন করতে হবে। বিশেষ করে হল্যাণ্ড দেশটিতে যেন একটি ইহুদিও জীবন্ত না থাকে।

কিন্তু আন্‌-এর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। ৫ই জুলাই ১৯৪২ সালে আন্‌ লিখেছেন,

'একদিন বাবার সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলাম, বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন "শোন আন্‌, এখন যত পারো আনন্দ করে নাও, কেন না খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে চলে গিয়ে কোনো নতুন জায়গায় লুকোতে হবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন বাবা, এখান থেকে কোথায় যাব? লুকোতেই বা হবে কেন?" তিনি বললেন, "জর্মনরা এসে আমাদের ধরবার আগেই আমরা

অথচ প্রামাণিক জর্মন্‌ বিশ্বকোষ ড্যার গ্রসে ব্রহহাউস (১৯৫৮, অ্যারগান্‌ৎ-স্যুংসবান্‌ট, পৃ ১৫৭) লিখছেন ১৪ই জুন। জর্মন-প্রবাসী কোনো বঙ্গসন্তান যদি অনুসন্ধান করে পাকা খবর জানান তবে উপকৃত হই। তবে কি ইহুদি ক্যালেন্‌ডারের সঙ্গে চালু ক্যালেন্‌ডারের কোনো ফেরফার আছে?

লুকিয়ে পড়ব।" ব্যাপারটা তখনও ভাল করে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।'

এর পাঁচ-সাত দিন পরই ফ্রাঙ্ক পরিবারকে তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে চারতলার পিছনের দিকে গুটিকয়েক কুঠুরিতে গোপন আশ্রয় নিতে হল। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ইহুদি পরিবারও আশ্রয় নেয়। সবসুদ্ধ আটটি প্রাণী। প্রায় দুই বৎসর এখানে লুকিয়ে থাকার পর এদের সকলেই ধরা পড়ে। এর পরের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এই দুই বৎসর ধরে আন্ তাঁর ডাইরিটি লিখে যান। যখন ডাইরিটিতে লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স তেরো, যখন ধরা পড়েন তখন তাঁর বয়স পনরো বৎসর। ষোল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আন্ জর্মন কনসানট্রেশন ক্যাম্পে টাইফাস জ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে মারা যান। তাঁর আঠেরো বছরের দিদি মারগট (মারগারেট)-এরও টাইফাস হয়েছিল এবং ক্যাম্পের একই কামরায় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। ঐ একই সময়ে এঁদের মা-ও ক্যাম্পে যারা যান। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। পরিবারের মাত্র একজন, পিতা অটো দৈববলে অবলীলাক্রমে বেঁচে যান।

এই ডাইরিখানার বৈশিষ্ট্য কি ?

যুদ্ধশেষে, মোটামুটি ১৯৪৯ সালে ডাইরিখানা ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে বইখানি জর্মনে অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপ আমেরিকাতে প্রচুরতম খ্যাতিলাভ করে। কয়েক বছরের ভিতরই বইখানা ন্যূনাধিক ত্রিশ-চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অনবদ্য বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরুণ সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে ডাইরিটি অবলম্বন করে যে নাটকটি রচিত হয়—সেই জর্মন বিশ্ব-কোষের ভাষায়—বিশ্বের সর্বমঞ্চে অভিনীত হয়েছে (য়্যাবার ডী বুনেন ড্যার ভেল্ট্)। ফিল্ম জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, তবে শুনেছি এর ফিল্ম নাকি এদেশেও এসেছিল।

ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের লেখা একটি রোজনামচা কী করে এতখানি খ্যাতি অর্জন করলো। এ যেন সেই 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কী গো বিস্ময় !'

বইখানা যতবার পড়ি ততবার মনে হয় এর পাতার পর পাতা তুলে দিয়ে 'কত না অশ্রুজল' পর্যায়ের সমাপ্তি টানি। কিন্তু স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে সেটা

সম্ভবপর নয়। তবে আন্-এর কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয় দেবার জন্য অত্যল্প তুলে দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে তুলে দি আন্ কিভাবে রোজনামচা লেখা শুরু করেন।

শনিবার, ২০ জুন ১৯৪২ (জর্মনি কর্তৃক হল্যাণ্ড দখলের দুই বৎসর পরে—লেখক)

'আমার ডায়েরি লেখার খেয়াল একটু অদ্ভুত। আমার বয়সী কোনো মেয়ে ডাইরি লেখে বলে তো আমি শুনিনি। আর তেরো বছরের মেয়ের মনের কথা জানবার কারই বা মাথাব্যথা পড়েছে? কিন্তু তবুও আমি লিখছি। আমার মনের গহনে যে সব ভাব রয়েছে, সেগুলোকে আমি প্রকাশ করতে চাই।

একটি প্রবাদ আছে: "মানুষের থেকে কাগজ অনেক বেশী সহিষ্ণু"। একদিন নিরানন্দ আলস্যের মধ্যে গালে হাত দিয়ে যখন ভাবছিলাম, কি করে সময় কাটানো যায়, সেই সময় এই কথাটা আমার মনে এল।

এখন আমার সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।'

এরপর আন্ বলছেন তাঁর বাপ, মা, বোন এবং প্রায় ত্রিশজন বন্ধু আছেন। এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে আমাদেরই মতো 'গুষ্টিসুখ' অনুভব করতে খুবই ভালোবাসে।

তবু আন্ বলেছেন, 'কিন্তু তবু আমি নিঃসঙ্গ। সুতরাং এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আমি এই ডাইরি লিখছি; কিন্তু এই ডাইরি আমি চিঠির আকারে লিখব। আমি এক কাল্পনিক বন্ধু ঠিক করেছি—তার নাম কিটি (ইংরেজিতেও কিটি, ক্যাৎরীন—লেখক), আমার এই ডায়েরি কিটিকে লেখা চিঠির আকারে লিপিবদ্ধ হবে।'

পাঠকের মনে এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্ কি জানতেন তাঁর এ-রোজনামচা একদিন প্রকাশিত হবে?

আন্‌কেই বলতে দিন:

'বুধবার ২৯শে মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

বলকেস্টাইন নামে একজন মন্ত্রী লণ্ডন থেকে একদিন বেতার-বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—হল্যাণ্ডের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন—জর্মন অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের ডায়েরি যোগাড় করতে হবে; তা যদি হয়, তা হলে আমার এই ডায়েরির খুব কদর হবে। ভাবতে কী মজাই না লাগছে! বাস্তবিক দশ বছরে পরে আমার এই ডায়েরি যদি লোক পড়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে দশ নয় পাঁচ বছর পরেই বিশ্বজন এই

বইখানিকে হৃদয়ে টেনে নিয়ে তার প্রভূততম 'কদর' দিয়েছে—লেখক) তা হলে আমরা এখানে কি অবস্থায় কাটিয়েছি, তা জেনে তারা অবাক হবে।'

এর দেড় মাস পর আন্ আবার কিটিকে জানাচ্ছেন :

'কিন্তু জীবনের চরম লক্ষ্য সাংবাদিক ও বড় লেখিকা হওয়া—সে কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না। আমার এই অলীক আশা কোনোদিন সফল হবে কিনা, তা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু আমার ডায়েরি যুদ্ধ শেষ হলে আমি ছাপিয়ে বার করব—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

তোমারই অ্যান্'

বস্তুত লেখিকা হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন আন্-এর সব কটিই ছিল, কিন্তু বিধাতা তাঁর জন্য রেখেছিলেন অকালমৃত্যু।

জানি না, আমার দরদী পাঠক এর থেকে কোনো সান্ত্বনা পাবেন কিনা। যে আন্-এর মৃত্যুর জন্য হিটলার হিমলার দায়ী, তাদের দুজনকেই আত্মহত্যা করতে হয় আন্-এর মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যে।

যে নাৎসি নেতা সাইস-ইন্‌কুভারট ফ্রাঙ্ক পরিবার গ্রেফতার হওয়ার সময় হল্যাণ্ডের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি প্রধানত হল্যাণ্ডে কৃত তাঁর কুকীর্তির জন্য ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমার বিচারের পর—আন্-এর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর—ঝোলেন ফাঁসি কাঠে। গেস্তাপো নেতা কালটেন ব্রুনারও ঐদিন একই পন্থায় ও-পারে যান এবং তাঁর সহকর্মী আইকমানকে ফাঁসি দেয় ইহুদিরা কয়েক বৎসর পরে—ইজরায়েলে।

ধন্য অবাঙালী !

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতকগুলো ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসী দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী, এমন কি প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকা মাদাম তাবুই-এর একখানা বই আছে যার শিরোনামা 'লা পেরফিড আলবিয়েঁ' (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ। (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে এ 'কুসংস্কারে'র জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসীও অনেকখানি)।

এরকম ঢালাও 'জাতিবিচার' থেকে ঐ যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলীওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসতো দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বললে, 'আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু' চান্না হোতা হৈ।' আমরা তো অবাক—কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন কোনোটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি—সরকারের 'অধিক ফসল ফলাও' কান ঝালাপালা-করা প্রপাগাণ্ডা সত্ত্বেও! পাঠান ফের বললে, 'ঘর ঘর মেঁ।' আমরা তো আরো সাত হাত পানীমেঁ। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান 'আলু চান্না' বলতে 'আলোচনা' বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এ-স্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডা-বাজিতে কলকাত্তাইয়া এখনো অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজীল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্রিকেট "খেললুম" ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজির টিমে আছেন চারটে রণজী, তিনটে ব্রাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুগ্‌লির জন্য ঐ একটা বসান্‌কে। তা সে-কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়—সাম্‌বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবোশাম নিত্যি নিত্যি দু-পাশে দেখে রকের পর রক—মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাতবিচারটা একদম ভুল বেরুলো। বললে, 'কলকত্তেমে বহুৎ অচ্ছী ফার্সী বোলী জাতী—হর্ রাস্তে পর।' বলে কী? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি; হয়তো বা পাঠান কলকাতার মুদীর দোকানে ঐ দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় "অচ্ছী ফার্সী" বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝালে, দিনে অন্তত একশ' বার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফার্সী উচ্চারণে "ব্‌-তালাশে বক্রী"। এ-স্থলে বাঙালী পাঠককে বোঝাই "ব্‌" = with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে-বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌হাল = বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মল = বমাল গ্রেফতার) "তালাশ" = তল্লাসী; এবং "বক্রী" = ছাগল। অর্থাৎ কোনো লোক বক্রীর তল্লাসীতে (for বক্রী) বেরিয়েছে।

এ কি কথা! আমরা তো কখনো শুনিনি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বললে, ঐ তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রী।"

ওমা! ইয়াল্লা! ও হরি! ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে "বোতল আছে বিক্রি!"

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাতবিচারে ভুল হয়ে গেল।

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি:

এক ফরাসী নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসী সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধোলো, 'ব্যাপারটা কি?' মার্কিন বুঝিয়ে বললে, 'ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো-বুড়ী—এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের "বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী" পালন করছেন।' ফরাসী বললে, 'অ বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পর এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।' তারপর খানেকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললো, 'তা—তা ঐ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।'

পাঠানের গল্প যে-রকম "জাতিবিচারে"র ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসী ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনত সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে?

কিন্তু এ-বিষয়ে ফরাসীদের নিয়েই এ-গল্পটা তৈরী হল কেন?

আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, যোহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি 'কুমারী'কে বিয়ে করলেন, তখন সেই 'কুমারী'র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে যোহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ঐ যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটিই জর্মনীর ফুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করেছিলুম। এইবারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ

*W. Shirer; Aufsteg unid Fall in S. W. পৃষ্ঠা ৭।

হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'ভারতীয়েরাও যাবে।' কিন্তু শ্রীযুত সত্যেন বসু এ-বাবদে উদাসীন। তাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।' বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইণ্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল, একজন বাঙালী, বাকি দু'জন ভিন্ন প্রদেশের।

যে-কর্তা ইণ্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালীকে। শুধোলেন, 'চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?'

'পাঁচ লাখ।'

'অত কেন?'

'এজ্ঞে, বুড়ো মা বাপ রয়েছেন। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দু'টো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ঐ টাকাতেই তাদের চলে যাবে।'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

তার পর ডাকা হল দ্বিতীয় জনকে। সে-প্রদেশের লোক একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। বললে, 'দশ লাখ।'

কর্তা: 'অত কেন?'

'হানজী পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ—রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো নাও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটখ। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাবো বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিত, ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য!'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

এরপর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, 'অত বেশী কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—

"বাবুজী, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ঐ ব্যাটা বাঙালীকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।"

এই বারে পাঠক, বের করো তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান! "প্রকাশককে" এ-বাবদে চিঠি দেবে না। তিনি ছাপাবেন না। আমাকেও লিখবে না। আম্মো উত্তর দেব না।

নট গিলটি

সর্বপ্রথম যেদিন আমার লেখা ছাপাতে বেরুলো তার কয়েক দিন পরই 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় আমাকে একখানি চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠালেন। চিঠিখানা আমার উদ্দেশে লেখা। পত্রলেখক আমার ঠিকানা জানেন না বলে সেটি সম্পাদকের C/o করে লিখেছেন। এইটেই বিচক্ষণের লক্ষণ। এবং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে, যে-সব স্পর্শকাতর পাঠকপাঠিকা কারো কোনো লেখা পড়ে মুগ্ধ হন, বিরক্ত হন বা বিচলিত হন তাঁরা যেন তাঁদের মানসিক, হার্দিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের মারফতে লেখকের কাছে পাঠান। এবারে বাকিটা বলছি।

প্রথম গোটা পাঁচেক চিঠি তো আমাকে অভিনন্দন জানালে। তার ধরন অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো পত্রলেখক আমাকে সবিনয়, সসম্মান, সশ্রদ্ধ আনন্দাভিবাদন জানালে, আর কোনো কোনো লেখক আমার পিঠ চাপড়ে মুরুব্বীয়ানা মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'বেশ লিখেছিস ছোঁড়া, খাসা লিখেছিস। লেগে থাক্। আখেরে টু পাইস্ কামাতেও পারবি।'

দ্বিতীয় পক্ষের মুরুব্বীয়ানা আমাকে ঈষৎ বিরক্ত করেছিল, সে-কথা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু সেটা ক্ষণতরে। কারণ, আমি কাগজে লেখা আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। ততদিনে বাস্তব জীবনে নানা প্রকারের চড়-চাপাটি খেয়ে খেয়ে আমার দেহে তখন দিব্য একখানা গণ্ডারের চামড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিস্তর মুরুব্বী এতদিন ধরে, আমার কর্মজীবনে আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে এন্তের সদুপদেশ দিয়েছেন। কই? আমি তো তখন চটিনি। অবশ্য এনারা উপদেশ দিয়েছিলেন বাচনিক; উপস্থিত যে-সব ঐ-জাতীয় মুরুব্বীয়ানার চিঠি আসছে সেগুলো 'লেখনিক'।

তাতে কীই বা যায় আসে!

কিন্তু আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগলো, এ-সব তাবৎ ব্যক্তিগত চিঠির প্রত্যেকটির উত্তর আমাকে স্বহস্তে লিখতে হবে কি না?

তা হলেই তো হয়েছে! কতখানি সময়, শক্তিক্ষয়, ডাকটিকিটের ব্যয়, কে জানে?

আমার টাইপরাইটার আছে। আমি অবশ্যই আধ ঘণ্টার ভিতর খান তিরিশেক কার্বন কপি তৈরি করতে পারি। তার বক্তব্য হবে 'Many

thanks for your good wishes.'

উঁহু। হল না।

যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁরা সাহিত্যরসিক-রসিকা। তাঁরা চান, সাহিত্যিক উত্তর। লন্‌ড্রির চিঠিতে প্রশ্ন, 'আপনার অত অত নম্বরের জামাকাপড় ছাড়াচ্ছেন না কেন?' আপনি তখন ঐ গদ্যময় বেরসিক ভাষায়ই উত্তর দেবেন। কিন্তু এনারা তো সাহিত্যিক উত্তর চান।

ইতিমধ্যে আরেকখানি মোলায়েম চিঠি। তার বক্তব্য, মোটামুটি যা মনে আসছে, কারণ চিঠিখানা আমার বউ পুড়িয়ে ফেলেছেন:

'মহাশয়, আমার মনের গভীরতম কথাটি আপনি কী মরমিয়া ভাষায়ই না প্রকাশ করেছেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় তিন পাতা জুড়ে। পড়ে আমিও রোমাঞ্চিত হলুম। লেখিকাকে মনে মনে সুক্‌রিয়া জানালুম।

কিন্তু ইয়াল্লা! আমি খেজুর গাছের শেষ আড়াই হাতের দিকে আদৌ খেয়াল করিনি। কিংবা বলতে পারেন, বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে বসে আছি।

চিঠির সর্বশেষে আছে, 'আমি পঞ্চদশী। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে স্বহস্তে দিতেই হবে!' এবং তার পরেই, সর্বশেষে মোক্ষম কথা: "এখন থেকে আমি পিওনের পদধ্বনি প্রতীক্ষায় প্রহর গুনব।'

সর্বনাশ, এ-স্থলে আপনি কি করবেন? আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে: 'অল-ইন্‌তিজারু আশাদ্দু মিনাল্ মউৎ।' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা করাটা (ইন্‌তিজার) মৃত্যু চেয়েও কঠোরতর।

অনেক ভেবেচিন্তে একটি হ্রস্ব চিঠি লিখে পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ জানালুম এবং সর্বশেষে একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিলুম যে, আমার বয়স বাড়তির দিকে, শক্তি কমতির দিকে, অতএব চিঠিচাপাটি লেখা বাবদে আমাকে যেন একটু সদয় নিষ্কৃতি দেওয়া হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর কি হল? আমি আশা করেছিলুম, এখানেই শেষ। মূর্খ আমি, জানতুম না, এইখানেই আরম্ভ।

দিন পনেরো পর ঐ 'পঞ্চদশী'র পাড়া থেকে এল আরো পাঁচখানা চিঠি! সব ক'টা চিঠি যে একই পাড়া থেকে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাকে ব্যোমকেশ-হোম্‌স্ হতে হয়নি। মসজিদবাড়ি পাড়া, কলকাতা-৬ আমার বিলক্ষণ চেনা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, পঞ্চদশীটি আমার চিঠিখানা তাঁর পাড়ার তাবৎ বান্ধবীকে দেখিয়েছেন।

এ-স্থলে পাঠকদের কাছে আমার একটি অতিশয় ক্ষুদ্র আরজী আছে। এবং সেটি যদি তাঁরা মঞ্জুর না করেন তবে আমি সত্য সত্যই মর্মাহত হব। এটা কথার কথা নয়, হৃদয়ের কথা। আমি জানি, আমি মোকা-বেমোকায় ঠাট্টা-মস্করা করি, কিন্তু আমার এ-আরজী মোটেই মস্করা-রসিকতা নয়—সিরিয়াস। আমার নিবেদন :

এই যে এতক্ষণ ধরে আমি আমাকে লেখা চিঠিপত্র নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটা আমার মূল্য বাড়াবার জন্য নয়।

আমি আল্লা মানি। আল্লার কসম খেয়ে এ-কথা বলছি।

আপনারা তারাশঙ্করাদি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধোন—মিথ্যা বিনয় নয়, আমি তো ওঁদের অনেক পিছনে—তাঁরা কত না কত রঙের কত ঢঙের, কত না কল্পনাতীত জায়গা থেকে, কত না অবিশ্বাস্য ধরনের চিঠি পান।

ওঁরা যত চিঠি পান, তার শতাংশের একাংশও আমি পাই না।

এখানে এসে আমাকে আরেকটি কথা বেশ জোর গলায় বলতে হবে।

অদ্যাবধি কী দেশে, কী বিদেশে আমি একটি লেখকও পাইনি যিনি অপরিচিত পাঠকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পত্র পেয়ে আনন্দিত হন না। এমন কি কড়া চিঠি পেয়েও লেখকরা খুব একটা বিমুখ হন না। তবে এ ধরনের চিঠি আসে কমই। কারণ স্বয়ং কবিগুরু বলেছেন,

"আমার মতে জগৎটাতে
ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ
ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।"

তবে লেখককুল 'তিন-চল্লিশ'-খানা 'মন্দ' চিঠি পান না, পান তার চেয়ে ঢের ঢের কম। তবে অন্য 'মন্দ' চিঠিগুলো যায় কোথায়? সেগুলো যায় সোজা সম্পাদক মহাশয়ের নামে। সেগুলোতে থাকে নানা প্রকারের প্রতিবাদ, মন্দ-মধুর সমালোচনা বা তীব্র কঠোর মন্তব্য। সম্পাদক আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলে কোনোটা ছাপান, কোনোটা ছাপান না।

এই ব্যবস্থাই উত্তম। বুঝিয়ে বলি :

আপনি আমাকে সরাসুরি চিঠি লিখলেন (সম্পাদক মহাশয়কে না), 'মহাশয়, আপনার শহ্‌র্‌-ইয়ার নিতান্তই কাল্পনিক রচনা। এ-রকম মুসলমান মেয়ে বাঙলা-দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব।' তারপর আপনি সুচারুরূপে আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সম্পদ যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করলেন।

এ-স্থলে আমি করি কি ?

আপনি এ-স্থলে বলেছেন, 'তুমি, আলী, অপরাধী !'

এ-স্থলে চিন্তা করুন তো, কোন্ অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী, স্যর !—গিল্‌টি, মিলাট্ (মাই লর্ড) !'

ব্যাপার যদি এতই সরল হবে তবে তো আদালতের শতকরা নব্বুইটি মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গে ফৈসালা হয়ে যেত।

কিন্তু আমি "নট্ গিলটি" বললেই তো অনুযোগকারী পত্রলেখক (প্রসিকিউশন, ফরিয়াদী) সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেবেন না।

তাই পুনরায় প্রশ্ন, এ-স্থলে আমি করি কি ?

এইবারে আমি আমার মোদ্দা কথাতে এসে গিয়েছি।

পত্রলেখক যদি তাঁর অনুযোগ আমাকে সরাসরি না লিখে সম্পাদক মশাইকে জানাতেন, তবে আমি বেঁচে যেতুম। সম্পাদক মশাই না ছাপালে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। অর্থাৎ মোকদ্দমা আদৌ আদালতে উঠলো না।

কিন্তু তিনি ছাপালেও আমি খুশী। কারণ, তখন যাঁরা এ-বাবদে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁরা আমার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ভূরি ভূরি প্রমাণ পেশ করবেন যে, শহ্‌র্-ইয়ার আদৌ কাল্পনিক নয়।

আমার মনে হয়, এই পন্থাই (প্রসিডিয়র) সর্বোত্তম।

এ-বাবদ ভবিষ্যতেও লেখার আশা পোষণ করি।

ইতিমধ্যে, দোহাই পাঠক, তুমি আদৌ ভেবো না, আমি সরাসরি চিঠি পেতে আদপেই পছন্দ করি না। খুব পছন্দ করি, বিলক্ষণ পছন্দ করি।

কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়াটা যে বড়—॥

ব্রেন-ড্রেন

যাঁরা এদেশে গবেষণা করার সুযোগ পান না, তাঁদের অনেকেই ইংলণ্ডে চলে যান। আবার বিলিতি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন, সেখানেও ওই একই ব্যাপার ; মেধাবী বৈজ্ঞানিক তার জুতো থেকে ইংলণ্ডের ধুলো ঝেড়ে ফেলে মার্কিন মুল্লুকে চলে যায়। সেখানে বেশী মাইনে তো পাবেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে গবেষণা করার জন্য পাবে আশাতিরিক্ত অর্থানুকূল্য। অধুনা

'গৌরীসেন' মার্কিন সিটিজেন্‌শিপ গ্রহণ করে সেখানেই ডলার ঢালেন।...জর্মন কাগজেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ওদের তরুণ বৈজ্ঞানিকদেরও কিছু কিছু মার্কিন-মক্কায় চলে যাচ্ছে।

থাকি মফস্বলে। কলকাতায় পৌঁছলুম ল্যাটে। তবু দেখি, পাড়ায় ঝাণ্ডুতম রক খুরানা সায়েবের মার্কিন নাগরিকতা গ্রহণ নিয়ে সরগরম, মালুম হল, মতভেদ ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। রকের খলিফে-বেঞ্চ বলছেন, যে-যেখানে কাজের সুযোগ পাবে, সে সেখানে যাবে—বাংলা কথা। পক্ষান্তরে তালেবর-বেঞ্চ যুক্তিতর্ক সহ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'খুরানা মহাশয়ের উচিত ছিল দেশে থেকে দেশের সেবা করা। এবং উচিত-অনুচিতের কথাই যখন উঠলো তখন বলতে হবে এদেশের কর্তৃপক্ষই পয়লা নম্বরের আসামী। নিজেরা তো কিছু করবেনই না, যারা করতে চায় তাদেরও কিছু করতে দেবেন না। একেবারে ডগ অ্যানড দি ম্যানেজার—'

তালেবর পক্ষেরই এক ব্যাক-বেঞ্চার ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলো, প্রবাদটা কি 'ডগ অ্যানড দি মেইনজার—' নয়?

'আলবৎ নয়। এখন এঁরা সব ম্যানেজার!'

এরপর কর্তাদের নিয়ে আরম্ভ হল কটুকাটব্য। আমি প্রাচীন যুগের লোক—ডাইনে বাঁয়ে চট করে একবার তাকিয়ে নিলুম। টেগার্ট সায়েবের প্রেতাত্মা আবার কোথাও পঞ্চভূত ধারণ করেননি তো!

খলিফে পক্ষের এক চাঁই মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। কাজ করতেও দেবে না। তবে শোনো, আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি—যদিও সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন না—ভিন্ন রাষ্ট্রের কাউকে আপন রাষ্ট্রে চাকরি দেবেন না। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক সাবজেক্টে ঝাড়া বিশটি বছর ধরে কেউ মাস্টার্স ডিগ্রীতে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। বুড়ো-হাবড়া অধ্যাপকরা রিটায়ার করতে চান না। ওদিকে পোস্ট গ্রাজুয়েটে কাউকে লেকচারার তক নেবেন না—যদি ফার্স্ট ক্লাসের 'হরিন্নাম' তার সর্বাঙ্গে ছাপা না থাকে। এদিকে চন্দনের বাটিটি বিশটি বচ্ছর ধরে তাঁরা ঝুলিতে লুকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। শুধোলে অবশ্য বলেন, 'ঘোর কলিকাল মোশয়, ঘোর কলি-কাল। পাষণ্ড, পাষণ্ড, পাষণ্ডের পাল। অধ্যয়নে কি এঁদের কোনো প্রকারের আসক্তি আছে? পড়েননি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রতিবেদন?—স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে "ছাত্রসমাজে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজে, মদ্যাদি সেবন দ্রুতগতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধমান!"—এদের গায়ে কাটবো হরিন্নামের ছাপ! মাথা খারাপ!'

খলিফে পক্ষের আরেক 'খাজা' বললেন, 'বিলক্ষণ! ভাল্লুকের সব্বাঙ্গে লোম। এম-এর তেড়ি কাটবে কোথা?'

প্রথম চাঁই সোল্লাসে বললেন, 'বিলকুল! যে দেশের মেস্টার পুত্রবৎ ছাত্রকে স্নাতকোত্তর করতে চায় না, সে দেবে তাকে রিসার্চ করতে! ঐ আনন্দেই থাকো।'

খলিফের খাজা বললেন, 'যথা, পিতার প্রেতাত্মা দাবড়ে বেড়াবেন বিশ্বময়, কিন্তু পুত্রকে দেবেন না—এস্তেক পিণ্ড-দাদনখানে—পিণ্ড দিয়ে অশৌচ সমাপ্তি করতে।'

তালেবর বেঞ্চ ঢিড্ খেয়ে যাবার খাবি খাচ্ছে দেখে তাদের এক ঝানু তখন 'ফীলিঙে'র শরণাপন্ন হলেন।

এস্থলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহব্যথা, হৃদয়বেদনা এ-শব্দগুলো বড্ডই মোলায়েম মরমিয়া। অপিচ 'ফীলিঙ' কথাটার 'ফ' হরফে কট্টর জোর দিয়ে (অবশ্যই ইংরাজী 'F'-এর মতো উচ্চারণ না করে) শব্দটা বললে তবেই না গভীর ভাবানুভূতির খানিকটে প্রকাশ পায়![১]

সেই 'ফ' উচ্চারণ করে ঝানু-তালেবর ভাবাবেগে বললেন, 'pfi-লিঙ নেই, pfi-লিঙ নেই, সব ফলানা ফলানা খুরানাদের কারোরই ফীলিঙ নেই দেশের প্রতি। দেশে বসে কি রিসার্চ করা যায়—'

কথা শেষ না হতেই খলিফে পক্ষের আরেক গুণীন্ মিনমিনিয়ে বললেন, 'নৌকোতে বসে কি গুণ টানা যায় না!'

ওই পক্ষের আরেক জাঁহাবাজ বললেন, 'কিংবা মাতৃগর্ভে শুয়ে শুয়ে দেশভ্রমণ!'

এইবারে রকের বারোয়ারি 'মামা' মুখ খুললেন। ইনি আমাদের রকের প্রেসিডেন্ট! এঁরই রকে আমরা দু-দণ্ড রসালাপ করি। কিন্তু ইনি থাকেন প্রাচীন দিনের একটি সোফাতে শুয়ে ঘরের ভিতরে। অনেকটা কবিগুরুর 'রাজা' নাটকের রাজার মতো। অবরে-সবরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' একটি লবজো ছাড়েন।

বললেন, 'সে রকম নিষ্ঠা থাকলে কি দেশে থেকেই রিসার্চ করা যায় না? সেইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।[২]

১ অর্থাৎ 'প্রফুল্ল' শব্দ আমরা যে-ভাবে উচ্চারণ করি সে-ভাবে নয় মারওয়াড়িরা যে-তাবে 'পর-ফু (pf)-ল্ল' উচ্চারণ করেন তারই 'ফ'।

বিজ্ঞানের বেলা অর্থাৎ এপ্লায়েড সায়েন্সের বেলা, আজকাল বিস্তর যন্ত্রপাতি, মালমসলার প্রয়োজন। তার জন্য প্রচুর আয়োজন; প্রচুরতর অর্থ না থাকলে এসব হয় না। অবশ্য, এ-কথাও সত্য জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি এবং আরো মেলা লোক এসব না থাকা সত্ত্বেও এস্তের কেরামতি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব দিন হয়তো গেছে। আজকের দিনে স্বয়ং লেওনারদো দা ভিন্‌চিও সরকারী গৌরীসেনের সাহায্য ছাড়া এটম্ বম্ বানাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু পিওর সায়েন্স? পিওর ফিজিক্স, ম্যাথ্‌মিটিক্স,—আরো বিস্তর বিষয়-বস্তু আছে যার জন্যে কোনোই যন্ত্রপাতি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না—সে-গুলোর বেলা কি? তা হলে শোন, একটা গল্প বলি, সত্যি-মিথ্যে জানি নে, বাবা! একদা কালিফর্‌নিয়ায় এক বিরাট ইন্‌স্টিটুটে বিরাটতর টেলিস্কোপ লাগানো উপলক্ষে মাদাম আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সরলা মাদাম সেই দানবপ্রমাণ যন্ত্রটা দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত।

'যেহোভার দোহাই!' প্রায় চীৎকার করে উঠলেন মাদাম: 'এ যন্তরটা লাগে কোন্ কাজে?'

বড় কর্তা হাত কচলাতে কচলাতে খুশিতে ফাটোফাটো হয়ে বললেন, 'মাদাম, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার পরিপূর্ণ স্বরূপ (Gestalt) হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এটি অপরিহার্য। এ বাবদে আপনার স্বামী, আমাদের গুরুর অবদানও তো হেঁ, হেঁ—।'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাদাম বললেন, 'সে কি! আমার কর্তা তো ওয়েস্ট পেপার বাসকেট থেকে একটা পুরোনো খাম তুলে নিয়ে তার উল্টো পিঠে এসব করে থাকেন।'

'তবেই দেখো, হয়ও অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ছাড়াও।'

কিন্তু এসব বাদ দাও এবং চিন্তা করো, দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, প্রাচ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অলঙ্কার, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এস্তের এস্তের সবজেক্ট রয়েছে যার জন্য কোনো ক্ষুদে গৌরীসেনেরও প্রয়োজন হয় না।

মামা দম নিয়ে বললেন, 'এবারে বাবারা বলো, তোমরা তো অনেক সবজেক্টে অনেক পাস দিয়েছ; গত তিরিশ বছরে এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে কোন্ কোন্ মহাপ্রভুর দর্শন ইত্যাদি সবজেক্ট গবেষণার বিশল্যকরণী সমেত গন্ধমাদন উত্তোলন করে ভুবন "ভির্খাতো" হয়েছেন? বাঙলাদেশের কথা বিশেষ করে বলুন, কারণ একদা এদেশ হিন্দুস্থানের লীডার ছিল।'

মামার চোখে-মুখে ব্যঙ্গভরা বেদনা।

এইবারে আমি মুখ খোলার একটু মোকা পেয়ে বললুম, 'তা মামু-সায়েব—রিসার্চের জন্য কড়ি লাগুক আর নাই লাগুক, যে লোকটা রিসার্চ করবে তার পেটে, তার সমাজের আর পাঁচজনের পেটে যদি দুমুঠো অন্ন না থাকে তবে কি রিসার্চ হয়? আজ এই কলকাতা শহরে আর সকলের পেটেই অন্ন আছে—নেই শুধু বাঙালীর।

মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যেন আপন মনে বিড়বিড় করে—'১৮২০ থেকে ১৯২০। ঐ সময়টায় কলকাতায় বাঙালী সচ্ছল ছিল। যা-কিছু করেছে ঐ সময়েই করেছে। আজকের দিনে দু-পাঁচটা প্রফেসরের দু-মুঠো অন্ন জোটে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু তার আর পাঁচটা ভাইবেরাদর, মোদ্দা কথা তার গোটা সমাজ (Gestalt) যদি নিরন্ন হয় তবে এই দু-পাঁচটা প্রফেসরও কোনো কিছু দেখাবার মতো করে উঠতে পারে না। সী-লেভেল থেকে আচমকা এভারেস্ট মাথা উঁচু করে খাড়া হয় না; তবে লেভেল অর্থাৎ তার সমাজ অনেকখানি উঁচু না হলে সে আকাশচুম্বী হবে কী করে?'

আস্তে আস্তে মামা চোখ খুললেন। কড়া গলায় বললেন, '১৮২০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য—আর ঐটেই তো সমাজের সচ্ছলতা আনে—কাদের হাত থেকে কাদের হাতে গেল সেইটে একটু খুঁজে দেখ তো।' হেসে বললেন, 'ঐ নিয়ে একটা রিসার্চ কর না।'

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, দেশ-বিদেশে তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? সোজা বাংলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনো কোনো হিন্দুর বিশ্বাস "অয়, অয় Zানতি পারো না। মুহম্মদী মানুষ—অর্থাৎ মুসলমান—মরে গিয়ে মামদো হয়—মুহম্মদী শব্দ গ্রাম্য বাংলায় হয়ে গিয়েছে "মামদো"। এস্থলে Zানতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না—অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zানতি পারি না) এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনো একটা আমি দেখেছি কি না?

জর্মন ভাষার দুটি শব্দ বাংলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা "কিণ্ডার-গার্টেন" আরেকটা—যদিও অতখানি চালু না—"রিণ্ডারপেস্ট", পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন—"পল্‌টারগাইস্ট"। ভূতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইঁটপাটকেল এবং মাঝে-মধ্যে কচুপাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পল্‌টারগাইস্ট। "পল্‌টারন্" ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট = ইংরিজি গোস্ট (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনো গুজব, জনরব—একুনে গুজোরব—পৌঁছনো মাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের মতো অবিশ্বাসী (অনবিলীভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জর্মন জাতের পল্‌টারগাইস্টকে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনো ইংরিজি দিকসুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্‌শনারী) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনো কোনো গুণিন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তার তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনো কোনো পীর সাহেবও নাকি এখনো এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে-কোনো কালে কাবুলী মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয় মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দূর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানায়। তারপর কি একটা হুকুম করে—খুব সম্ভব জল আনতে—তারপর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ হয়েছে কি, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি !···শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করলো। গুরু এসে এই ভূতকে অন্য হুকুম দিলেন, 'আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোনো। তারপর অন্য কাজ।' এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ-বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

সে-গল্পের গোড়াপত্তন ঐ একই। আমাদের গল্পেও গুরুর কাছ থেকে

সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনো-কিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বললে, 'আমার জন্য একটা রাজ-প্রাসাদ তৈরি করে দাও।' দু-মিনিট যেতে না যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বললে, 'তার পরের হুকুম?' চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বললে, 'গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।' ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললে, 'সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্ধু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি?' চেলা বললে, 'তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।' এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোলে, 'তার পরের কাজ?' চেলা তখন আরো মেলাই অর্ডার দিলে। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাড়টা মটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহাসঙ্কটে। নূতন অর্ডার আর খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতোই সে ভূত বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মতো সে তার গুরুকে স্মরণ করলে।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফার্স্ট প্রেফারেন্সের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, 'ভূতকে হুকুম দাও একটা বাঁশ পুঁততে।' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, 'এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ঐ বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠা মাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচে। ফের উপর। ফের নিচ।'

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, 'ঐ করুক, ব্যাটা অন্তত কাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য-কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তাকে ওঠানামা ক্ষণতরে ক্ষান্ত দিয়ে সে-কাজ করতে বলবে। তারপর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

মানুষের মন ঐ ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরাজিতে তাই প্রবাদ "অলস

মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মতো মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে, আমি শান্তনু পাঠকের হাতে খাবো কিল।

মহাত্মাজী চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মতো বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন-তিনবার কপি করেছেন। যদিও ঐ মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন।

স্পাই

আশ্চর্য!

মানুষ কত সহজে বিশ্বকুখ্যাত লোককে ভুলে যায়—বিশ্ববিখ্যাত লোককে ভোলাটা মানুষের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক।

মাতা হারিকে সচরাচর পৃথিবীর লোকে পয়লা নম্বরী স্পাই খেতাব দিয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সে-খ্যাতির চৌদ্দ আনা পরিমাণ গুজোব আর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করছে। বাকি দু-আনাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা বলা সুকঠিন।

কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের স্পাইদের রাজার রাজা রিষার্ট জর্‌গে সম্বন্ধে অনেক কিছু পাকা খবর জানা গিয়েছে। অবশ্য এ-সত্য প্রতিভাসিত যে, যে-কোনো স্পাই সম্বন্ধে সব খবর কোনোদিনই পাওয়া যায় না। স্পাই ধরা পড়ার পর তার সম্বন্ধে সব খবর যদি খুঁড়ে বের করা যায় তবে সে ওঁচা স্পাই।

কিন্তু তার পূর্বে আরেকটি কথা বলে নেই। গুপ্তচরবৃত্তি বা এসপিয়োনাজের প্রথম অলিখিত আইন, গুপ্তচর যদি বিদেশে ধরা পড়ে তবে যে-দেশের হয়ে সে কাজ করছিল সে-দেশ কিছুতেই স্বীকার করে না যে ঐ-লোক তাদের গুপ্তচর। তার কারণ, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এক দেশ অন্য দেশে সরকারীভাবে গুপ্তচর রাখতে পারে না—অথচ আশ্চর্য, প্রায় সব-দেশই সেটা করে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে জর্‌গে একমাত্র ব্যত্যয়। রুশের হয়ে ইনি জাপানে

সুদীর্ঘ দশ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে স্পাইগিরি করে ১৯৪১-এ ধরা পড়েন এবং ১৯৪৪-এ তাঁর ফাঁসি হয়। যুদ্ধশেষে যখন তাঁর কর্মকীর্তির অনেকখানি প্রকাশ পেল তখন তাবৎ ইয়োরোপে হইচই পড়ে গেল এবং বহু ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর সিরিয়াল রগরগে কেতাব, সিনেমা, নাট্য ইত্যাদি তাবৎ পূর্ব-পশ্চিমকে রোমাঞ্চিত করে তুললো। বিশেষ করে জাপানকে। কারণ এইমাত্র বলেছি তার শেষ কর্মভূমি ছিল জাপান।

এবং এই ডামাডোলের মধ্যিখানে কোথায় না রুশ তার গোরস্তানের নৈস্তব্ধ্য বজায় রেখে "নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়"—সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন—নীতি পুনরায় সপ্রমাণ করবে, উল্টে পৃথিবীর সর্ব রাজনৈতিক-ঐতিহ্য ধূলিসাৎ করে সগর্বে সদম্ভে সরকারীভাবে স্পাই জর্‌গের স্মৃতির উদ্দেশে বলশেভিক রুশ দেশের সর্বাধিপতি সর্বোচ্চ সম্মান মেডেল ইত্যাদি অর্পণ করলেন—এ-মেডেল রুশ দেশের যুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদেরই দেওয়া হয় মাত্র। যতদূর মনে পড়ছে তার ছবিসহ স্ট্যাম্পও বেরিয়েছিল।[১] কিন্তু হায়, সে মেডেল গ্রহণ করার জন্য জর্‌গের দারাপুত্র পরিবার কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রীকে তিনি বহু পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ করার জন্য। অনেকটা হিটলারের মতো। তিনিও ঐ একই কারণে আদৌ বিয়ে করেননি—করলেন, যখন তাঁর রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের বৃহৎ কৃষ্ণ যবনিকা নটগুরু মহাকাল কামান গর্জনের অট্ট করতালির মাঝখানে নামিয়ে দিলেন, এবং সে-বিবাহ সেই কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে। আত্মহত্যার পিস্তল ধ্বনি সে-বিবাহের আতশবাজীর বোমা। স্ত্রীও নাট্যমঞ্চের জুলিয়েতের মতো বিষপান করলেন।...মার্কিন খবরের কাগজের নেকড়েরা এড়ি (পূর্ব বাঙলার মুসলমানী ভাষায় তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে এড়ি—ডিভোর্সে—এবং বিধবাকে রাড়ি বলে) জর্‌গেকে খুঁজে বের করলো। রমণী স্বল্প- তথা সত্য-ভাষিণী। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ন'সিকে খাঁটি স্পাইদের মতো জর্‌গে তাঁর স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে দেননি তিনি কি নিয়ে দিবারাত্র লিপ্ত থাকেন।

জর্‌গের জীবন এমনই বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল যে সুদ্ধমাত্র তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা মিনি সাইজের মহাভারত লিখতে হয়।...আমি গুপ্তচর জর্‌গেকে নিয়ে "গুপ্ত" পদ্ধতিতে দিব্য একখানা রগরগে সিরিয়াল লিখতে পারি—যত কাঁচা ভাষা ততোধিক বেঢপ শৈলীতে লিখলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য-

১ কোনো ফিলাটেলিস্ট পাকা খবর জানালে বাধিত হব

বশত সেটা উৎরে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়স হয়েছে। আমার জীবনদুর্গে প্রাচীরের বাইরে, গভীর রাত্রে যমদূতের পদধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে—এদানীং ক্রমেই টেম্পো বেড়ে যাচ্ছে—প্রাচীরের উপর সাহেবী কায়দায় নক্‌ও করে। এহেন অবস্থায় সিরিয়াল অসম্পূর্ণ রেখে উল্টোরথহীন রথযাত্রায় বেরুতে চাই নে—মমেকসদয় সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত পাঠক সম্প্রদায়ের অভি-সম্পাতকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। কাজেই সম্ভাব্য ক্ষিপ্ত পাঠকমণ্ডলীর জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ দিচ্ছি—সাতিশয় সংক্ষিপ্ত।[১]

দুই কারণে সোভিয়েত দেশ জর্‌গের কাছে চিরঋণী। অবশ্য রুশের আরো বহু সেবা তিনি করেছেন।

প্রথম : হিটলার রুশদের আক্রমণ করার বেশ কয়েক মাস অর্থাৎ পর্যাপ্তকাল পূর্বে জর্‌গে জাপান থেকে গোপন বেতারযোগে (বেতার যন্ত্রটি চালাতেন তাঁর এক সহ-স্পাই) স্তালিনকে খবর পাঠান, হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রুশ আক্রমণ করবে। শুধু তাই নয়, কোন্ মাসে, কোন্ সপ্তাহে সে খবরও পাকাপাকিভাবে জানান। আশ্চর্য, যখন খুদ জর্মনির মাত্র গুটিকয়েক ডাঙর ডাঙর জাঁদরেল জানতেন যে হিটলার রুশ আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন এবং তাঁরাও জানতেন না, কবে কোন্ মাসে হিটলার সে হামলা শুরু করবেন, তখন জর্মনি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের জাপানে বসে জর্‌গে এই পাকা খবরটি পেলেন কি করে? মনে রাখা উচিত, ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান এবং জর্মনির মধ্যে কোনো যাতায়াত পথ ছিল না। (সুভাষচন্দ্র যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে জর্মনি থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানেন।) সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপন বেতারেও—যেমন মনে করুন—খবরটা প্রথম জর্মনি থেকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গুপ্তচর মারফৎ গেল—সেটা পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরকম বেআইনী জোরদার বেতার ট্রান্সমিটার সুইস সরকার ধরে ফেলতই ফেলত। এস্থলে আরো বলি, হিটলার তাঁর যুদ্ধের প্ল্যান তাঁর দূর-মিত্র জাপানকে তো বলতেনই না, তাঁর অতিশয় নিকট-মিত্র—ভৌগোলিক ও

১ শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখকের উপকারার্থে মসলা নিবেদন। একখানা বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করার কয়েক বৎসর পর তিনি তারই একখানি 'সংক্ষিপ্ত' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "এটা হল 'সংক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ ; আগেরটা ছিল 'ক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ।"

হার্দিক উভয়ার্থে—মুসসোলিনীকেও আগেভাগে জানাতেন না। এবং জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসও আর-পঞ্চাশটা দেশে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের মতোই যে এ-ব্যাপারের কিছুই জানতো না সে তো বহুবার বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। হিটলার যে তাঁর ফরেন আপিস এবং তাঁর রাজদূতদের অবিশ্বাস করতেন তাই নয়, এদের রীতিমত ঘৃণা করতেন। এবং এ তত্ত্বটি হিটলার কোনোদিন গোপন রাখার কণামাত্র প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তাঁর আপন খাস প্যারা ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপকে। ইনি জাতে শুঁড়ি। কূটনীতিতে তাঁর কোনো শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তৎসত্ত্বেও হিটলার গদীনশীন হওয়ার সামান্য কয়েক বৎসর পর তাঁর পার্টি, ফরেন আপিস, এমন কি তাঁর দক্ষিণ হস্ত গ্যোরিঙ, বাম হস্ত গ্যোবেলস সকলের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রিবেনট্রপকে দুম করে বসিয়ে দিলেন ফরেন আপিসের মাথার উপর মহামান্য পররাষ্ট্র সচিবরূপে।

জর্‌গের দ্বিতীয় অবদান : যে-রাত্রে জাপানী মন্ত্রিসভা এক অতিশয় গোপন বৈঠকে স্থির করলেন—হিটলার রুশ আক্রমণ করার পর জাপানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তারা যেন রুশের পূর্বসীমান্ত আক্রমণ করে—যে তাঁরা কোনো অবস্থাতেই রুশ দেশ আক্রমণ করবেন না, তার পরদিন ভোর বেলা জর্‌গে সেই সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনতম সিদ্ধান্তটির খবর পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে পূর্ব পদ্ধতিতে সংবাদটি জানান। স্তালিনের বুকের উপর থেকে জগদ্দল "জগরনট" নেমে গেল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে পূর্ব সীমান্তে তাঁর যে-সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেটাকে তদ্দণ্ডেই পশ্চিম সীমান্তে এনে হানলেন হিটলারের উপর মোক্ষম হামলা। দুই সীমান্তে একই সঙ্গে কে লড়তে চায়? ঐ করে সর্বনাশ হল কাইজারের। হিটলারেরও আখেরে সেই গতিই হয়েছিল। রুশ বেঁচে গেল।

পত্রান্তরে বেরিয়েছে : গত ৬ই নভেম্বর পূর্ব জর্মনির পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার উপর প্রাক্তন রুশ স্পাইদের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান হয়—প্রকাশ্যে। রয়টার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন : স্পাইদের সম্মেলন—তাও প্রকাশ্যে।

এঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের গুরুর গুরু জর্‌গের স্মরণে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ব কম্যুনিজমের জন্য টোকিয়োতে প্রাণ দেন।

যে রাস্তাতে তাঁরা সমবেত হন সেখানে সেনাবাহিনীর ব্রাস্‌ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সহ রাস্তাটির নূতন নামকরণ হয়।

"রিষার্ট জর্‌গে স্ট্রাসে"।

রিষার্ট জর্গে খাঁটি জর্মন নাম। রিষার্টের পিতা ছিলেন খাঁটি জর্মন, মা রুশ। জর্গের জন্ম রুশদেশে। জাপানে থাকাকালীন জর্গে সর্বজনসমক্ষে বলতে কসুর করতেন না যে রুশের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তৎসত্ত্বে কেউ কখনো সন্দেহ করেননি যে তিনি রুশের স্পাই, অতখানি কি করে হয়। ওদিকে তাঁর মূল কর্ম ছিল জাপান সম্বন্ধে স্তালিনকে খবর দেওয়া এবং দ্বিতীয় সেই সুদূর জাপান থেকে জর্মনির আভ্যন্তরীণ গুপ্ত খবরও সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো—কি করে তিনি সংগ্রহ করতেন সেটা প্লাঁশাটে (প্ল্যানচেটে) শার্লক হোমসকে আবাহন জানালে হয়তো জানা যেতে পারে। জর্গে ধরা পড়ার পর জাপানে প্রবাসী জর্মন-অজর্মন সবাই এক বাক্যে বলেছেন, জর্গে কস্মিন-কালেও তাদের কাছ থেকে জর্মনি সম্বন্ধে কোনো খবরাখবর পাম্প তো করতেনই না, উল্টে নয়া নয়া খবর দিয়ে তাদের পিলে চমকে দিতেন ; পরে সেগুলো কনফারমড হত।

জর্গের চেহারাটি ছিল সুন্দর এবং পুরুষত্বব্যঞ্জক। দীর্ঘ বলীয়ান দেহ। নাক চোখ ঠোঁট যেন পাথরে খোদাই অতি তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হত যেন চ্যাম্পিয়ন বক্সার বিরাট কোনো মেলাতে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী আছে কি না—

বলেছেন এরিষ কর্ট্, জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের দুই নম্বরের কর্মচারী। অবশ্য টোকিয়োতে তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতেন তর্কযুদ্ধে এবং জিততেন হামেশাই। কারণ তাঁর তূণীর ভর্তি থাকতো তথ্যের লেটেস্ট ইন-টেলিজেন্সের শরগুচ্ছে। অর্থাৎ নেকেড্ ফ্যাক্টস।

সেই যে গল্প আছে, গ্রামাঞ্চলের দুই ইরাকী জমিদার মোকদ্দমা লড়তে লড়তে আপিল করেছেন বাগদাদের শেষ আদালতে অর্থাৎ স্বয়ং খলীফা হারুন-উর-রশীদ এর শেষ ফাইনাল বিচার করবেন। এক জমিদার বাগদাদে এসে উঠলেন তাঁর সখা বাদশার প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে। প্রতিবাদী উঠলেন তাঁর বাল্যের বান্ধবী বাদশার খাস প্যারা রক্ষিতার বাড়িতে। বাদী মোকদ্দমা হেরে গ্রামে ফিরলে পর সবাই বিস্ময় মেনে শুধোলে, 'প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে উঠেও আপনি মোকদ্দমার সুরাহা করতে পারলেন না ?' তিনি বিজ্ঞজনোচিত কণ্ঠে বললেন, 'তাঁরা যে উঠে-ছিলেন রাজরক্ষিতার বাড়িতে। আমার কোনো যুক্তি কোনো নজীর দাঁড়াতে পারে "উলঙ্গ" যুক্তির বিরুদ্ধে, এগেনস্ট নেকেড আরগুমেন্ট !'

জর্গের বেশভূষা ছিল অপরিপাটি ; তিনি বাস করতেন টোকিওর সবচেয়ে

খাঁটির খাঁটি ঘিঞ্জি জাপানী মহল্লায় এবং বাড়িটা চোখে পড়ার মতো নোংরা। কিন্তু জাপানীদের আকর্ষণ করার মতো কেমন যেন একটা চুম্বকের শক্তি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হত। তারা তাঁকে পূজো করতো বললে কমই বলা হয় ওদিকে তাঁর চালচলন ছিল ভ্যাগাবণ্ড, বেদে বা বোহেমিয়ান ধরনের। রমণী-বাজী করতেন প্রচুর এবং মদ্যপান করতেন বেহদ্দ। তিনটে বোতল হুইস্কি ঘণ্টা কয়েকের ভিতর সাবড়ে দিতেন তিনি অক্লেশে—চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে এবং তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতিটির উপর সামান্যতম ঘোলাটে পোঁছ পড়তো না।

অর্থাভাব তাঁর লেগেই থাকতো। ধরা পড়ার পর অনুসন্ধান করে জানা যায়, তাঁর আমদানি যে কোনো মাঝারি রাজ-দূতাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মতো অতি সাধারণ। পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কখনো তাঁর স্পাইবৃত্তি এক্স-প্লয়েট করেননি। তিনি স্পাই হয়েছিলেন কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আদর্শবাদে প্রবুদ্ধ হয়ে।

জব্‌গে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রুশ এবং জর্মনি উভয় দেশে। তাঁর স্বর্গত ঠাকুর্দা ছিলেন কার্ল মার্কসের সেক্রেটারি। শিক্ষা সমাপনান্তে, প্রথম যৌবনে, এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি পশ্চিম জর্মনিতে একটি কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তাঁকে তৃতীয় ইণ্টারনেশনালের বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগে কর্ম দিয়ে স্কানডিনেভিয়া ও পরে তুর্কীতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠানো হয়। তুর্কীরা এসব বাবদে অসাধারণ চালাক। গন্ধ পেয়ে যায় অচিরায়। জব্‌গে কিয়ৎকাল জেল খাটলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে এই একটি মাত্র কলঙ্ক; সর্বসাধারণ অবশ্য যুদ্ধশেষের অনেক পরে এসব জানতে পায়। ১৯৩০ সালে রুশ সরকারের আদেশে তাঁকে পাঠানো হয় সাংহাইয়ে। এখান থেকে আরম্ভ হয় তাঁর কৃতিত্বময় জীবন। ...জব্‌গেকে যে জাপানী কোর্ট মারশালের সামনে দাঁড়াতে হয় সে মোকদ্দমার নথিপত্র মার্কিনরা জাপান অধিকার করার পর হস্তগত করে। তার থেকে জানা যায়, জব্‌গে সাংহাইয়ে যেসব দেশী-বিদেশী কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম হজুমি ওসাকি নামের জনৈক জাপানী। এর পর এঁরা মস্কোর আদেশে টোকিও চলে আসেন।

প্রকাশ্যে তাঁর পেশা ছিল নাৎসি-নির্দেশচালিত (অবশ্য তখন তাবৎ জর্মন প্রেসই গ্যোবেলসের কব্জাতে) ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগে-মাইনে ৎসাইটুঙের সংবাদদাতারূপে। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধই ছাপাবার মতো সাহস সম্পাদক-মণ্ডলীর ছিল না। তাঁরা সেগুলো না ছেপে চেপে যেতেন। সহকর্মীরূপে তাঁকে ক্লাউজেন নামক আরেক জর্মন গুপ্তচর দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে

তাঁর ব্যবসা ছিল মোটর মেরামতি। ওদিকে ছিলেন সেরার সেরা রেডিয়োর ওস্তাদ। অবশ্য জাপান থেকে রুশের পূর্বতম সীমান্তে রেডিয়োবার্তা পাঠাতে জোরদার ট্রান্সমিটারের দরকার হয় না—ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ক্লাউজেনও ধরা পড়েছিল কিন্তু তাঁকে জাপানীরা ফাঁসি দেয়নি; যুদ্ধশেষে রুশ দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

জর্‌গে যখন ধরা পড়লেন এবং সামান্যমাত্র অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তিনি বাঘা স্পাই, তখনই জাপান মন্ত্রিমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! এইমাত্র যে জাপানী হজুমি ওসাকির নাম বললুম সে লোকটি কি করে হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স কনোয়ের সাতিশয় বিশ্বাসভাজন সহকর্মী। এই কনোয়েটি যে-সে ব্যক্তি নন। একে তো জাপানের তিন-চারটি খানদানীতম ঘরের একটির প্রিন্স ডিউক, তদুপরি তিনি তিন-তিনবার জাপানের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন—এঁর আদেশেই জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়, হিটলার ও মুসসোলিনীর সঙ্গে এবং এঁরই রাজত্বকালে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে—যদিও ঘোষণা করা হয় তাঁর পদত্যাগের পরে। এবারে পাঠক তারিখগুলো লক্ষ্য করবেন। ১৯৪০-এর জুলাই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত (ক্যাবিনেট পুনর্গঠনের জন্য মাত্র দুটি দিন বাদ দিয়ে) কনোয়ে ছিলেন জাপানের সর্বময় কর্তা এবং হজুমি ওসাকি ছিলেন তাঁর পরম বিশ্বাসী অন্তরঙ্গজন। বলা বাহুল্য গোপন মন্ত্রণাসভার আলোচনা-সিদ্ধান্ত ওসাকি কনোয়ের কাছে পেয়ে কমরেড জর্‌গেকে গরম-গরম সরবরাহ করতেন এবং এই চোদ্দ মাসেই জাপানের এ যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে মোক্ষম-মোক্ষম মরণ-বাঁচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (হিটলারের সঙ্গে দোস্তী, মার্কিনের সঙ্গে লড়াই)। একেবারে গাঁজাখুরি অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, হিটলার-সখা কনোয়ের পরম বিশ্বাসী সহচর ছিলেন হিটলারবৈরী রুশের গুপ্তচর এবং তিনি জাপানের গোপনতম সিদ্ধান্ত স্তালিনকে পাঠাচ্ছেন হিটলারের বিনাশসাধনের জন্য। এবং হিটলার বিনষ্ট হলে যে আপন মাতৃভূমি জাপানেরও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সে তত্ত্বটি বোঝায় মতো এলেম নিশ্চয়ই এই ঝানু গুপ্তচরের পেটে ছিল। তিনি নাকি গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম পেয়েছিলেন জর্‌গের কাছ থেকে। জর্‌গে যে স্পাইদের গুরুর গুরু সে কথা তো পূর্বেই বলেছি।

১৭ অক্টোবর ১৯৪১-এ জর্‌গে গ্রেফতার হন। ঠিক তার ৩২ দিন পূর্বে কনোয়ে মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দেন। এ দুটোতে কোনো যোগসূত্র আছে কি না—আমার কাগজপত্র কেতাবাদি সে সম্বন্ধে নীরব। আমার মনে হয় পুলিস কোনো

গুপ্তচর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করে না। বেশ কিছু দিন তাকে অবাধে চলা-ফেরা করতে দেয়। তার সহকর্মী চরদের চিনে নেয়। তার পর এক "শুভ প্রভাতে" বিরাট খেয়াজাল ফেলে সব ক'টা মাছ ধরে। ইতিমধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কনোয়েকে অবশ্যই জানানো হয়েছে যে, তাঁর বিশ্বাসী ওসাকিই অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী / তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী।

এত বড় কেলেঙ্কারির পর প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। কনোয়ের রাজনৈতিক জীবন এখানেই চিরতরে খতম। ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন। কনোয়ে ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি খানদানী উচ্চকর্মচারীকে, জর্‌গের নির্দেশে ওসাকি পারদর্শিতার সঙ্গে দিনের পর দিন পাম্প করেছিলেন।

সামসনের মতো জর্‌গে পুরো এমারৎ ধূলিসাৎ না করতে পারলেও জাপান রাষ্ট্রের ভিতে যে ফাটল ফাটিয়ে যান সেটা কখনো মেরামত হয়নি।

আধুনিকের আত্মহত্যা

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে যত যুবক ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ, খ্রীষ্টধর্মের ব্যর্থতা এবং স্ব স্ব আদর্শবাদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কেন জানি নে, তার দশমাংশও করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগর, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করে বক্তৃতা দেন তখন বিশেষ করে মুগ্ধ হন তাঁরাই, যাঁরা একদা খ্রীষ্টধর্মে গভীর বিশ্বাস ধরতেন কিন্তু যুদ্ধের কল্পনাতীত বর্বরতা দেখে সে ধর্মের কার্যকারিতা অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণকে ভদ্র মানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে কি না, সে-বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই নৈরাশ্যবশত সাতিশয় বিরক্তিসহ চার্চে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি পর্যন্ত যেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে সরে যাচ্ছিল। শুধু যুবক সম্প্রদায়ই নয়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতরা পর্যন্ত ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—ভিক্টোরীয় যুগে তাঁদের যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য-জাতি, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গগণ সভ্য থেকে সভ্যতার পর্যায়ে উঠছে এবং ফলে একদিন আর এ-সংসারে দুঃখদৈন্য অনাচার-উৎপীড়ন থাকবে না সেটি লোপ পেল। বিশেষ করে যাঁরা ইতিহাসের দর্শন নিয়ে হেগেলের যুগ থেকে প্রশ্ন

করছেন যে, ইতিহাসে আমরা শুধু অসংলগ্ন, চৈতন্যহীন মূঢ় কতকগুলো ঘটনা-সমষ্টি পাই, না এর পিছনে কোনো সচেতন সত্তা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শুধু যে মানুষকে উন্নততর এবং সভ্যতর পন্থায় নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, নিজেকেও সপ্রকাশ করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকেই দ্বিতীয় সমাধানটি অগ্রাহ্য করলেন, এবং অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-দর্শনের সুপণ্ডিত অসভাল্ট স্পেঙলার তাই লিখলেন, 'য়ুরোপের সূর্যাস্ত' (ড্যার উন্টেরগাঙ ডেস্ আবেন্ট-লাণ্ডের)। বইখানার খ্যাতি সে যুগে পঞ্চমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আমি যুবকদের কথা বলছিলুম। তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মাধ্যমে অনুভব করলো যে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস না করেও শাশ্বত সত্য ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসের উচ্চতম পর্যায়ে ওঠা যায়, এঁদের একাধিক জন তখন প্রাচ্যভূমিতে এসে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করতে উদ্‌গ্রীব হন।

এঁদেরই একজন মসিয়ো ফের্না বেনওয়া। রবীন্দ্রনাথ যে ক'জন ইয়োরোপীয়কে বিশ্বভারতীতে—কয়েকজনকে অন্তত সাময়িকভাবে—শিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন তাঁদের সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন : যেমন লেভি, ভিন্‌টারনিৎস, তুচ্চি ইত্যাদি। খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন একমাত্র অধ্যাপক বেনওয়া এবং তিনি ফ্রান্সেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই, যখন মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর জীবনের ষষ্টিতম বৎসরে পদার্পণ করার শুভলগ্নে বিশ্ববাসী গুণীজ্ঞানীগণ একখানা পুস্তক তাঁকে উৎসর্গ করেন। বইখানার নাম তাঁরা দেন লাতিনে 'লীবার আমিকরুম্'—অর্থাৎ 'সখাগণপ্রদত্ত (উৎসর্গিত) পুস্তক।' এদেশ থেকে লেখেন মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় সর্ব সভ্যদেশ থেকে কেউ না কেউ ঐ শুভলগ্নে রলাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। আমার এখনো মনে আছে এক আরব রলাঁকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 'তুমি লৌহসম্মার্জনী দ্বারা ইয়োরোপের কুসংস্কারজঞ্জাল দূর করেছ।' বলা বাহুল্য ঐ লেখনী সঞ্চয়নে আপন রচনা দিয়ে শ্লাঘাপ্রাপ্তির জন্য যখন সর্ব বিশ্বের সহস্র সহস্র গুণীজ্ঞানী উদ্‌গ্রীব, তখন প্যারিস থেকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হল অধ্যাপক বেনওয়াকে, তাঁর রচনার জন্য। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ আশ্রমের কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু ঐ 'লীবার আমিকরুম্' যখন আমাদের লাইব্রেরিতে পৌঁছল তখন আমরা সেটিতে আমাদেরই অধ্যাপকের রচনা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। তিনিও আবার তাঁর প্রবন্ধে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেননি—আমরা ঠিক সেই সময়ে তাঁর ক্লাসে রলাঁর এক স্বল্পখ্যাত পুস্তিকা 'পিয়ের এ ল্যুস'—

'পীটার ও লুসি' পড়ছিলুম। চটি বই। বিরাট জঁ্যা ক্রিস্তফ লেখার পর রলাঁ দুই তরুণ-তরুণীর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী লিখে জঁ্যা ক্রিস্তফের মতো বিরাট পুস্তকের কঠিন কঠিন সমস্যা, ইয়োরোপীয় সভ্যতা নিয়ে আলোড়ন-বিলোড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। বেনওয়া তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'শান্তিনিকেতনে পিয়ের এ ল্যুস'—যতদূর মনে পড়ছে, এই শিরোনামা দিয়ে, এবং 'পিয়ের এ ল্যুস' পড়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার সবিস্তার বর্ণনা দেন। রলাঁকে উৎসর্গিত 'লীবার আমিকরুম্' পুস্তকের কোনো কোনো অংশ সে সময়ে কালিদাস নাগ অনুবাদ করে এদেশে প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বেনওয়ার গত হওয়ার দিবস বিস্ময়সূচক। যে গুরুর কাছ থেকে তিনি অকৃপণ স্নেহ ও সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীর দিনে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এস্থলে আমি অধ্যাপক বেনওয়ার জীবনী লিখতে যাচ্ছি নে। বস্তুত ১৯২১ থেকে এবং সঠিক বলতে গেলে যবে থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় থেকে ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত যে সব গুণীজ্ঞানীরা এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ভার আমার স্কন্ধে নয়। কার, সেটা বলা বাহুল্য। বছর দশেক পূর্বে লাইপৎসিক্ বিশ্ব-বিদ্যালয় রবীন্দ্রভবনকে লেখে, তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের জীবনী প্রকাশ করছেন, জনৈক মার্ক কলিন্স সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের কেউ কিছু জানে কিনা? (কলিন্স এখানে অধ্যাপনা করেছিলেন।) অন্যরা তাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে লেখে আর আমরা আমাদের অধ্যাপকদের—'বৃথা বাক্য থাক'! (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন)[১]

সেই বেনওয়া সাহেব কয়েকদিন ফরাসী ক্লাস নেওয়ার পর বললেন, 'তোমরা যে মলিয়ের, ফ্লবের, য়্যুগো (Hugo), জিদ, ফ্রাঁস পড়তে চাও সে তো খুব ভালো কথা। কারণ আজকালকার ইয়োরোপীয় ছাত্রছাত্রীদের এসব লেখকের বই পড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা লাতিন গ্রীক তো শিখতেই চায় না,

১ এইসব অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যেটুকু সামান্য বিবরণ পাঠক পাবেন সেটুকু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছিল বলে, বাধ্য হয়ে অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন সংক্ষিপ্তরূপে।

তার অনুবাদেও বিরাগ, এমন কি, এই একটু আগে যাঁদের নাম করলুম, তাঁদের লেখার প্রতিও কোনো উৎসাহ নেই, তাদের কারণ তাঁরা লেখেন ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে। তার অন্যতম মূল সূত্র, 'যে জিনিস স্বচ্ছ (ক্লিয়ার, পরিষ্কার যার অর্থ অতি সহজেই বোঝা যায়) নয়, সে জিনিস ফরাসী নয়' (স্ কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে!) আর এ যুগের পাঠকরা চায় আধা-আলো-অন্ধকার। তাদের বক্তব্য, 'তোমরা জীবনটাকে যতখানি সহজ সরল স্বচ্ছ ধরে নিয়েছো এবং ফলে স্বচ্ছ সরল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো জীবনটাকে—বাস্তবে সে তা নয়, জীবন ওরকম হয় না। সর্ব মানবজীবনেই আছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব—তাই তার প্রকাশও পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে না। আমরা আজ যা লিখছি সেটা পুরনো স্টাইলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে, এবং তোমরা যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত—তারা তো এটাকে দুর্বোধ্য, অবোধ্য এমন কি অর্থহীন প্রলাপ বললেও বলতে পারো, কিন্তু আমরা তার কোনোই পরোয়া করি নে। আমরা আমাদের "অপক্ষে" এগিয়ে যাবো, এবং এই করেই নূতন পথ বানাবো।'

এতদিন পরে কি আর সব কথা মনে থাকে! এটা হচ্ছে ১৯২১।২২।২৩-এর কাহিনী। তখনো এদেশে মডার্ন কবিতা জন্ম নেয়নি, (পরবর্তী যুগে যখন নিল, তখন হিসেব নিয়ে দেখা গেল, এসব মডার্ন কবিতাতে যে শব্দটি বার বার, এমন কি বলা যায় সর্বাধিক বার আসে সেটি 'ধূসর'। তখন মনে পড়লো, ফ্রান্সের মডার্নদের সম্বন্ধে অধ্যাপক বেনওয়ার প্রাচীন দিনের বিবৃতি—সেখানে মূল কথা ছিল 'অস্পষ্ট' 'দ্বন্দ্বমুখর' এবং সর্বোপরি 'আধা-আলো-অন্ধকার'। সেই বস্তুই এদেশে এসে পরেছে 'ধূসর' আলখাল্লা! তা হবেই বা না কেন? এ দেশটা তো বৈরাগ্যের গেরুয়া বসনধারী, আর গেরুয়া যা ধূসরও তা!) তবে মোটামুটি যা বলেছিলেন, সেটা মনে আছে—এবং চোখের জলে নাকের জলে মনে আছে!

কারণ সর্বশেষে সাহেব বললেন, 'অতএব এই নূতন ফ্রান্সকেও তোমাদের চেনা উচিত; বিশেষ করে তার কাব্যপ্রচেষ্টাকে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফ্রান্স থেকে আনালেন—তখনকার দিনে জাহাজ-রেলে প্রায় ছ সপ্তাহ লাগতো—বেশ মোটা মোটা দু-ভলুমে সম্পূর্ণ মডার্ন কবিতার চয়নিকা। শিরোনাম, 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই', 'পোয়েটস্ অব্ টুডে';—'হালের কবি', 'আজকের কবি' যেটা আপনার প্যারা লাগে বাংলাতে সেইটেই বেছে নিন।

বলছিলুম না, 'চোখের জলে নাকের জলে'? পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, কোনো হদিস আর পাই নে। ক্লাসের পড়া তৈরি করতে আগে আমার লাগতো

তিন পো ঘণ্টাটাক, এখন দু-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা অভিধান ঘেঁটেও কোনো হদিস পাই নে। একটা তুলনা দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করি। আপনি কোনো বিষয়বস্তু পড়ছেন যেটা সরল, এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সরল। সেখানে মনে করুন হঠাৎ এল একটা শব্দ যার অর্থ আপনি জানেন না, যেমন ধরুন 'কর'। অভিধান খুলে মানে পেলেন 'করা ধাতুর রূপ বিশেষ', 'খাজনা' 'হাত' 'কিরণ' 'হাতির শুঁড়' 'হিন্দুর উপাধি বিশেষ'। এতক্ষণ ধরে লেখকের সব কথাই আপনার কাছে পরিষ্কার ছিল বলে, পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করে আপনি চট্ করে বুঝে গেলেন কোন্ অর্থটা লাগবে, লেগেও গেল ক্লিক্ করে। তাই বোধ হয় অভিধানকে কুঞ্চিকাও বলা হয়। সেখানে আপনি পাবেন চাবি—এটা প্রয়োগ করে আপনি যে অচেনা শব্দরূপ তালা খুলতে চান, সেটি খুলতে পারেন। এর পরে তুলনাটা হয়তো টায়-টায় মিলবে না, কিন্তু আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ খোলসা করবে। আপনার নিজের যে তালা আপনি নিত্যি নিত্যি খোলেন তার চাবি যদি হারিয়ে যায়, আর কেউ এসে এক গুচ্ছ জাত-বেজাতের চাবি দেয়, তাহলে কোন্ চাবিটি দিয়ে আপনার তালাটি খোলা যাবে সেটা চট করে বেছে নেবেন—জোর, নিতান্ত একাকার হলে, দু-তিনটে ট্রায়েল নিয়েই কর্মসিদ্ধি।

আর এখানে, অর্থাৎ এই মডার্ন কবিতা নিয়ে হালটা কি? যেন তালাটিই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে,—আদৌ আছে কি না সো ভী কসম খেয়ে বলতে পারবো না, অর্থাৎ বিসমিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)—কেমন যেন আবছা-আবছা গোছ, ঐ যে সায়েব অধ্যাপক স্বয়ং বলেছিলেন কেমন যেন আধা-আলো-অন্ধকার, ফরাসীতে বলে 'ক্রেপ্যুস্কুল' (ইংরেজিতে বিশেষ্যটা চলে না বটে, কিন্তু বিশেষণটা—crepuscular—মাঝে মাঝে পাওয়া যায়) এদেশের পরবর্তী যুগের 'ধূসর'! এদিকে তালাটাই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে, ওদিকে অভিধান আমার হাতে তুলে দিলেন চারটে চাবি—এখন লাগাই কোন্টা? এমন কি 'রাজাকে হাতির শুঁড় (কর) দিলুম' অর্থও যদি 'রাজাকে খাজনা (কর) দিলুম' -এর বদলে বেরোয় তাতেও আমি খুশী! কথায় বলে 'হাতের একটা পাখি কানা মামার চেয়ে ভালো'—ঐক্ যা, দুটো প্রবাদে গোবলেট করে ফেললুম নাকি? তা সঙ্গগুণে সবই হয়। অর্থাৎ সে যুগের ফরাসী মডার্ন কবিতা শব্দ, অর্থ, অনুপ্রাস, এমন কি বানান নিয়েও, এক্ষুনি আমি যা গোবলেট পাকালুম, তার চেয়ে কোটি গুণে (ইনফিনিটি সিম্বলটি দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সেটি বোধ হয় ছাপাখানায় নেই) ওস্তাদ ছিল—গোবলেট পাকাতে!

বেশ কয়েকদিন গলদঘর্ম পরিশ্রম করার পর আমি স্থিরনিশ্চয় হলুম, আমার

মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রইল না, এ বস্তু কাব্য নয়, এটা নিশ্চয়ই দর্শন। কারণ দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শোপেনহাওয়ার বলেছেন (আমি অনুবাদের খাতিরে একটুখানি কনসুরা লাগাচ্ছি) :

দর্শন হল গিয়ে, 'অমানিশার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান।'

কিন্তু এ তত্ত্বে পৌঁছনোর পরও আমি অত সহজে হাল ছাড়িনি—তার জন্য বয়সটাই দায়ী ; ওটা জেদীর বয়স।

কারণ আমার মনে পড়লো, ছেলেবেলায় কাকার কাছে শোনা একটি তত্ত্বোপদেশমূলক কাহিনী। এক রাজার ছিল একটি অতি বিরল মহামূল্যবান সাদা হাতি। সে দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্ছে তার অনুসন্ধান করার ফলে পড়লো যে, তার মাহুত শত সাবধান বাণী সত্ত্বেও অতি সঙ্গোপনে হাতির দানা চুরি করছে। রাজা ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মাহুত যখন দেখল এ-হুকুম কিছুতেই রদ হবে না, রাজার সামনে নিবেদন করলে, তাকে যদি এক বছরের সময় দেওয়া হয় তবে, একমাত্র তারই জানা গোপন কৌশল প্রয়োগ করে ঐ সাদা হাতিটাকে দিয়ে মানুষের মতো কথা বলাতে পারবে। রাজা সম্মত হলেন। মাহুতের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যখন তাকে শুধালো হাতিকে দিয়ে সে কথা বলাবে কি করে, তখন সে বললে, 'ভাইরা সব, এক বছরের ভিতর কত কিছুই না ঘটতে পারে। এক বছরের ভিতর রাজা মারা যেতে পারেন, কিংবা হাতি মারা যেতে পারে, কিংবা আমি মারা যেতে পারি—এবং কে জানে, কিংবা হয়তো হাতিটা শেষমেষ কথাই বলে ফেলতে পারে!'

আমিও সেই আশাতেই রইলুম, কে জানে এ সব কবিতার মানে একদিন হয়তো বেরিয়ে গেলে যেতেও পারে। যদিও অকপট চিত্তে স্বীকার করছি, আমার তখন মনে হয়েছিল, এবং আজও মনে হয়, আচম্বিতে হাতির মানুষের মতো কথা বলতে পারাটার সম্ভাবনা এসব কবিতার অর্থ বোঝার সম্ভাবনার চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সত্যের অপলাপ হবে বলে স্বীকার করছি, সাহেব আমাদের বলেও ছিলেন, প্রাচীন যুগের ল্য কঁৎ দ্য লিল্ বা য়্যুগোর কবিতার অর্থ যে-রকম বর্ণে বর্ণে বোঝা যায়, এসব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'—'হালের কবি'দের কাছে থেকে সেটা যেন প্রত্যাশা না করি—এর নাকি অনেকখানি সরাসরি, সোজাসুজি অনুভূতির যোগে চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। কি প্রকারে সে 'যোগ' করতে হয় সেটা অধ্যাপককে শুধিয়ে তাঁকে বৃথা হয়রান করতে চাইনি—কারণ যেখানে অনুভূতির কারবার

সেখানে সে রসে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া তো আর সিলজিজ্‌ম্‌ দিয়ে বাৎলানো যায় না। যেমন মাকে কি করে ভালোবাসতে হয় এটা তো আর কাউকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে শেখানো যায় না—যেরকম বিস্কুটের টিনের উপরে ছাপা নির্দেশানুযায়ী-প্রক্রিয়ায় টিনটি পরিপাটিরূপে খোলা যায়।

পাঠক শুধোবেন, 'তা হলে ক্লাসে কি অধ্যাপক সেগুলো বুঝিয়ে দিতেন না? এবারে ফেললেন মুশকিলে। সায়েব মোটামুটি একটা ইংরিজি অনুবাদ খাড়া করে দিতেন—কারণ ইংরিজি ও ফরাসীর শব্দসম্পদ—বিশেষ করে চিন্তা ও অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিমূর্ত শব্দ একই ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয় বলে বহু কবিতার শতকরা ষাটটি শব্দ দুই ভাষাতেই এক। অনুবাদ করা কঠিন নয়। কিন্তু তাই বলেই কি জিনিসটা সরল হয়ে যাবে? মডার্ন বাংলা কবিতার শব্দগুলো তো আপনি চেনেন, তাই বলে কি অর্থ বোধগম্য হয়? তার উপর সর্বক্ষণ ভয়, এখনো তো মামুলী ফরাসীটাই ঠিকমতো রপ্ত হয়নি, হয়তো গাড়োলের মতো এমন প্রশ্ন শুধিয়ে বসবো যেটা বাঙলায় প্রকাশ করতে হলে বলি, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে—ইত্যাদি।'

তবে দুটো জিনিস লক্ষ্য করলুম। 'শোল্‌ডার শ্রাগ্‌' করা বা কাঁধ উঠিয়ে নামিয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করার অভ্যাস সর্ব ইয়োরোপীয়েরই আছে, কিন্তু এর সব চাইতে বেশী কনজাম্‌শন্‌ ফ্রান্সে—শ্যাম্পেন বা ব্র্যাণ্ডির চেয়েও ঢের ঢের বেশী; এ সব কবিতা 'বোঝাবার' সময় বেনওয়া সাহেব যা 'শোল্‌ডার শ্রাগ্‌' করলেন তার থেকে আমার মনে হল, যে আগামী দশ বৎসরের রেশন তিনি ঐ 'হালের কবি'দের পাল্লায় পড়ে তিন মাসেই খতম করে দিচ্ছেন। এবং ঐ শ্রাগ্‌ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তেলো দুটো এমনভাবে চিত করতেন যে আমরা স্পষ্ট বুঝতুম, ইংরেজিতে যাকে বলে, ঘোড়াকে জলের যথেষ্ট কাছে আনা হয়েছে, এখন সে যদি না খায়—

দ্বিতীয়ত, সনাতন লেখকদের বেলা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অনুবাদ করতে বলতেন। কিন্তু এই মডার্ন কবিদের হাতে নিরীহ বঙ্গসন্তানদের বে-পনাহ্‌ অর্থাৎ একান্ত অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে তিনি সাহস পেতেন না। নরখাদক না হলেও, যারা তাঁদের কবিতা বোঝবার চেষ্টা করে, তাদের মগজ যে কিরকম কুরে কুরে খেতে পারেন, সে তত্ত্বটি সায়েবের অজানা ছিল না। এবং ঐ সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে পাগল হয়ে গেলে যে গুজোব রটেছিল, তার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আজ বলছি, 'সর্বৈব মিথ্যা; সে ছোকরা একদা ফরাসী ক্লাসে আসতো বটে, কিন্তু ঐ সব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'দের প্রথম

দর্শন পাওয়া মাত্রই সে 'বাপ্পো বাপ্পো' রব ছেড়ে অধ্যাপক মিশ্রজীর পাণিনি ক্লাসে চলে যায়—যে ক্লাসটাকে আমরা বাঘের চেয়েও বেশী ডরাতাম—এবং পরে মুক্তকণ্ঠে বলে, এসব হালের ফরাসিস 'কবি'দের মাল বোঝার চেয়ে পাণিনির সূত্র বোঝা ও কণ্ঠস্থ করা ঢের ঢের সহজ।'

একে মডার্ন, তায় ফরাসিস, তদুপরি কোনো কোনো 'কবি' খাস প্যারিসিয়ান—উপস্থিত আবার বাঙলাদেশে একটা বিশেষ 'রস' বা ঐ ধরনের 'একটা-কিছু নিয়ে' জোর আন্দোলন চলছে—কাজেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়, এসব কবিরা কাব্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন কি না? আমার তো শেষ ভরসা ছিল ঐটেই। এত যে মেহন্নৎ করছি, তার ফলে আখেরে যদি এমন কিছু জুটে যায় যার প্রসাদাৎ সংস্কৃত-পড়নেওলাদের ঢিঢ দিতে পারি। 'ধ্যত্তর তোর "চৌরপঞ্চাশিকা" আর "কুট্টনীমতম্"! আসল মাল এ্যাদ্দিনে, বাবা, এদেশে এসে পৌঁছেছে, নাক বরাবর প্যারিস থেকে। আয়, শুনে যা।' কারণ এদের কেউ কেউ অল্পবিস্তর মপাসাঁ পড়েছে, অবশ্য ইংরিজি অনুবাদে,[২] তাই (ঐ বয়সে) আমার সরস আহ্বান শুনে যে আমার সামনে করজোড়ে আসন নিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়, অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং বহু বৎসর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন বলে এ-বিষয়ে সাবধান হতে জানতেন। ক্লাসে দুটি মেয়ে ছিল বলে তিনি প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, কোন্ কোন্ কবিতা ক্লাসে পড়ানো হবে।

আমার নিজের কেমন জানি একটা অন্ধ বিশ্বাস সে সময় জন্মেছিল যে অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং এই নূতন 'একোল' 'স্কুল' বা 'রীতিটা' পছন্দ করতেন না, বিশেষ রসও পেতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে মডার্ন ফ্রান্সের নবীন কাব্য-আন্দোলনের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র—অনেকটা যেন কর্তব্য পালনের জন্য।

তবু এই সুবাদে একটি তত্ত্বকথা বলে রাখা ভালো। এসব মডার্ন কবিদের সাধনা ছিল সত্যই বিস্ময়জনক। কারো কারো ছন্দহীন, লয়বিহীন, মিলবর্জিত—বস্তুত সর্ব অলঙ্কারশূন্য—এলোপাতাড়ি আবোল-তাবোল শব্দসমষ্টি দেখে যখন

২ সব জিনিস মূল ভাষাতে পড়তে হবে এ উন্নাসিকতার কোনো অর্থ হয় না। আমার আপন অভিজ্ঞতা বলে, বহুক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের চেয়ে ঢের সরেস হয়েছে। তারি একাধিক কারণ আছে, কিন্তু সে-আলোচনা এস্থানে অবান্তর এবং সংক্ষেপে সারবার উপায় নেই।

আমরা উদ্‌ভ্রান্ত তখন বেনওয়া সায়েব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য থেকে পড়ে শোনাতেন এঁদেরই আগেকার দিনের, প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত কবিতা—মডার্ন আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বে রচিত।

এবং সেগুলো শুনে, পরে পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। অনবদ্য এক-একটি কবিতা! কতখানি পরিশ্রম, কতখানি সাধনার প্রয়োজন এ রকম অত্যুত্তম কবিতা রচনা করতে! অর্থাৎ, এঁরা 'ব্লাফ্‌-মাস্টার' নন। প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার টেকনীক্‌, স্কিল, কৌশল সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর এঁরা যে-কোনো কারণেই হোক—খুব সম্ভব নিজের সৃষ্টিতে ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি না পেয়ে—ধরেছেন অন্য টেকনীক্‌, বা বলা যেতে পারে, চেষ্টা করছেন নূতন এক টেকনীক্‌ আবিষ্কার করার। সেজানের ছবি দেখে অজ্ঞজন মনে করে, এরকম 'এলোপাতাড়ি তুলির বাড়ি ধাপ্পুস-ধুপ্পুস মারা' তো যে-কোনো পাঁচ বছরের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেজান যখন প্রাচীন 'একাডেমিক' টেকনীকে আঁকতেন তখনকার ছবি দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। তখনকার দিনের 'একাডেমিক' যে কোনো চিত্রকরের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারতেন, কারণ একে তো ছিল তাঁর বিধিদত্ত অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ও স্পর্শকাতরতা, তদুপরি তাঁর আঙুলগুলি যেন শুধু ছবি আঁকার জন্যই বিধাতা নির্মাণ করেছিলেন, এবং সর্বোপরি তাঁর বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, ঐ প্রাচীন একাডেমিক টেকনীক্‌ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য। এ দেশে তাই যখন দেখি, মাত্র দু'টি বছর রেওয়াজ—কবিতা, গান, নাচ যাই হোক না কেন—করেছে কি না, তার আগেই সে লেগে যায় 'কম্পোজ' করতে, এবং অন্যকে বিজ্ঞভাবে 'নবীন পন্থা' বাৎলাতে, তখন —থাক্‌ গে।

ইতিমধ্যে আবার জর্মন ভাষার অধ্যাপক ছুটিতে চলে যাওয়ার দরুন বেনওয়া সায়েবের ঘাড়েই পড়লো জর্মন শেখাবার ভার, এবং তিনিও ফরাসী মডার্ন কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন জর্মন মডার্ন কবিদের মডার্নতম রাইনের মারিয়া রিল্‌কে! সে আরেক নিদারুণ অভিজ্ঞতা, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'ভুক্তভোগী জানে তাহা, অপরে বুঝিবে কিসে?'—সে-কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতবী রইল। শুধু এইটুকু নিবেদন, চেষ্টা দিয়েছিলুম, স্যর, সেই সতরো-আঠেরো বছর বয়সেই চেষ্টা দিয়েছিলুম এই গবিতা নামক জিনিসটির রসাস্বাদন করার। আর যে দোষ দেবেন দিন, শুধু এইটুকু বলবেন না যে, বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাবার পর মডার্ন কবিতার প্রেম কামনা করে হতাশ-প্রেমিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছি।

তারপর এল সেই শুভলগ্ন যেদিন মডার্ন কবিতার সঙ্গে আমাদের তালাকটি বেনওয়া সাহেব মঞ্জুর করলেন। আমরা সোল্লাসে ফিরে গেলুম দোদে, ফ্লবেরের কাছে। শুনেছি, স্পেনের লোক নাকি বছরের প্রথম দিন এক গেলাস জল নিয়ে তাতে কড়ে আঙুলের ডগাটি ডুবিয়ে সেই আঙুল জিভে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে সভয়ে চাটার পর আঁতকে উঠে বলে, 'ঐ সেই প্রাচীন দিনের পুরনো বিস্বাদ বস্তু; চ, ভাই, ফিরে যাই আমাদের মদের গেলাসেই! কেন যে পাদ্রী সায়েব মদ কমাতে আর বেশী জল খেতে বলেন বোঝা ভার।' আমরাও স্পানিয়ার্ডদের মতো ফিরে গেলুম আমাদের ক্লাসিক্স-মদ্যে।

আমাদের মুখের ভাব দেখে বেনওয়া সায়েব হেসে বললেন, 'তবু তো আমরা আছি ভালো, কারণ আমরা চর্চা করি সাহিত্যের। সেখানে উৎকৃষ্টে-নিকৃষ্টে পার্থক্য করা তেমন কিছু অসম্ভব কঠিন নয়! সেখানে রুচিবোধের অনেকখানি স্থিরতা আছে। কিন্তু হত যদি আমাদের বিষয়বস্তু চিত্র? তাহলে খানিকটে আভাস পেতে সে-ক্ষেত্রে রুচির কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয় রাতারাতি। আজ যাঁর ছবি খোলা নিলামে বিক্রি হল লক্ষ ডলারে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই ছবিই বিক্রি হল হাজার ডলারে। আজ যাঁকে বলা হচ্ছে 'গ্রাঁ মেৎর্' গ্র্যাণ্ড মাস্টার বা মেস্‌ৎরো (ওস্তাদের ওস্তাদ) তিন বছর যেতে না যেতে তাঁর ছবি হয়ে গেলো বিল্‌জ্, পিফ্‌ল্ (রদ্দী, চোতা)!—আর এ সব ছবিই কিন্তু একাডেমিক স্টাইলে আঁকা; কোনো নূতন এক্সপেরিমেণ্টের কথা উঠছে না।

তবেই ধারণা করতে পারবে 'মডার্ন পেণ্টিং' নিয়ে কী অসম্ভব রুচি পরিবর্তন, রীতিমত খুনোখুনি মারামারি। আর সে ছবিগুলোতে আছে কি? ধোঁয়াটে, তামাটে, বিৎকুটে কি যেন কি,—জানেন শুধু আর্টিস্টই, বা হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ সখামণ্ডলী, এতে আছে কি, আর্টিস্টের উদ্দেশ্য কি—নিচে লেখা 'বসন্ত'। আর, এজ্ ফার্ এজ্ আই এম্ কনসার্নড্ সেখানে 'বসন্ত' না লিখে অভিধানের ভিতরের বা বাইরের যে-কোনো শব্দ লিখলেও আমার তাতে সুবিধা অসুবিধা কিছুই হয় না। অধিকাংশ আর্টিস্টই আবার তাঁদের ছবির কোনো নামই দেন না। বলেন, তাঁরা নাকি ডিক্সনারি ইলাস্‌ট্রেট করার জন্য ছবি আঁকেন না।'

বেনওয়া সাহেব সেদিন আরো অনেক খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছিলেন। কারণ খাস ফরাসিসের মতো তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল—কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা রসের নানা প্রকাশে, নানা বিকাশে। সর্বশেষ তিনি ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্, সুররিয়ালিজ্‌ম, ক্যুবিজ্‌ম, দাদাইজ্‌ম ইত্যাদি বহুবিধ 'ইজ্‌ম'-এর ইতিহাস শোনানোর পর শেষ করলেন 'বানরালে'র কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে।

কাহিনীটি আমার চোখের সামনে আজো জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় 'নাটকে'র যিনি 'হীরো' তাঁর নামটি ভুলে গিয়েছি। বানরালে-বানরালে গোছ কি যেন এক বিজাতীয় নাম,—এ নামটা অনায়াসে আমারও হতে পারতো,—তবে এটুকু মনে আছে যে নামের মধ্যিখানে 'আন্' কথাটি ছিল। অবশ্য এ নাট্যের আদ্যন্ত আজো অতি সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভবে, সামান্য কয়েক মাস কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই (এ ব্যাপারে বোম্বাই কোন্ পুণ্যবলে তীর্থভূমিতে পরিণত হলেন সে রহস্য পূতভূমির পাণ্ডারাও জানেন না) মাকু মারার পর নিরাশ হয়ে, শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি প্যারিস চলে যান (ভুলবেন না, ফেরার সময় মঁ পল্যিয়ে থেকে একটা ডিলিট নিয়ে আসবেন; এদেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নইলে হয়তো দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে, রেডিমেড্ থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে···ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়···) তবে অদ্যকার বঙ্গসন্তান মাত্রই আনন্দিত হবে যে, কালোবাজার সেখানে নেই—(সব খোলাখুলি, সামনাসামনি)।

প্যারিসের লোক সে কাহিনী এখনো ভোলেনি। আপনাকে নূতন করে বলার সুযোগ পেয়ে বড্ডই উৎসাহের সঙ্গে সেটি কীর্তন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মডার্ন আর্ট প্যারিসের অন্য সব প্রাচীন অর্বাচীন কলাসৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে মহানগরী থেকে বের করে দিয়েছে তখন হঠাৎ একদিন উদয় হলেন গট্‌গট্ করে, সূর্যোদয়ের গৌরব নিয়ে এই চিত্রকর—চিত্রকর বললে অত্যল্পই বলা হয়—যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এতদিন নাকি নির্জনে চিত্রসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন বলে কোনো প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাননি। কিন্তু এইবারে তাঁর সময় হয়েছে। কারণ মডার্ন আর্ট তার নূতন পথ খুঁজে পেয়েছে, তার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছে এঁরই চিত্রকলায়।

একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত—শুধু কলাবিভাগের নয়, অসাধারণ জ্ঞাতব্য সংবাদ রূপে কাগজের উত্তমাঙ্গেও প্রকাশিত—প্যারিসবাসী এবং দু-তিন দিনের ভিতর তাবৎ ফরাসিস জাতি এই নব অরুণোদয়ের সংবাদ পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হল। ক্রমে ক্রমে সর্ব আর্টজর্নলে, বিশেষ করে সেই সব আলট্রা-মডার্ন-আর্টজর্নলে, যেগুলো খবরটা সর্বপ্রথমে পরিবেশন করতে পারেনি বলে ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিল, সর্বত্রই এই নবীন আর্টিস্ট সম্বন্ধে কলামের পর কলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানা

প্রকারের বিশ্লেষণ তথা তাঁর প্রথম চিত্রের জন্ম থেকে শেষ চিত্র অবধি তার ক্রমবিকাশের সুনিপুণ ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত হল। শেষটায় কিন্তু এঁকে লুফে নিলেন আলট্রা-মডার্ন আর্টের ক্রিটিকদের চাঁইরাই। এঁরা একাডেমিক আর্টের জন্মশত্রু, কসম্-খাওয়া-খুনী-দুশ্‌মন। অন্যপক্ষে প্রথমটায় কিঞ্চিৎ গাঁইগুঁই না-রাম-না-গঙ্গা ধরনের দু-একটা মন্তব্য করার পর আলট্রা-মডার্নদের হাতে ঘোল খেয়ে চুপসে রঙ্গভূমি—বা জঙ্গভূমি, যাই বলুন,—পরিত্যাগ করলেন। ওদিকে সেই চিত্রকরের ছবি দেখবার জন্য যা ভিড়, সেটা সামলাতে গিয়ে প্যারিস পুলিসের মতো সহিষ্ণু প্রতিষ্ঠানও হিমসিম খেয়ে গেল। ওঁর ছবি না দেখা থাকলে তো প্যারিসের শিক্ (chic) সমাজে মুখ দেখানো যায় না, ওঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে কথা বলাটাই তখন দুনিয়ে ক্রী—dernier cri—শব্দে শব্দে অনুবাদ করলে 'শেষ চিৎকার' কিন্তু তার থেকে আসল অর্থ ওৎরায় না, বরঞ্চ 'আখেরী কালাম্' বললে ওরই গা ঘেঁষে যায়। আর্টের ব্যাপারে ফরাসী হনুকরণ (to ape)-কারী ইংরেজ ও ঐ দুনিয়ে ক্রী-ই আপন ভাষাতে ব্যবহার করে, অর্থ uttermost refinement– ও রকম দুটো শব্দ কিছুতেই অনুবাদ করা যায় না বলে।

এমন সময় সিন্দবাদের সেই সুদর্শন, নিটোল, নিখুঁত সী-মোরগের আণ্ডাটি গেল ফেটে, কিংবা কেউ দিলে ফাটিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো উৎকট পচা দুর্গন্ধ। প্যারিসে তিষ্ঠনো কি সোজা ব্যাপার?

সেই যে বলেছিলুম 'একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত' এই নবীন রবির প্রথম সংবাদ বেরোয়, এবং পরে সকলের অলক্ষ্যে এঁরা কেটে পড়েন—সেই তিন 'সংবাদদাতা' বা জালিয়াৎ আণ্ডাটি ফাটালেন—সর্বজনসমক্ষে ফোটোগ্রাফ সহ।

আসলে বানরালে নামে কোনো আর্টিস্টই নেই। এই তিন মিত্র একটা গাধাকে শক্ত করে বেঁধে নেন একটা খুঁটিতে। লম্বা ন্যাজে মাখিয়ে দেন সযত্নে, আর্টিস্টরা—বরঞ্চ বলা উচিত আলট্রামডার্ন আর্টিস্টরা—যে রঙ, অয়েল কালার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, সেই সব রঙ। তার ন্যাজের কাছে, পিছনে, আর্টিস্টদের তেপায়া স্ট্যাণ্ড বা ইজ্‌লের উপর ক্যানভাস। তার পর সেই গাধাটাকে দে, বেধড়ক মার! সে বেচারী পিছনের ঠ্যাং দুটো তুলে যত লাফায়, ততই তার নানা-রঙে-রাঙা ন্যাজ থাবড়া মারে ক্যানভাসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায় মোস্ট আলট্রামডার্ন 'ছবি'! ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন ক্যানভাস নিয়ে, গাধার ন্যাজ কখনো বিনুনির মতো ভাগ করে, কখনো গোচ্ছা

গোচ্ছা করে বেঁধে—যার যথা অভিরুচি—রঙের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ করে 'আঁকা' হল 'ছবি'র পর 'ছবি'। এবং পাছে লোকে অবিশ্বাস করে তাই 'ছবি'র প্রতি স্টেজে তার ফোটো, গাধার লম্ফঝম্পের ফোটো, গর্দভের পুচ্ছাংশসহ চিত্রাংশের ফোটো—এক কথায় শব্দার্থে ডকুমেণ্টারি ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে অপর্যাপ্ত।

তিন জালিয়াত—বলা বাহুল্য, এঁরা তৎকালীন তথাকথিত মডার্ন আর্টিস্টদের গোঠ বেঁধে, দল পাকিয়ে চিৎকার ও একাডেমিক আর্টের উদ্দেশে তাদের অশ্রাব্য কটুবাক্য শুনতে শুনতে হন্যে হয়ে গিয়ে শেষটায় উপযুক্ত 'সৎকার'টি করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন 'বানরালে' নামটার মধ্যখানে ane—ফরাসীতে যার অর্থ গর্দভ—শব্দটি গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গাধাটিই এসব ছবির প্রকৃত আর্টিস্ট।

তস্য বিগলিতার্থ, মোস্ট-আলট্রা-মডার্ন-আর্টিস্ট তথা তাঁদের মুখপাত্র আর্ট-ক্রিটিকরা এ্যাদ্দিন ধরে যাকে তাঁদের শিরোমণি করে, তাঁদের হীরো বানিয়ে বিনা বাদ্যে নেচেছেন ('কি কল পাতাইছো তুমি! বিনা বাইদ্যে নাচি আমি॥'—লেখকের মাতৃভূমির প্রবাদ) তিনি একটি গর্দভ!

এ-জাতীয় ঘটনা আরো ঘটেছে। তার ফিরিস্তি দিতে যাবে কে? আর উপরের উল্লিখিত ঘটনাটির পিছনে রয়েছে নষ্টামী। কিন্তু যেখানে কোনো প্রকারের কুমতলব নেই, সেখানেও যে এ রকমের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেটা বছর পাঁচেক পূর্বে সপ্রমাণ করে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশ।

সুইডেনের অন্যতম প্রখ্যাত অতি আধুনিক চিত্রকর ফালস্ট্রোম ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময় সুইডেনের ললিতকলা আকাদেমী এক বিরাট মহতী চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (Spontaneous art বা স্পণ্টানিস্‌মুস্ এর নাম এবং এটাকেই তখন সর্বাধুনিক কলাপদ্ধতি বলা হত) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সেই চিত্রপ্রদর্শনীতে থাকবে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস্ কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন। এখন হয়েছে কি, চিত্রকর ফালস্ট্রোম তাঁর অন্য ছবি যাতে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত তুলি পোঁছার রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর অন্য দুখানা ছবির উপর রেখে প্যাক করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেন—এস্থলে বলা উচিত ফালস্ট্রোম ছবি ক্যানভাসের উপর না এঁকে আঁকতেন ম্যাসোনাইটের উপর। আকাদেমীর বড় কর্তারা ভাবলেন এটাও মহৎ আর্টিস্টের

এক নবীন কলানিদর্শন, এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই তুলি পোঁছার টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামধন্য নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর অন্য ছবির পাশে।

কেলেঙ্কারিটা কি করে বেরিয়ে পড়ে সে অন্য কাহিনী, কিন্তু যখন পড়ল তখন উঠলো কাগজে কাগজে হৈহৈ রব। শেষটায় খুদ আকাদেমির প্রেসিডেন্ট খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বলেই ফেললেন, 'কি করি মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকম-ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্সপেরিমেন্ট আর কোন্‌টা যে এ্যাক্সিডেন্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি গুণী ফালস্ট্র্যাম আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সেই ভেবে ঐ ছবিটাও প্রদর্শনীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

'রাস্তার লোক' সব শুনে বললে, 'এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্ররাই বহু সাধনার পর, বহু তপস্যার ফলে সৃষ্টি করতে পারতেন, এখন দেখছি এ্যাক্সিডেন্টও (আকস্মিক যোগাযোগ) সেটা করতে পারে!'

এর বহু পূর্বেই সংস্কৃতেও নাকি বলা হয়ে গিয়েছে, কোটি কোটি বৎসর ধরে উইপোকা কাঠ খেয়ে খেয়ে হিজিবিজি যে নক্সা কাটছে, তার ভিতর হয়তো একদিন পূর্ণ প্রণব মন্ত্রটিই খোদাই হয়ে বেরিয়ে আসবে।

পাঠক আদৌ ভাববেন না, আমি মডার্ন কবিতা বা আর্টের দুশ্‌মন্‌। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও অন্যায় অবিচার আমার প্রতি আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, প্রকৃত শিল্পী প্রতিদিন সেই চেষ্টাতেই থাকবে, কি করে নূতন ভঙ্গীতে নবীন পদ্ধতিতে তার মহত্তম চিন্তা নিবিড়তম অভিজ্ঞতা মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। নইলে তো আমরা প্রলয় পর্যন্ত 'পাখীসবে'র সঙ্গে সেই একই 'রব' গেয়েও কূল পাবো না।

কিন্তু গেল ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। পাব্‌লো পিকাস্‌সোর নাম শুনলে আজকের দিনে শতকরা নিরানব্বই জন—কি প্রাচীন কি অর্বাচীন সবাই—অজ্ঞান। সেই পিকাস্‌সো গেল ফেব্রুয়ারি মাসের কাছাকাছি একটি বিবৃতি দেন। বোম্বায়ের Alvi Book Bulletin-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি বেরিয়েছে। উপস্থিত আমি কোনো মন্তব্য করছি না। শুধু সেটি তুলে দিচ্ছি। বাংলায় অনুবাদও করবো না, কারণ যাঁরা ইংরিজি জানেন না তাঁরা অযথা সন্তাপ থেকে বেঁচে যাবেন, আর যাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আসল প্রধান কারণ অবশ্য, এটির সুষ্ঠু অনুবাদ আমার শক্তির বাইরে।

তবে উভয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার জন্য মোটামুটি একটি ব্যাখ্যা দেব।

'Pablo Picasso, 83 years old Spanish-born father-figure of the modernist cult in art, has now made a sensational "confession" that he was simply amusing himself at the expense of his intellectual admirers with his bizarre creations.' Says he :

'The people no longer seek consolation and inspiration in art. But the refined people, the rich, the idle, seek the new, the extraordinary, the original, the extravagant, the scandalous. And myself, since the epoch of Cubism, have contended these people with all the bizarre things that have come into my head. And the less they understood it the more they admired it.

By amusing myself with all these games, all this nonsense, all these picture puzzles and arabesques, I became famous, and very rapidly. And celebrity, for a painter, means sales, profits, a fortune. Today, as you know, I am famous and very rich.

But when I am alone with myself I have not the courage to consider myself as an artist in the great sense of the word, as in the days of Giotto, Titian, Rembrandt, and Goya. I am only a public entertainer who has understood his time.'

পিকাস্‌সোর উক্তির বিগলিতার্থ—আজকের দিনের মানুষ কলাসৃষ্টির দ্বারস্থ হয় না সান্ত্বনা বা অনুপ্রেরণার জন্য ; আজকের দিনের নিষ্কর্মা, তথাকথিত বিদগ্ধ ধনীরা চায়, নূতন, মৌলিক, অসাধারণ, বাড়াবাড়ির চরম, কেলেঙ্কারির কলা আর তিনি সেই ক্যুবিজেম্‌-এর[৩] আমল থেকে তাঁর মাথায় যত সব আবোল-তাবোল হযবরল (bizarre)[৪] এসেছে, সেগুলো দিয়ে ঐ সব ধনীদের

৩ এদেশে গগনেন্দ্রনাথ সত্যই ছবি এঁকেছিলেন ঐ ক্যুবিজম্‌ পদ্ধতিতে।

৪ মডার্ন মাথামুণ্ডুহীন ছবির জন্যই যেন এই মোক্ষম bizarre শব্দটি

সন্তুষ্ট করেছেন। এবং তাঁর ঐ সব 'বিজার' ছবি তারা যত কম বুঝতে পেরেছে, সেই অনুপাতে মুগ্ধ প্রশংসা করেছে ততই উচ্চমাত্রায়। আর তিনিও ফুর্তি পেলেন ঐ ধরনের, ওদেরই প্রার্থিত খেলা খেলতে,—আঁকলেন অর্থহীন যা-তা (নন্‌সেন্স), ছবির ধাঁধা, জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তারই ফলে হয়ে গেলেন বিখ্যাত। আর আর্টিস্টের পক্ষে বিখ্যাত হওয়ার অর্থই, প্রচুর ছবি বিক্রির ফলে প্রচুরতর অর্থলাভ। এবং সবাই এখন জানেন, পিকাস্‌সো বলছেন, তিনি এখন বিখ্যাত এবং খুবই সম্পদশালী।

কিন্তু তার পরই বলছেন, কিন্তু তিনি যখন একা বসে আত্মচিন্তা করেন, তখন আর তাঁর সাহস হয় না, নিজেকে সেই মহান অর্থে শিল্পী আখ্যা দিতে, যে অর্থে শিল্পী বোঝাতো জিত্তো, তিৎসিয়ান, রেমব্রাণ্ট, গোইয়া-র যুগে। তিনি শুধু দিয়েছেন সবাইকে ফুর্তি (পাব্‌লিক্ এণ্টারটেনার—তার রূঢ়তম অর্থ 'ভাঁড়', 'সার্কেসের ক্লাউন', 'সং') কারণ তিনি 'যেমন কলি, তেমন চলি' তত্ত্বটি বুঝতেন।

নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজ আভিধানিক এর প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গিয়ে যেন দিশা না পেয়ে অনেকগুলো কাছে পিঠের শব্দ ও তাদের সমন্বয় করেছেন: eccentric, fantastic, grotesque, mixed in style, half barbaric. কিন্তু এদেশের সুকুমার রায় 'বিজার' শব্দটির প্রকৃত অর্থ একটি কবিতার মারফতে যা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। আমি কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি:

'কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপমুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" ব'লে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?' ইত্যাদি।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর পিকাস্‌সোর 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেটা আমার চোখে পড়েনি। তবে আমার কাছে পূর্বের অবোধ্য একটি সমস্যা সরল হয়ে গেল।

পিকাস্‌সো বৃদ্ধবয়সে এক তরুণীকে বিয়ে করেন। কয়েক বছর পর তরুণী তাঁকে ত্যাগ করে তালাক নেন (কিংবা হয়তো পিকাস্‌সোই এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করেন যে তালাক ভিন্ন অন্য গতি ছিল না—কারণ তিনি 'গ্রেট্ আর্টিস্ট' হন আর নাই হন এ তত্ত্বটি কিন্তু অনস্বীকার্য, 'গ্রেট আর্টিস্ট'দের যে-খামখেয়ালির বাতিক থাকে, মাথায় যে-ছিট থাকে সেটা তিনি পেয়েছেন ন'সিকে!) এবং পিকাস্‌সোর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিকাস্‌সো নাকি সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করে বিফল হন। সেই জীবনীটি যখন ধারাবাহিকভাবে কন্টিনেন্টের একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় তখন তার প্রায় সব কটা কিস্তিই আমি পড়ি, এবং আমার মনে সব চেয়ে বেশী বিস্ময় সৃষ্টি করলো —আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হয় না—যে, সে পুস্তিকায় পিকাস্‌সো তাঁর তরুণী স্ত্রীকে আর্ট বলতে কি বোঝায় এবং ঐ বিষয় নিয়ে যে সব আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেন সেগুলো সব প্রাচীন যুগের কথা; অর্থাৎ সেই মাইকেল এঞ্জেলোর আমল থেকে প্রায় একশ' বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আলঙ্কারিক, কলারসিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, পিকাস্‌সো মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র!

আমি তখন চিন্তা করে বিহ্বল হয়েছি, এই যদি আর্ট সম্বন্ধে পিকাস্‌সোর ধারণা হয় তবে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে এ ধারণার কোনো সামঞ্জস্যই তো খুঁজে পাচ্ছি নে! একদিকে লোকটি আর্ট সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল, একাডেমিক ধারণা পোষণ করেন, আর অন্যদিকে তিনি এঁকে যাচ্ছেন—তাঁর ভাষাতেই বলি— 'বিজার' 'গ্রোটেস্ক' যত সব মাল!

এ যেন, আপনি নামতা শিখেছেন ঠিকই, কিন্তু অঙ্ক কষার বেলা করছেন ৩×৪=৮২, ৭+৫=২!

পিকাস্‌সোর এই বিবৃতিটি পড়ে আমার মনের ধন্দ গেল। তাঁর আদর্শ ছিলেন জিত্তো রেমব্রাণ্টই, কিন্তু তিনি জানতেন প্রথমত, ওঁদের স্তরে আদৌ পৌঁছতে পারবেন কি না, দ্বিতীয়ত, পৌঁছতে পারলেও বাজারে সেই 'প্রাচীন ঢঙে'র ছবির চাহিদা আজ আর আদপেই নেই, তৃতীয়ত, তাঁরও খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বশেষে, সেই অর্থের জন্যই যখন

ছবি আঁকবো আপন আদর্শ বেহায়া বিসর্জন দিয়ে—তবে সেইটাই করি পূর্ণমাত্রায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'উইথ্ এ ভেন্‌জেন্‌স', উর্দুতে বলে, 'পক্‌ড়ে তলওয়ার দামন্‌কে সম্ভালে কোই ?'—তলওয়ার যখন ধরেইছি তখন রক্তের ছিঁটে পড়বে বলে কুর্তার দামন (প্রান্ত, অঞ্চল) অন্য হাত দিয়ে সামলানোটা বিলকুল বেকার।

অবশ্য এসব তর্কবিতর্কের অর্থ হয়, যদি আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিই যে পিকাস্‌সো এ-বিবৃতিতে প্রাণের কথা খোলাখুলিই বলেছেন, সজ্ঞানে সত্যভাষণই করেছেন। নইলে কাল যদি আরো পয়সা কামানোর জন্য, বা বিনা কারণেই আরেকটা নয়া ফয়তা ঝেড়ে বলেন, 'না না, ওটা আমার সত্য বিবৃতি নয়। আমি শুধু রগড় দেখবার জন্য এই মস্করাটা করেছিলুম—আমার অন্ধ স্তাবক, এবং ঐ সব মূর্খ ধনীরা যারা নৃত্য করতে করতে আমার ছবি কিনেছে হুজুগে মেতে, ন্যায্য মূল্যের শতগুণ বেশী টাকা ঢেলে, তারা তখন কি বলে ?—সোজা ইংরিজিতে 'আই উয়োজ পুলিং দেয়ার লেগ্!'—তখন আজ যে-সব প্রাচীনপন্থীরা এই হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভাঙাটা দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছেন, তাঁরা লুকোবেন কোন্ ইঁদুরের গর্তে!

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কর্তাভজাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা বলবেন, 'আজ যদি শেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত একখানা গোপন ডাইরি বেরোয় যাতে তিনি লিখেছেন, "আমি হতে চেয়েছিলুম হোমার, ভার্জিলের মতো কবি, কিন্তু যখন দেখলুম এযুগে সে সব কবিদের চাহিদা নেই তখন হয়ে গেলুম, পাব্‌লিক এণ্টার-টেনার—ভাঁড়" তা হলেই কি আমরা সেটা মেনে নেব, আর বলবো, শেক্সপীয়র গ্রেট পোয়েট নন!'

মুসলমানদের ভিতর একাধিক সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করেন, তাঁদের সপ্তম ইমাম (পৃথিবীতে আল্লার প্রতিভূ) অদৃশ্য হয়ে যান, তিনি সত্যি সত্যি মারা যাননি,—সময় হলেই তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে মাহ্‌দী (কল্কি) রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। অন্য সম্প্রদায় বলেন, 'সপ্তম ইমাম না, অদৃশ্য হন দ্বাদশ ইমাম, তিনিই মাহ্‌দীরূপে ইত্যাদি।' তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, 'দ্বাদশ না, চতু-র্বিংশতি ইত্যাদি।'

এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনের আন্দালুশ প্রদেশের মৌলানা ইব্‌ন হাজম যেন এঁদের বাবদে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে বলছেন, 'অলৌকিক এদের অন্ধবিশ্বাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থাকবার ক্ষমতা! কারো ইমাম অদৃশ্য হয়েছেন অষ্টম শতাব্দীতে, কারো নবম, কারো বা দশমে। যে জিনিস হারিয়ে গেছে (অদৃশ্য হয়েছে) দু'শ তিনশ চারশ বছর

আগে, এরা এখনো সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ বা আবার বলে, অদৃশ্য ইমাম আছেন একটা মেঘের আড়ালে! আহা, যদি জানতুম কোন্ মেঘটা! চীৎকারে চীৎকারে তাঁকে অতিষ্ঠ করে বলতুম, "সশরীরে নেমে এসে কুল্লে বখেড়ার ফৈসালা করে দাও না, বাবা!" তাজ্জব, তাজ্জব!'

পিকাস্সোর আগের বিবৃতি যদি সত্য হয় তবে আমাদের বলতে হবে, ভক্তজনের যে উপাস্য পিকাস্সো তিনি আত্মহত্যা করলেন। আর ভক্তজন বলবেন, তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন।

আর যে-সব সরলজন বিশ্বাস করে ঐ সব 'বিজারের' বাজার বিলকুল ঝুটা, মস্করা করে ছবির ধাঁধা বানিয়ে আর আরাবেস্ক এঁকে প্রকৃত কলাসৃষ্টি হয় না, তার জন্য প্রচুর অক্লান্ত তপস্যার প্রয়োজন তাদের জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিটি তুলে দিলুম; কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলুম না,—আমার চোখে পড়েছে এই আজ: কিছুদিন আগে কোনো একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আলাউদ্দিন সাহেব এবং গোলাম আলি সাহেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে আলাউদ্দিন সাহেব বললেন—"নব্বই বছর ধরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর দর্শনের আশায় সাধনা করে আসছি। একটি মাত্র আশায় দিনের পর দিন সাধনা করে আসছি—একদিন-না-একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অমরাবতীর-সঙ্গীত মন্দিরে ঢোকবার অনুমতি দেবেন। আজও আমার সাধনার শেষ নেই। এতদিন সাধনার ফলে দূর থেকে শুধু মন্দিরের আবছায়া ছায়াটা যেন একটু একটু নজরে আসছে।"

এর পর গোলাম আলি সাহেব অভিনন্দনের উত্তরে বললেন—"আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। দেবী সরস্বতী তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্দিরের ছায়া দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি হতভাগ্য এতদিন সাধনা করার পরেও সঙ্গীত-মন্দিরের ছায়া দেখতে পাওয়া দূরে থাক—উপরে ওঠবার সিঁড়িটুকুও এখনো শেষ করতে পারিনি। জানি না কত সহস্র বছর আরো কঠিন কঠোর সাধনায় দেবী প্রসন্ন হবেন।"

দর্পণ

বছর পনেরো পূর্বে সেই সোনার বাঙলা মেতে উঠেছিল রম্যরচনা মারফত রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে। তারপর সে হুজুগ কেটে যায়—তার কারণ বর্ণন উপস্থিত মুলতুবী রাখলুম। বছর পাঁচ-সাত পূর্বে দেখলুম, কেষ্টবিষ্টু তো বটেনই, পাঁচু-পেঁচি তক্ ছেড়ে কথা কইছেন না—সবাই লেগে গেছেন, আত্মজীবনী প্রকাশ করতে। সে-মোকায় আমারও মনে বাসনা যায় একখানি সরেস আত্মজীবনী ছেড়ে আর পাঁচজনকে ঘায়েল করে দি, কিন্তু বিধি বাম। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড্ ডিস্পোজেস'—মানুষ প্রস্তাব পাড়ে (কোন কিছুর কামনা করে) আর ভগবান সমাধান করেন, তাঁর ইচ্ছে মতো। এটা ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছে আর পাঁচটা ভুল জিনিস শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে। আপনারা সরল চিত্ত ধরেন, আর ভাবেন, ইংরেজ আমাদের ইংরিজি শিখিয়েছে। বিলকুল ভুল। ইংরেজ নিজে শেখে 'কিংস্ ঈংলিশ', তার অর্থ, তাদের রাজা—উপস্থিত রানী—যে ইংরিজি ব্যবহার করেন। আর আমাদের শিখিয়েছে 'ব্যাবু ইংলিশ' বা 'বাবু ইংলিশ'! আসলে প্রবাদটা 'ম্যান প্রোপোজেস, উম্যান ডিজপোজেস' অর্থাৎ পুরুষ প্রস্তাব করে, স্ত্রীলোক ফৈসালা করে। প্রবাদে ভেজাল কর্ম কিছু নূতন নয়; স্মরণ করুন বেদনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান দ্রোণাচার্য তাঁর শিশুতনয়কে দুধের পরিবর্তে কি দিয়েছিলেন! কিংবা সদাশয় সরকার—থাক গে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে।

শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে! হেন বাঙালী আছে কি যে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না? অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্—দেবভাষায় আপ্তবাক্য। ঐ তো করলেন ব্যাকরণে ভুল!

আত্মজীবনী লিখি-লিখছি লিখি-লিখছি করছি এমন সময় এক রমণীর পাল্লায় পড়ে আমাকে কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়।

শুনেছি, জরাসন্ধ নাকি চৌদ্দ বছর আলীপুর জেলে কাটান। তার কয়েক বৎসর পর একদা বাস-এ করে ঐ জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর বালকপুত্র চিৎকার করে সোল্লাসে তাঁকে শুধোয়, 'বাবা, ঐখেনে তুমি চোদ্দ বছর ছিলে? না?'

বাস-সুদ্ধ লোক তাঁর পানে কটমটিয়ে তাকায়। যদ্যপি গাঁটকাটার চোদ্দ বছর জেল হয় না, তবু সবাই অচেতন মনে আপন আপন পকেটে হাত দিয়ে

মনিব্যাগ পাকড়ে ধরে। তা ধরুক। কিন্তু বেচারী জরাসন্ধ বাস-সুদ্ধ লোককে বোঝান কি প্রকারে যে, তিনি জেলে চোদ্দ বছর সুপারিনটেন্‌ডেনটের কর্ম করেছেন। বুঝুন ঠ্যালাটা! তাই তো ঋষি বলেছেন, 'দারা পুত্র পরিবার কে তোমার তুমি কার?' পুত্র না হয়ে আর কেউ হলে শান্তস্বভাব তিতিক্ষু 'জরাসন্ধ' বসিয়ে দিতেন নাকে মোক্ষম এক ঘুঁষি!

না। আমি জেলে যাই, আইনত, খাস জজসাহেবের হুকুমে। সে কথা যথাসময়ে হবে।

জেলে একজন আরবের সঙ্গে আলাপ হয়—আমি পোরট্ সঈদের একটা গোপন নাইট-ক্লাবে চাকরি করার সময় কিছুটা আরবি শিখে যাই, ঐ ভাষায় কটুকাটব্য করতে ততোধিক।

আরবটি বেশ লেখাপড়ি করেছে। তবু যে কেন জেলে এল তার কারণ একটি সরেস্ ফার্সী কবিতাতে আছে।

এক বৃদ্ধ বাজীকর তার ছেলেকে বলছে, 'ছাখ ব্যাটা, এই বয়সেই তুই আমার মতো হুনুরীর কাছে সব এলেম রপ্ত করে নে। কি করে পাঁচটা বল নিয়ে লুফোলুফি করতে হয়, টুপির ভিতর থেকে জ্যান্ত খরগোশ বের করতে হয়, হাত-পা-বেঁধে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলে বেরিয়ে আসতে হয়।

শুনবি না বুড়ো বাপের কথা? তা হলে আল্লার কসম, খুদার কিরে কেটে বলছি, তোকে পাঠাবো প্লাটশালে, তার পর ইস্কুলে, তারপর কলেজে। এম-এ, পি-এইচ-ডি করে বেরনোর পর যখন দোরে দোরে ভিক্ষে মাগবি, লাথি-ঝ্যাঁটা খাবি তখন বুঝবি রে, ব্যাটা, তখন বুঝবি, বুড়ো বাপ হক্ক কথা বলেছিল কি, না।'

আরবের বেলাও বোধ হয় তাই হয়েছিল। কলেজের বিদ্যেতে যখন পেট ভরলো না তখন শিখতে গেল বড় বিদ্যে—ল্যাটে গেল, ল্যাটে গেল! বুড়ো বয়সে বিয়ে করা আর বড় বিদ্যে শিখতে যাওয়া একই আহাম্মুখী!

পীরসাহেব সেজে আরবিস্থান থেকে সোনা পাচার করতে গিয়ে শ্রীঘর।

সে কথা থাক। তার কাছে কিন্তু একখানা বই ছিল। সেটি পবিত্র কুরান-শরীফ বলাতে জেল-কর্তৃপক্ষ সেটিকে তার কাছে হামেহাল রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতখানি আরবী বিদ্যে আমার নেই যে, স্বচ্ছন্দে কেতাবখানা পড়ি। তাই আরব বাবাজীই আমাকে পড়ে শোনাতো। লেখকের নামটা আমার এখনো মনে আছে। এরকম দেড়-গজী নাম ইহসংসারে বিরল বলে সেইটে বহু তকলীফ

বরদাস্ত করে মুখস্থ করে নিয়েছিলুম: আবু উস্‌মান্ আম্‌র ইব্‌ন্ বহ্‌র্ উল্ জাহিজ্—ধানাই-পানাই বাদ দিলে তার বিগলিতার্থ দাঁড়ায় 'প্রলম্বিত চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট'। এই জাহিজ লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।

এ-দেশে যে আরব্যরজনী খুবই প্রচলিত সে-তথ্য আরব জানতো না। আমি সে আরব্যরজনীর কথা বলছি নে যেটি আপনারা কলেজ স্ট্রীটে পান—কেটেছেঁটে সেটিকে করা হয়েছে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতো পূতপবিত্র। আমি বটতলা সংস্করণের কথা বলছি। অশ্লীলতায় মূল আরব্যরজনী—ঐ যে কি বলে, লেডি চ্যাটারলি না কি—তেনাকে ঢিড-দুয়ো দিতে পারে, হেসে-খেলে। পারলে সত্য গোপন করতুম, কিন্তু সুচতুর পাঠক বহু পূর্বেই ধরে ফেলেছেন ঐ কারণেই বইখানা আমাকে ছেলেবেলায়ই আকৃষ্ট করেছিল। আহা, ঐ যে নিগ্রো ছোকরা গোলাম আর সুন্দরী প্রভুকন্যার কেচ্ছা—না, থাক্ আবার আলীপুর যেতে চাই নে।

আরব বলছিল, জাহিজ্ নাকি আরব্যরজনীর খলীফা হারুন-অর্-রশীদের নাতি না কে যেন, সেই খলীফার উজীরের নেক্-নজরের আস্কারা পেয়ে আপন বউকে পর্যন্ত ডরাতেন না। ব্যস্, ঐ এক কথাই কাফী। কথায় বলে, বাঘের এক বাচ্চাই ব্যস্।

আত্মজীবনী আরম্ভ করার গোড়াতেই মনে পড়ল, জাহিজ্ যে অবতরণিকা দিয়ে তাঁর জীবনী আরম্ভ করেছেন সেইটে দিয়ে আমিও আরম্ভ করলে আমারও যাত্রা হবে নিরাপদ—

'যেমতি মূষিক ভ্রমে সাগরে বন্দরে
নৃপতরী আরোহিয়া—'

এমন সময় খটকা লাগল। জাহিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় তো দিতে হয়। নিদেন তাঁর জন্মকাল লীলাভূমি তো বাৎলাতে হয়।

অধমের বাসভবনে যাঁরাই পায়ের ধূলি দিয়েছেন, তাঁরাই জানেন সেখানে আর যা থাক, না-থাক, বই সেখানে একখানাও নেই। শুনেছি এক 'বিদ্যেসাগর' নেটিভ মহারাজা ভাইসরয়ের সামনে আপন কিম্মৎ বাড়াবার জন্য একটি কলেজ খোলেন। প্রিন্সিপল নিযুক্ত হয়ে দেখেন, কলেজ লাইব্রেরি নামক কোনো কিছু সেখানে নেই। তিনি টাকা চাইতেই মহারাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো হারামীকো অভী স্টেটসে। লেখাপড়া শিখে আসেনি; এখন বুঝি বই পড়ে কলেজে পড়াবে! আমাকে কি উল্লু পেয়েছে নাকি?'

এর থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য নতমস্তকে বারংবার স্বীকার করবো, একখানা বইয়ের সন্ধানে আমি সংবরণের মতো পত্নীবর কামনা করে—

—তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত—

করেছি। কি সে বই? ধর্মগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র—?

এসব কিছু না। একখানা চেক্ বই। সে দুঃখের কথা আর তুলবো না।

কিন্তু পুলিসের হুলিয়ার হুড়ো খেয়ে উপস্থিত যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছি সেই এলাকায় এক অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করেন। তদুপরি তিনি অতিশয় অমায়িক। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলুম, 'স্যর, জাহিজ্ নামক আরবী লেখক কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

চট করে একখানা বই টেনে নিলেন। ঠিক ঐ ঢপের আরো খান পঁচিশেক ভলুম শেলফে বিরাজ করছিল। বই থেকে পড়ে বললেন, 'মৃত্যু হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে—'

আমার কেমন যেন ধোঁকা লাগলো। বললুম, '১৮৬৯? হারুন-রশীদের নাতির আমলের লোক তিনি—এই কথাই তো শুনেছি।'

'ঠিকই তো! দেখি, হারুনের নাতি'—বলে আরেক ভলুম পাড়লেন—'হ্যাঁ, অল-ওয়াসিক—৮৪২ থেকে ৮৪৭।' একটু চিন্তা করে বললেন, 'অহ্ হো, বুঝিছি। ১৮৬৯-এর প্রথম ১টা বাদ দিতে হবে! ওয়াসিকের মৃত্যুর পর আরো বাইশ বছর বেঁচেছিলেন আর কি।' তা থাকুন আর নাই থাকুন। মোদ্দা কথা, কিন্তু ইনি নবম শতাব্দীর লোক, আর এই পণ্ডিতদের বেদ বলো, কুরান বলো, পরম পূজনীয় এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বেচারীকে টেনে নিয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীতে! তোবা! তোবা!! নির্জলা পূর্ণ এক হাজার বছরের ডিফ্রেনস্।

যে রকম সরলভাবে তিনি আমাকে স্ক্যাণ্ডালটা বুঝিয়ে বললেন যে মনে হয়, কলকাতার ডিটেকটিভ পর্যন্ত সেখানে থাকলে বুঝে যেত।

জাহিজ্ অবতরণিকায় বলেছেন, 'চতুর্দিকে আমার দুশমন আর দুশমন—দুশমনে দুশমনে আবজাব করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার মুরুব্বী; কেউ ডরের মারে আমার রাজহাঁসটাকে পর্যন্ত বু করতে সাহস পায় না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আমার দেহাস্থি গোরস্তানে প্রোথিত আমার পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষগণের জীর্ণাস্থির সঙ্গে শুভযোগে সম্মিলিত হওয়ার পূর্বেই (মেহেরবান

খুদা সে শুভমিলন আসন্ন করুন !) আমার দুশমন-গুষ্টি অশেষ তৎপরতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এবং আমার উর্ধ্বতন তথা অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পূতিগন্ধময় নিন্দাবাদ করতে—এবং তার শতকরা ন'সিকে কপোলকল্পিত, আকাশ-পুরীষ-চয়িত বেহদ্দ গুলগঞ্জিকার ঝুটমুট।

যেমন, আমি জানি, আর পাঁচটা নিন্দাবাদের মাঝখানে, অতি কুচতুরতা সহ তারা কীর্তন করবে—আমি নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলুম, সাক্ষাৎ ইউ-সুফ-পারা হেন দেবদুর্লভ চেহারা নাকি কামনা করেন স্বয়ং বেহেস্তের ফেরেস্তারা।

ক্রোধান্ধ হয়ে জাহিজ্ এ স্থলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, 'মিথ্যা, মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমার প্রতি অন্যায় অবিচার! আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, যে এ-অপবাদ রটাবে তার পিতা নির্বংশ হবে। আমি আদৌ সুশ্রী নই। বস্তুত টেকো মর্কটটার চেহারা পেলে আমি বর্তে যাই। আমার মুখমণ্ডল নামক বদ্‌নাবদন চেহারার বিভীষিকা দেখে অসংখ্য শিশু ভিরমি গেছে। আমার—'

সরল পাঠক! অধম অবগত আছে তুমি জাহিজের এই আত্মকথন শুনে ধন্ধে পড়ে গ্রীবা কণ্ডুয়নে লিপ্ত হয়েছ! তোমার মনে হচ্ছে, 'এ তো বিচিত্র ব্যাপার! কেউ যদি জাহিজ্‌কে প্রিয়দর্শন বলে মন্তব্য করে তবে সেটা নিন্দা হতে যাবে কেন, আর যে মন্তব্যটা করেছে সে-ই বা দুশমন হতে যাবে কেন? আর জাহিজ্ যদি কুৎসিতই হন তাতেই বা কি? তাঁর গোর হয়ে যাওয়ার পর কে আর মিলিয়ে দেখতে পারবে তিনি সুরূপ না কদ্রূপ ছিলেন। কথায় বলে, "মড়ার উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি।" তবে কি জাহিজ্ নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কেউ মিথ্যে বলুক, এটা তিনি সইতে পারতেন না?—তা ও সে মিথ্যে প্রিয়ই হোক্, আর অপ্রিয়ই হোক্।

এসবের উত্তর আমি দেব কি প্রকারে? বেলা গড়িয়ে গেল, আর তুমি এখনো বুঝতে পারোনি, আমার পেটে সে-এলেম নেই! বিশেষত আমার সেই মুরুব্বী পণ্ডিত—যিনি দশটি ভাষায় ত্রিশ-ভলুমী সাইক্লোপীডিয়া নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁর বাড়তিপড়তি মাল ভাঙিয়ে আমি হাঁড়ি চড়াই, তিনি গায়েব। তবে শেষ দেখার সময় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বলেন, 'রেনেসাঁসের পূর্বেই এই লোকটা লিখল আত্মজীবনী! আশ্চর্য আশ্চর্য! রেনেসাঁসের পূর্বে তো শুধু রাজরাজড়া আর ডাঙর ডাঙর সাধুসন্ত। সাধারণ মানুষেরও যে একটা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে সেটা আবিষ্কৃত হল রেনেসাঁসের সময়। সাধারণ লোকের আত্মজীবনী তো প্রথম লেখেন আবেলরাড দ্বাদশ শতাব্দীতে, তার পর দান্‌তে 'নবজীবন' (ভিটা নুওভা) লেখেন ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শেষে। আর তোমার ঐ জাহিজ্ না কে লিখে ফেললে নবম শতাব্দীতে? বড়ই বিস্ময়জনক, প্রায় অবিশ্বাস্য!'

সরল পাঠক, তোমার কুটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একটা ভরসা তোমাকে দিতে পারি। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে—এক্সট্রিম্‌স মীট—দুই অন্তিম প্রান্ত একত্র হয়ে যায়। যেমন দেখতে পাবে গ্রাম্য গাড়ল (ভিলেজ ইডিয়ট) দাওয়ায় বসে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয় একটা শুকনো খুঁটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, আর যোগীশ্রেষ্ঠও তাবৎ দিবসটা কাটিয়ে দেন একাসনে বসে বসে। উভয়েই কর্মস্পৃহা জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমি এক প্রান্তে, জাহিজ্ অন্য প্রান্তে—উভয়ের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব আমার আত্মজীবনী যদি অবহিত চিত্তে পাঠ করো তবে হয়তো তোমার প্রশ্নগুলোর কিছুটা সদুত্তর পেয়ে যাবে।

জাহিজ্ তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন এই বলে যে তাঁর দুশমনের অভাব নেই। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার হুবহু মিল। বাকিটা সবিস্তার নিবেদন করি।

আত্মজীবনী-লেখক মাত্রই আপন বাল্যকাল নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। এবং সেই সুবাদে সকলেই আপন আপন বংশ-পরিচয় দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যতটা পারেন, পরিবারের মান-ইজ্জৎ বাড়িয়েই বলেন। এ নিয়ে বাক্যব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশ, স্বজাতি, মাতৃভাষা নিয়ে অযথা অহেতুক বড়াই করে না, এমন মানুষ বিরল।

আমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে। তার কারণ এ নয় যে, আমি হীন পরিবারের লোক। সত্য কারণটা পাঠক একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবেন।

বস্তুত, পরিবার আমাদের খানদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ শাহ আহমদের (শাহ এ স্থলে বাদশা নয়—'সৈয়দ'কে মধ্যযুগে 'শাহ' বলা হত) দরগা এখনো তরপ পরগনাতে আমাদের ভদ্রাসনে বিরাজিত—সেখানে প্রতি বৎসর উর্স্ হয়। তারই অল্প দূরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয়—মাতা শচী দেবীর জন্ম সেখানেই। আমাদের বংশ 'পীরের বংশ'—এঁরা কিন্তু যজমানগৃহে অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। আমার পিতামহ, মাতামহ, আমার অগ্রজদ্বয় সুপণ্ডিত। আমার অগ্রজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে সম্প্রতি 'চর্যাপদে'র একখানি নূতন টীকা রচনা করেছেন। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ফকীরী, মারিফতী গীত ঢাকা বেতারে শুনতে পাবেন।

কিন্তু থাক, আর না। এ বিষয়টাই আমার কাছে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক।

কুলমর্যাদার প্রস্তাব উঠলেই আমার পিতা বলতেন, 'বাপ-ঠাকুর্দার শুকনো হাড় চিবিয়ে কি আর পেট ভরবে?' আমিও চিবোইনি। চিবোনো দূরে থাক, আমাদের পিতৃপুরুষ যে গোরস্তানে শুয়ে আছেন তার পাশ দিয়ে যেতে হলে আমি মাথা হেঁট করি।

আমি এই গোষ্ঠীর একমাত্র ব্ল্যাকশীপ—কালা ম্যাড়া।

শব্দার্থে আমার বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণ তো বটেই—বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা আর দেব না। তবে এইটুকুন বলতে পারি পরবর্তীকালে 'উচ্চ-শিক্ষা'র অজুহাত দেখিয়ে জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা দুই গুরুর কিল কানমলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিই তখন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুত রামকিঙ্কর বায়েজ আমাকে দেখা মাত্রই সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন, 'হুর্‌রে হুর্‌রে। কেল্লা মার দিয়া। কিষ্কিন্ধ্যার মহারাজ সুগ্রীবের বংশধর শ্রীযুত আহ্লাদী কুঞ্চিতপদম্ আমাকে বায়না দিয়েছেন শয়তানের একটি মূর্তি গড়ে দেবার জন্য। মানসসরোবর থেকে কন্যাকুমারী, হিংলাজ থেকে পরশুরাম কুণ্ড অবধি খুঁজে খুঁজে হায়রান—মডেল আর পাই নে। গুরুদেবের কৃপায় আজ তুই হেথায় এসে গেছিস। আয় ভাই আয়। চ' কলাভবনে।'

ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহভের বেহেশতে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ। সেখান থেকে যদি শয়তানের মূর্তি গড়ার ফরমায়েশ আসতো সেটাও না হয় বুঝতুম কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা থেকে! সেখানকার মেয়েমদ্দা দুই-ই বুঝি দারুণ খাপসুরৎ হয়!

পরবর্তীকালে কিষ্কিন্ধ্যা গিয়েছিলুম। দ্রাবিড় অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রমণীরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—'কামের প্রলোভন থেকে আমাদের রক্ষা করো।' তাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করে ভগবান কিষ্কিন্ধ্যার পুরুষ সৃষ্টি করেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। আসছে রবিবারে যমের পূজা উপলক্ষে অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় টাউন হলে একটি টুর্নামেন্ট হবে। যে সব চেয়ে বেশী বিকট মুখ-ভেংচি কাটতে পারবে সে পাবে হাজার টাকার পুরস্কার।

আমি কম্পীট করিনি। নিরীহ দর্শক হিসাবে ছিলুম মাত্র। অবশ্য বিকট বিকট গরিল্লাপারা নরদানবরাই ঐ ভেংচি প্রদর্শনীতে হিস্যে নিয়েছিলেন—কার্তিক যতই ভেংচি কাটুন না কেন তাঁকে তো আর মর্কটের মতো দেখাবে না!

সে কী ভেংচির বহর! এক-একটা দেখি আর আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। আর সে কী দুর্দান্ত নেক্-টু-নেক্ রেস! কোথায় লাগে তার কাছে নিক্‌সন-হামফ্রের ঘোড়দৌড়!

পালা সাঙ্গ হল। হঠাৎ দেখি তিনজন জজই মল্লদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দর্শকদের গ্যালারি পানে এগিয়ে আসছেন। তার পর ওমা, দেখি, ঠিক আমারই সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার গলায় জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদ্যপি আপনি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেননি তবু আপনাকে প্রথম স্থান না দিলে অবিচার হবে। ভেংচি না কেটেও আপনার মুখে বিধিদত্ত যে ভেংচি সদাই বিরাজ করছে সেটা অনবদ্য, দেব—না, না—যমদুর্লভ। তবে আপনি এই কম্পিটিশনে পার্ট নেননি বলে আইনত টাকাটা দেওয়া যায় না—সেটা যমপূজায় ব্যয় হবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ—পত্রপুষ্পাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পৌঁছায়, বিকটের পূজো মাত্রই আপনাকে পৌঁছবে।' এ বাবদে শেষ কথা। আমি আজও কেন আই-বুড়ো আছি, সেটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবে না।

পাঠক! এ লেখন প্রধানত তোমার অখণ্ড-সৌভাগ্যবান বংশধরদের জন্য। তারা যদি প্রত্যয় না যায় তবে যেন একবার কলাভবনে সন্ধান নেয়। ঐ মূর্তির একটি ফোটো তুলে রেখেছিলেন—আশ্চর্য, লেন্সটা কেন চৌচির হল না—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রামকিঙ্কর। ছবিটা তিনি দেখালেও দেখাতে পারেন। তবে তারা যেন গ্যাসমাস্ক তথা ধুঁয়ো মাখানো কাঁচ সঙ্গে নিয়ে যায়। মূর্তিটা গায়েব হয়েছে। গুজোরব শিল্পী রর্দার প্রেতাত্মা সেটি সরিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

পাড়ার ভটচার্য মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বিয়ের সময় বনে নাকি বরের রূপ কামনা করে (আমার রূপের বর্ণনা দিলুম), বন্ধুবান্ধব বরের উত্তম কুল কামনা করে (সেটাও হল), পিতা সুশিক্ষিত বর চায়—এইবারে আমরা এলুম ইংরিজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব দি ব্যাটল্' বা রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

ডাক্তার অবশ্য পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স দি রেস'—বিলম্বিত চালেই চলুক না, সেই চাল যদি সদা বজায় রাখে তবে সে জিতবে। অর্থাৎ হোক না গর্দভ, সে যদি গর্দভী চাল বজায় রেখে চলে তবে আখেরে ডার্‌বি ঘোড়ার রেস জিতবে।

জীবনের অষ্টম বর্ষাবধি আমি শুধু একটানা 'ভাত খাবো, ভাত খাবো' বলেছি। একদম স্টেডি সুরে। ডাক্তারের স্তোকবাক্যে আত্মজন পরিতৃপ্ত না হয়ে মেনে নিলেন যে আমি স্লোউইটেড জড়ভরত। অষ্টম বর্ষে (চাণক্যকে ঢিঢ দিয়ে পঞ্চমে নয়) আমাকে পাঠানো হল পাঠশালে।

হাতেখড়ির প্রথম দিবসান্তে গুরুমশাই যে-শ্লোকটি আবৃত্তি করেন সেটি

মমাগ্রজ লিখে নেন :—

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাক কোকিল দুইই কালো, কিন্তু মাইকেল মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন 'পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে', আর আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা একেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন, 'এটা তোর ভাই ?'

তারপর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'কস্মিনকালেও শুনিনি, কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়লো। এইবারে একটা ব্যত্যয় দেখলুম—হরি হে, তুমিই সত্য।'

এস্থলে তড়িঘড়ি আমি একটি সম্ভাব্য 'ভ্রম সংশোধন' করে রাখি। আমার দাদারা ফর্সা। আর আমি বিটকেল কৃষ্ণবর্ণ। অথচ আমরা একই বর্ণের, অর্থাৎ একই কুলের, অন্তত এই আমার বিশ্বাস ছিল বহুদিন ধরে।

কাকের সঙ্গে আমার আরো একটা জবরদস্ত দোস্তী দেখা গেল অচিরাৎ। আমি নিরবচ্ছিন্ন সেল্‌ফ পর্ট্রেট আঁকলুম ঝাড়া তিনটি বছর ধরে। অর্থাৎ পাততাড়িতে বছরের পর বছর কাগের ছা বগের ছা লিখে গেলুম।

আমার বিস্ময় লাগে, শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের জন্মনগরী করিমগঞ্জ আমারও তদ্বৎ। তাঁর আমার জন্ম একই বৎসরে। আজ তিনি তাবৎ দেশের শিক্ষাদীক্ষা তরণীর কর্ণধার, আর আমি সুর করে একটানা গেয়ে যাচ্ছি—'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—'

আমি যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরঙ্কুশ 'ডডনং' হয়ে রইলুম তার জন্য কবিগুরু গুরুদেবও খানিকটা দায়ী। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি আমৃত্যু অচলা থাকবে। কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

কবিগুরু বাঙালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে উত্তম উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, কিন্তু যে-আদর্শ 'এলেন আমার দ্বারে/ডাক দিলেন অন্ধকারে' এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুল্লেখার মতো আমার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে দিল সেটি এই :

'নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই।
আমি তো, মা, চাইনে হতে
পণ্ডিতমশাই।

নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।'

পুনরায় :—

'যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খু হব বলে।'

আমাকে অবশ্য কোনো উচাটন মন্ত্রোচ্চারণ করে কোনো প্রকারেই পণ করতে হয়নি। সর্বেশ্বর প্রসাদাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার লগ্ন থেকেই আমি কর্মমুক্ত। গোড়ায় ভেবেছিলুম, এটা বুঝি জড়ত্বের লক্ষণ। পরে শুনি দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি ছন্দে গেঁথে বলেছেন, 'কর্ম কিং পরং। কর্ম তজ্জড়ম্॥' 'কর্ম তো স্বতন্ত্র নয়, কর্ম সে তো জড়!' তবে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কর্মাতে কর্মাতে অম্বিকে গোসাঁই হয়ে গিয়ে কোন্ তুর্কীস্থানের বাখারার আজব মেওয়া আলু-বুখারা লাভ হবে ?

অবশ্য নতমস্তকে স্বীকার করবো, আমি পাঠশালা পাস করেছিলুম।

শুনেছি, নাৎসি যুগে এমনও চৌকশ স্পাই ছিল যে বিশ গজ দূরের থেকে শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়া দেখে দুজনের ফিসফিসিনিতে কি কথাবার্তা হচ্ছে আদ্যন্ত বুঝে যেত এবং পকেটে হাত গুঁজে প্যাডের উপর সেটা আগাপাস্তলা শর্টহ্যাণ্ডে তুলে নিতে পারতো। আমি কিন্তু সে লাইনে কাজ করিনি। শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে আমরা সে ব্যক্তিকে বলি 'সেয়ানা'। আমি সেই দৃষ্টিশক্তির আনুকূল্যে দশ হাত দূরের ব্রিলিয়ান্ট বয়ের খাতা থেকে টুকলি করে তর্ তর্

করে পেরিয়ে গেলুম পাঠশালার ভব-নদী।

বুদ্ধিমান জন আপন বুদ্ধির জোরে তরে যায় বলে ভাগ্যবিধাতা মূর্খকে সাহায্য করেন, নইলে তিনিও বিলকুল বেকার হয়ে পড়বেন যে! মৌলা আলীকে শিরনি চড়াবে কে, কালীঘাটে মানত মানবে কোন্ মূর্খ—আর বুদ্ধিমান যে করে না, সে তো জানা কথা।

পাঠশালা পাস করার পর করলুম জীবনের চরম মূর্খমো! কলকাতার 'বেম্মো'-সমাজের বাবু-বিবিরা সে-যুগে পাড়াগাঁয়ে আসতেন আমাদের পেট্রনাইজ করার জন্য। তাঁদের চোখে কত না ঢঙ-বেঢঙের রঙ-বেরঙের চশমা। আমারও শখ গেল অপ-টু-ডেট হওয়ার। ভান করতে লাগলুম আমি ব্ল্যাক বোর্ড দেখতে পাই নে। ডাক্তারকে পর্যন্ত ঘায়েল করলুম—কিংবা সে ছিল ঝটপট দু'পয়সা কামাবার তালে।

সেই বেকার চশমা ব্যবহার করে গেল আমার শ্যেনদৃষ্টি। ফল ওৎরালো বিষময়। একই ইস্টিশানে—যেমন আগ্রা সিটি, আগ্রা ফোর্ট, আগ্রা জংশন—গাড়ি দাঁড়াতে লাগল তিন তিন বার করে। শ্যেন দৃষ্টি গেছে, টুকলি করতে পারিনি—একই ক্লাসে কাটাই তিন-তিনটি বছর করে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমি দিব্য অকালপক্ক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' লাভ করেছি—তারই একটি উদাহরণ দি। ফেল মেরে দু'কান কাটার মতো শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক গুরুজন, মরালিটি প্রচারে নিরেট পাদরী সাহেব, আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ফেল মেরেছিস? লজ্জাশরম নেই? তোর দাদারা, তোদের বংশ—'

একগাল হেসে বললুম, 'কি যে বলেন, স্যার! এ্যাসন ফাস্ট ক্লাস অ্যানসার লিখেছিলুম যে এগজামিনার মুগ্ধ হয়ে খাতায় লিখলে "এনকোর এনকোর!" তাইতেই তো ফের পরীক্ষা দিচ্ছি!'

সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠা। কিন্তু আমার পক্ক-নিতম্ব 'জ্যাঠামো' শুনে তিনি থ মেরে গেলেন—আমাদের স্টেট বাস যেরকম আকছারই যত্রতত্র থ মারে—বুঝে গেলেন এ-পেল্লাদকে ঘায়েল করার মতো পাষাণে, সমুদ্রে নিক্ষেপ পদ্ধতি তাঁর শস্ত্রাগারে নেই। গত যুদ্ধের ফ্লেম থ্রোয়ারের মতো একবার আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এ ছেলে বাঁচলে হয়!'

গুরুজনের আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হয়! দিব্যপুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ উপলব্ধি করলুম বয়স ষোল। ওদিকে

ক্লাস ফাইভের যোগাসন আর পরিবর্তিত হচ্ছে না। দুনিয়ার যত ডানপিটেমি নষ্টামির মামদো উপযুক্ত পীঠস্থান পেয়ে আমার স্কন্ধে কায়েমী আসন গেড়েছে। আমার তথাকথিত অপকর্মের বয়ান আমি দফে-দফে দেব না! তবে এইটুকু বলতে পারি, পরীক্ষার হলে বেঞ্চি-ডেসকো ভাঙা, ট্রামবাস পোড়ানোর কথা শুনলে আমার ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য হাসতে ইচ্ছে যায়। আরেকটি কথা বলতে পারি, আজ যে শ্রীহট্ট বার-এর আসামী পক্ষের উকিলরূপে সর্ববিখ্যাত মৌলভী সইফুল আলম খান—তিনি বাল্য বয়সেই কোথায় পেলেন তাঁর প্রথম তালিম? আমার 'অপকর্ম' পদ্ধতি (মডুস অপারেনডি) অপকর্ম গোপন করার কায়দা যে নব-নব রূপে দেখা দিত সেগুলো কি তিনি আমার সহপাঠী 'কনফিডেন্ট' রূপে আগাপাস্তলা নিরীক্ষণ করে তারই ফলস্বরূপ আজ উকিল সভায় স্বর্ণাসনে বসেননি!

তবু যদি পেত্যয় না যান তবে তৎকালীন আসামের আই. জি. অসরপ্রাপ্ত শ্রীযুত—দত্তকে শুধোবেন। স্পুটনিক আর কতখানি উঁচুতে গিয়েছিল? তাঁর দফতরে মৎ-বাবৎ যে ফাইল উঁচু হয়েছিল তার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারে? এবং সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি প্রত্যেকটি ফাইলের উপর মোটা লাল উড-পেন্সিলে লেখা 'প্রমাণাভাব প্রমাণাভাব।' বেনিফিট অব্ ডাউট নামক প্রতিষ্ঠানটি যে মহাজন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে বার বার নমস্কার।

কিন্তু দুস্তর সন্তাপের বিষয়, ইহসংসারের হেডমাস্টারকুল এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করেন না। সে সৎসাহস তাঁদের নেই। থাকলে আমার সোনার মাতৃভূমি শিক্ষাদীক্ষায় আজ এতখানি পশ্চাৎপদ কেন? আমার নাম দু-দু'বার 'ব্ল্যাক বুক'-এ উঠলো পর্যাপ্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও। হেডমাস্টার নাকি মরালি সারটন হয়ে—যে-কোনো চার-আনী বটতলার মোকতারও বলবে, এটা ঘোর 'ইলিগালি অনসারটন'—আমার নাম কালো কেতাবে তুলেছেন। আরেকটা ঘটনা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটা যে কি রকম সংবিধান-বিরোধী 'উল্‌টরা ভিরেস' (গাড়ল ইংরেজের উচ্চারণে 'আল্‌টরা ভাইয়ারীজ')—বেআইনী স্বেচ্ছাচারিতা, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না: হেডমাস্টার তো সেখানে সাক্ষী, তিনি সেখানে বিচারক হন কোন্ আইনে? এ স্বতঃসিদ্ধটা তো স্কুল-বয়ও জানে। জানেন না শুধু হেডমাস্টার? তাই বিবেচনা করি, যে স্কুল-বয় এ তত্ত্বটা জানে না সে-ই আখেরে হেডমাস্টার হয়।

তৃতীয়বার কোনো অপকর্ম করলে 'কালো কেতাবে' নাম ওঠে না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে স্বর্মা নদীর কালো (চোখের স্বর্মা-কালো) জলে ভাসিয়ে দেওয়া

হয়। সোজা বাংলায় তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি সেটা শব্দার্থে নেওয়া হয়। রাস্টিকেট শব্দের প্রকৃত অর্থ, গ্রামের ছেলে শহরের স্কুলে এসে গ্রাম্য অভদ্র আচরণ করেছিল বলে তাকে ফের গ্রামে পাঠানো হল, তাকে 'রাস্টিকিট' করে দেওয়া হল, তাকে কাণ্ট্রিফাই করে দেওয়া হল। আমি চাঁদপানা মুখ করে সুর্মার ওপারে গ্রামে বাস করে ইস্কুলে আসতে রাজী আছি। বিস্তর ছেলে ওপার থেকে খেয়া পেরিয়ে সরকারী ইস্কুলে পড়তে আসে। আমাদের পাদ্রী সাহেবের কাছে শোনা, লাতিন 'রুস্তিকারে' ('গ্রামে বাস করা' ; শব্দ থেকে 'রাস্টিকেট' কথাটা এসেছে। কিন্তু এসব গুণগর্ভ সুভাষিত শুনে হেডমাস্টার যে আসন ছেড়ে আমি-সত্যকামকে গৌতম ঋষির মতো আলিঙ্গন করবেন এমত আশা তিন লিটার ভাঙ পেটে নামিয়েও করা যায় না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এস্থলে ধার্মিকও শুনতে চায় না ধর্মের কাহিনী—নইলে পৃথিবীতে এত গণ্ডায় গণ্ডায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম কেন? ভটচায যান মসজিদে ধর্মকাহিনী শুনতে এবং বিপরীতটা? হুঁঃ!

সে সব দিনে—না, রাতের আকাশে উত্তমকুমারাদি তারকা আকাশে দীপ্যমান হন নি। আমার পরবর্তী যুগের সখা দেবকী পাহাড়ীও তখন অসংখ্য বিমল উজল রতনরাজির মতো খনির তিমির গর্ভে। নইলে গাগারিন্ বেগে চলে যেতুম মোহময়ী মুম্বই বা টলিউডে—হেসেখেলে পেয়ে যেতুম যম বা শয়তানের মেন্ রোল।

ভাঙের কথা এইমাত্র বলেছি: তখন স্থির করলুম স্কুলের দরওয়ানজী হনুমান পূজন তেওয়ারী—যিনি কিনা পালপরবে ঐ বস্তু সেবন করেন এবং সেই সুবাদে আমাকে তথা ফ্রেণ্ড স্বদেশ চক্রবর্তীকে ঐ বিদ্যায় হাতেখড়ি দেন—তেনাকে ভাঙ খাইয়ে বেহুঁস করে হেডমাস্টারের ঘরে লাগাবো আগুন। গায়ে আগুন লেগে গেঞ্জিটা পুড়ে গেল আর পাঞ্জাবিটা পুড়লো না—এ কখনো হয়! ব্ল্যাক বুক তার মিথ্যা সাক্ষ্য সহ পুড়ে ছাই হবে। সেই ছাই দিয়ে পরবো বিজয়-টিকা! ওয়াহ্, ওয়াহ্!

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—'

কিচ্ছুটি করতে হল না। অতি ভৈরব হরষে ঐ সময়ে এলো অসহযোগ আন্দোলন।

আমারে আর পায় কেডা?

ঘটনাটা সাঁচ্চা না গুল, হলফ করে বলতে পারবো না, কিন্তু তাতে কণামাত্র যায় আসে না। রসের বিচারে সত্য না অসত্য, ভাল না মন্দ, প্রাকৃত না অপ্রাকৃত, এসব মাপকাঠি, কষ্টিপাথর সম্পূর্ণ অবান্তর। ডানাওলা অশ্ব অর্থাৎ পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনো হয়?…রাক্ষসীই হয় না, তার উপর তার প্রাণ নাকি কোন্ এক সাত সাগরের অতল তলে কৌটোর ভিতর রয়েছে—ভোমরা রূপে। সেই ভোমরাকে চেপটে থেঁতলে না মারা পর্যন্ত ঐ রাক্ষসীর উপর যতই খঞ্জর-খাণ্ডার, বন্দুক-কামান চালাও না কেন সে মরবে না। এইসব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে যখন ঠাকুমা রূপকথা বলেন তখন কি সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্পন রোমাঞ্চন হয় না? মধ্যরজনী অবধি ঠাকুমাকে জাবড়ে ধরে বিনিদ্রাবস্থায় কাটে না?

হালে জনৈক পাঠক আমায় জানিয়েছেন, আমার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের শহ্‌র্-ইয়ার নামক রমণী বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে কখনই থাকতে পারে না। এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য অবাস্তব হলেই যে রসের পর্যায়ে পৌছয় না, এ হুকুম দিয়েছেন কোন্ রসরাজ? তাহলে পূর্বোক্ত পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া, রাক্ষসীর কৌটোতে রাখা ভোমরা প্রাণ এসব কোনো প্রকারেরই রসসৃষ্টি করতে পারে না। ঐ অকরুণ পাঠক যদি বলতেন, "শহ্‌র্-ইয়ার বাস্তব হোক, অবাস্তব হোক, এটা রসের পর্যায়ে পৌছয় নি," তাহলে আমি চাঁদপানা মুখ করে সেটা সয়ে নিতুম। কারণ এটা রুচির কথা, রসবোধের কথা। আমার আরও পাঁচজন পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, "না; শহ্‌র্-ইয়ার রসসৃষ্টি করেছে।" অতএব এ লড়াই করবেন আমার পাঠকমণ্ডলী। আমি শুক্তি বা ঝিনুক। আমার পেটে জন্মেছে শহ্‌র্-ইয়ার মুক্তো। জহুরীরা এর মূল্য বিচার করবেন। ঐ অকরুণ পাঠকের মতো কেউ বলবেন, "এটার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।" আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, "না হে না, অত হেনস্তা করো না। মুক্তোটা তো নিতান্ত হাবিজাবি বলে মনে হচ্ছে না।"

এই মতভেদের মাঝখানে দুই পক্ষের কেউই তখন বলবেন না, "ঐ ঝিনুকটাকে ডাকো না কেন? সেই-ই তো এটার জন্ম দিয়েছে। সে-ই বলুক, এটার দাম কত?"

বিচক্ষণ পাঠক, চিন্তা করো, সেই ঝিনুক, যে ইতিমধ্যে মরে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে, তাকে কোন্ মূর্খ নিয়ে আসবে নিউ মার্কেটের জউরী বাজারে, কিংবা আমস্টারডামের মণিমুক্তোর মক্কা মদীনায় ? সে এসে ফাইনাল ফৈসালা করবে, মুক্তোটির মূল্য কি হবে! তাজ্জব কী বাৎ!!

সহজতর উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, নেপোলিয়নকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সে-জননীই কি নেপোলিয়নের সর্বোত্তম জীবনী লেখবার হক ধারণ করেন ?

কিন্তু এসব কচকচানি থাক্। যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলুম সেইটে নিবেদন করি।

ইয়োরোপের কোনো এক বিখ্যাত নগরে মোকদ্দমা উঠেছে এক চিত্রকরের বিরুদ্ধে। তিনি একটা এক্‌জিবিশনে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্না এক যুবতীর চিত্র। পুলিস মোকদ্দমা করেছে, নগ্না রমণীর চিত্র অশ্লীল, ভাল্‌গার্, অব্‌সীন, পর্নগ্রাফিক। এ ধরনের ছবি সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করা বে-আইনী, ক্রিমিনাল অফেন্স।

আদালতের এজলাসে বসেছেন গণ্যমান্য বৃদ্ধ জজসাহেব, এবং জুরি হিসেবে ছ'জন সম্মানিত নাগরিক।

এক কোণে সেই নগ্না নারীর লাইফ সাইজ তৈলচিত্র। তাবৎ আদালত সেটি দেখতে পাচ্ছে। দুই পক্ষের উকিলদের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ জজ-সাহেব চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলছেন, এ ছবিটা অশ্লীল নয়। আচ্ছা, তাহলে অশ্লীল ছবি কাকে বলে সেটা কি এই আদালত তথা জুরি মহোদয়গণকে বুঝিয়ে বলতে পারেন ?"

চিত্রকর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই পারি, হুজুর। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে মিনিট দশেক সময় দিলে বাধিত হব।"

জজ-সাহেব বললেন, "তথাস্তু!"

চিত্রকর তাঁর উকিলের কানে কানে ফিসফিস করে কি বললেন সেটা বাদ-বাকী আদালত শুনতে পেল না।

সাত আট মিনিট যেতে না যেতেই উকিলের এক ছোকরা কর্মচারী চিত্রকরের হাতে ছবি আঁকার একটা রঙের বাক্স তুলে দিল। চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নগ্না রমণীর ছবির সামনে গিয়ে রঙতুলি দিয়ে এঁকে দিলেন নগ্নার একটি পায়ে সিল্কের একটি মোজা।

জজের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হুজুর, এ ছবিটা এখন হয়ে গেল অশ্লীল!"

তাবৎ আদালত থ। জজ বললেন, "সেটা কি প্রকারে হল? আপনি তো বরঞ্চ মোজাটি পরিয়ে দিয়ে নগ্নার দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত করলেন?"

চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই কথঞ্চিৎ আবৃত করাতেই দেওয়া হল অশ্লীলতার ইঙ্গিত। এতক্ষণ মেয়েটি ছিল তার স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, নেচারেল নগ্নতা নিয়ে—যে নগ্নতা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নরনারী পশুপক্ষীকে ইহ-সংসারে প্রেরণ করেন। এবারে একটি মোজা পরে মেয়েটা আবরণ দিয়ে অশ্লীল সাজেশন্ দিল তার আবরণহীনতার প্রতি। এখন যদি কেউ এ ছবিটা দেখে মনে করে, কোনো গণিকা তার গ্রাহকের লম্পট কর্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করার জন্য একটিমাত্র মোজা পরেছে তবে আমি দর্শককে কণামাত্র দোষ দেব না।"

চিত্রকরের বিবৃতিতে সম্মানিত জজ তথা জুরি-মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, সে কথা আমার মনে নেই, তবে আমার উনিশ বৎসর বয়সে—যে-সময় কিশোর মাত্রেরই হৃদয়ানুভূতি নারী-রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল, কবিগুরু যা অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন:

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল
আধো-জাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে
সে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে
লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

সে বয়সে পূর্বোক্ত চিত্রকর-কাহিনী আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার সাত বৎসর পর কিম্বৎ আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। কারো দোষ নেই, আমি স্বেচ্ছায় গেলুম, এ জীবনের প্রথম 'ক্যাবারে' দেখতে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমার সর্বপ্রথমই মনে হয়েছিল, এ কিশোরী যুবতীরা কি অনবদ্য সুন্দর স্বাস্থ্যই না ধরে! সুডৌল পরিপূর্ণ স্তনদ্বয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না-মোটা-না-সরু যুগল বাহু, নাতিক্ষীণ কটিচক্র, পুষ্টনধর উরুযুগ এবং দেহের উত্তরার্ধের কুচদ্বয়ের সঙ্গে পরিমাণ রেখে তরঙ্গিত নিতম্বদ্বয়। আমি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণী এবং অন্তত একটি মাস

রাজপুতানী দেখেছি। এদের সঙ্গে আমি প্যারিসের 'ক্যাবারিনী'দের সৌন্দর্যের তুলনা করছি নে। আমি করছি স্বাস্থ্যের। সেখানে প্যারিসিনীরা বিজয়িনী। ...এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। প্যারিসিনীরা যখন নাচছিল তখন তাদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী নাভিকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছিল। নদীতে যে রকম অতি ক্ষুদ্র দ'য়ের চতুর্দিকে স্রোতের চাপে ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্ট হয়। ঠিক এই অদ্ভুত সৌন্দর্যটি আমি ইতিপূর্বে দেখেছিলুম একমাত্র রাজপুতানায়। সেখানকার কুমারীরা মাথার উপর দুটো তিনটে জলে-ভর্তি ঘড়া-কলসী চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা তো তখন হাঁটে না। যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। তাই ওদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে প্যারিসিয়ান নর্তকীদের মতো সৃষ্ট হয় সেই দ', সেই আবর্ত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

নমস্য চিত্রকর নন্দলাল, এই সচল ডাইনামিক চক্রাবর্তন তুলে নিয়েছেন এক অচল স্টাটিক ছবিতে। সেখানে সেই রাজপুতানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে খানিকক্ষণ তাকালেই চোখে ধাঁধা লাগে; মনে হয় নাভির চতুর্দিকে যেন চর্কিবাজী ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।...এই হল সার্থক শিল্পীর কলাদক্ষতা। সচলকে অচলতা দিয়ে, অচলকে সচলতা দিয়ে মূর্তমান করতে পারেন।

কিন্তু এ-বর্ণনা আর বাড়াবো না। আমার বক্তব্য বোঝাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিবেদন করি।

ক্যাবারিনীদের পরনে ছিল উত্তমার্ধে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় স্বচ্ছ, শরীরের মাংসের সঙ্গে রঙ-মিলিয়ে চীনাংশুকের গোলাপী ব্রাসিয়ের। অধমার্ধে ছিল কটিসূত্র —সোজা বাংলায় যাকে বলে ঘুনসি। সেই ঘুনসি থেকে নেবে গিয়েছে চার আঙুল চওড়া, ঠিক আমাদের পালোয়ানদের নেঙট, অবশ্য সাইজে তিনগুণের একগুণ, আকারে ত্রিকোণ, এবং সেটি ঘুরে গিয়ে পিছনের কটিমধ্যে যেখানে ঘুনসির সঙ্গে গিঁঠ খেয়েছে সেখানে সে ঠিক ঘুনসিরই মতো একটি সূক্ষ্ম সূত্ররূপ ধারণ করেছে।

নৃত্যের সর্বশেষ দৃশ্যে ক্যাবারিনীরা তাঁদের ব্রাসিয়ের খুলে খুলে স্টেজের চতুর্দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়াতে আরম্ভ করলেন।

এস্থলে এসে পাঠক আমাকে লম্পট ভাবুন আর যাই ভাবুন, হক্ কথা বলতে গাফিলী করবো না। যা থাকে কুল-কপালে!

এরপর আমি ভেবেছিলুম নর্তকীরা তাদের অধমার্ধের অঙ্গবাসও খুলে ফেলবেন। তা যখন হল না, তখন আমি আমার সঙ্গীকে শুধিয়ে জানতে পারলুম,

আইনানুযায়ী স্টেজে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বে-আইনীভাবে গোপনে সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থার অভাবও প্যারিসে নেই।

এরা যখন নাভির নিচের কাপড়টুকু খুললো না তখনই আমার মনে হল—এবারে পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন—এ নৃত্য এবারে হয়ে গেল অশ্লীল। আমার মনে হল, সেই যে চিত্রকরের আঁকা একটি মাত্র মোজা অশ্লীলতম ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এখানেও হুবহু তাই, বরং বলবো অশ্লীলতর, অশ্লীলতম। এরা যদি একেবারে নগ্ন হয়ে যেত তবে এরা সেই চিত্রকরের নগ্ন রমণীর মতো (একটি মোজা পরানোর পূর্বে) হয়ে যেত সরল স্বাভাবিক নৈসর্গিক নেচারেল। এদের সেই এক চিলতে দক্ষিণার্ধবাস তখন দিতে লাগলো অশ্লীলতম ইঙ্গিত—চিত্রকরের মোজাটির ইঙ্গিত তার তুলনায় কিছু না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক নেটিভ স্টেটের জনৈক মহারাজা ভাস্কর্য-শিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি ইয়োরোপ থেকে অনেকগুলো প্রথম শ্রেণীর মূর্তির প্লাস্টার-কাস্ট নিয়ে এসে তাঁর জাদুঘরটি সত্যকার দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। কিছু কিছু মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন—পুরুষ রমণী দুই-ই। একদিন মহারানী গিয়েছেন সেই জাদুঘর দেখতে। তিনি তো শকড্। হুকুম দিলেন নগ্ন মূর্তিগুলোর কোমরে গামছা বেঁধে দিতে! পাঠক ভাবুন, রোমান মূর্তির কোমরে (বাঁধিপোতার ?) গামছা! সে কী বেঢপ দেখতে! কিন্তু এহ বাহ্য।... অজ পাড়াগাঁয়ে লোক, সে-শহরে এলে চিড়িয়াখানা এবং এই জাদুঘরটিও দেখতে আসতো। এক ছুটির দিনে আমি জাদুঘরের এটা সেটা দেখছি,—এমন সময় একটি গামছা-পরা মূর্তির সম্মুখে তিনজন গামড়িয়া—চাষাই হবে—আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি গুড়িগুড়ি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নিম্নোক্ত সরেস কথোপকথন শুনতে পেলুম।

প্রথম চাষা : "মূর্তিটার কোমরে গামছা কেন ?" (আমি বুঝলুম, ঐ অঞ্চলের একাধিক মন্দিরে নগ্নমূর্তি দেখেছে বলে এ-প্রশ্নটা তুলেছে)।

দ্বিতীয় চাষা : "শুনেছি, মহারানী নাকি ন্যাংটো মূর্তি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরই হুকুমে গামছা পরানো হয়েছে।"

পূর্ণ এক মিনিটের নীরবতা। তারপর—

তৃতীয় চাষা : (ফিসফিস করে) "মহারানীর পাপ মন।"

আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করেন, ঐ জাদুঘরের ধুরন্ধর পণ্ডিত জর্মন উচ্চতম কর্তা। জাদুঘরে গাঁইয়াদের ভিড় লাগলেই তিনি তাঁর একাধিক কর্মচারীকে নিযুক্ত করতেন ওদের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছবিমূর্তি সম্বন্ধে ওদের

টীকাটিপ্পনী শুনে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।...এ-দেশ ছাড়ার সময় তিনি আমাকে বলেন, "শহুরেদের তুলনায় এ দেশের জনপদবাসীদের সরল স্পর্শকাতরতা অনেক বেশী। এরা যেমন কালীঘাটের পট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় মডার্ন ছবি দেখেও সুখ পায়। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, গগন ঠাকুরের কিউবিস্ট ছবিও এদেরকে হকচকিয়ে দিতে পারে না। তবে এগুলো সম্বন্ধে মতামত দেবার পূর্বে—এবং আকছারই লোহার উপর হাতুড়িটি মারে মোক্ষম—অনেকখানি চিন্তা করে তবে বলে। আরো একটা মোস্ট ইনট্রিসটিং এবং ক্যারাকটেরিস্টিক ফ্যাক্ট—এরা থ্রী-ডাইমেনশনাল, রিয়ালিস্টিক, রঙীন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি বাবদে উদাসীন (যেগুলো শহুরেরা পছন্দ করেন)। এই হল আমার কর্মচারীদের রিপোর্ট।" অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কারণ, হা হতোস্মি, এই কর্মচারীরা অন্যান্য শহুরেদের মতো পছন্দ করে রঙিন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি।

আমি শুধালুম, "নিউড?"

হার ডিরেক্টর তাজ্জব মেনে বললেন, "নিউড? এসব গ্রাম্য লোক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে। উত্তম বলদের সঙ্গে জাত গাভীর সম্বন্ধ করায়। পথেঘাটে কুকুর-বেড়ালের সম্পর্ক দেখে ছেলেবেলা থেকেই। এদের ভিতরে তো কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এরা তো শহুরেদের মতো সেক্স্‌স্টার্ভড্‌ বা পার্ভার্স নয়। এরা ন্যুড দেখে সরলচিত্তে, রস পায় অনাবিল হৃদয়ে।

কি বলতে গিয়ে কি বলে বলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে এলুম! কিন্তু বিচক্ষণ গ্রাম্য পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন আমার এসব আশকথা-পাশকথা আমার মূল বক্তব্যের জন্য সখ্‌ৎ বুনিয়াদ নির্মাণ করছে।

তা হলে ফিরে যাই ফের সেই ক্যাবারেতে; বরঞ্চ বলি, ততক্ষণে আমি সখাসহ নৃত্যশালা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমি প্যুরিটান নই, নটবরও নই। তাই এ-সব অশ্লীল ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে না। ঐ জর্মন পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে আমি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্বাভাবিক জনপদপ্রাণী। তদুপরি আমি বুদ্ধু। আমি চট্‌ করে উত্তেজিত হই নে, ঝপ্‌ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়েও যাই নে।

রাস্তায় নামার পর সখা বললে, "তা হলে চলো, পুরোপাক্কা উলঙ্গ নৃত্যে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! সে-জায়গার টিকিটের মূল্য তো বিলেতের পঞ্চম জর্জের মুকুটের কুহ্‌-ই-নূরের চেয়ে খুব কিছু একটা কম হবে না। আমার পকেটে সে-রেস্ত নেই।"

সখা জানতেন আমি বুদ্ধু। তাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "একদম নগ্ননৃত্যের আসরে টিকিটের দাম ঢের ঢের কম। ওগুলো বিলকুল পপুলার নয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, যেটি এ-লেখনে আমার একমাত্র বক্তব্য।

সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক নেচারেল জিনিস। সেটা দেখতে যাবে কে? প্যারিসে বেড়াতে আসে সাধারণতঃ বিদেশীরা। তাদের অনেকেই মরবিড, নপুংসক পার্ভার্স্। তারা, এবং অল্পাধিক ফরাসীরা যায় ঐ সব অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যে। তারা তো নেচারেল নগ্ননৃত্য দেখতে চায় না। এইটেই আমার মূল বক্তব্য।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খোস্‌লা অতিষ্ঠ হয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সে-বিবৃতিতে তিনি একটা অশ্লীল ফিল্মের সাতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক নায়ক যুবতী নায়িকা একটা টিলার সানুদেশে একে অন্যের অতিশয় পাশাপাশি লম্বমান হয়ে গড়-গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন এবং একে অন্যের প্রতি কুৎসিততম জঘন্যতম যৌনইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা কেন হল, তার বিশ্লেষণ শ্রীযুত খোস্‌লা করেন নি। বোধহয় প্রয়োজন বোধ করেননি।

পাঠকদের সহৃদয় অনুমতি নিয়ে আমি তার বিশ্লেষণ করি।

যেহেতু এ-দেশের ফিল্মে চুম্বন, আলিঙ্গন, নগ্নতা দেখানো বে-আইনী তাই ফিল্ম-নির্মাতা রগরগে ছবি বানিয়েছেন যৌন-সম্পর্কের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে—

হুবহু যে-রকম নগ্নাকে মোজা পরিয়ে, ক্যাবারে নৃত্যের শেষ কটিবস্ত্র উন্মোচন না করে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বন নগ্নতার বাধা-নিষেধ যদি আজ তুলে দেওয়া হয় আর্টের খাতিরে (অবশ্যই সেটা কঠিন প্রশ্ন, ফিল্মে আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি, এ নিয়ে সুযোগ পেলে পরবর্তীকালে আলোচনা করবো), তবে কি আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা সঙ্গে সঙ্গে উদোম নৃত্য আরম্ভ করে তাঁদের ফিল্ম চুম্বনে নগ্নতায় ভরপুর, টৈটম্বর করে দেবেন?

হয়তো গোড়ার দিকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা শীগগিরই বুঝে যাবেন যে সাধারণ দর্শক তিন মিনিটব্যাপী চুম্বন, পাঁচ মিনিটব্যাপী নগ্নতা প্রদর্শন দেখবার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল নয়। ঠিক যে-রকম পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্যারিসের পরিপূর্ণ নগ্ননৃত্য দেখবার জন্য মানুষ হৈ-হুল্লোড় লাগায় না।

আইন দরকার, ব্যান্-এরও আয়োজন আছে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনো কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পরও সে-সব দেশের খুনের সংখ্যা বেড়ে যায়নি।

হালে ডেনমার্কে সর্বপ্রকার অশ্লীল 'সাহিত্যে'র উপরকার ব্যান্ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় না অশ্লীল সাহিত্যের বিক্রি হুশ হুশ করে বেড়ে যাবে, রাম—ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছেন। অশ্লীল মালের পাবলিশাররা মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতে বসে গেছেন। তাঁদের বিক্রি শতকরা ৭০ ভাগ কমে গেছে। কারণ মানুষের লোভ নিষিদ্ধ ফলের প্রতি। ইংরিজিতে প্রবাদ: A stolen kiss is sweeter than any other.

এ বাবদে শেষ আপ্তবাক্য বলেছেন একটি সুরসিকা ফরাসী মহিলা। আমেরিকায় তখন লরেন্স মহাশয়ের লেডি চ্যাটারলি পুস্তক অশ্লীল কি না, সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। লেডি চ্যাটারলি পক্ষের উকিল ("লেডি চ্যাটারলির লাভার' না, "লেডি চ্যাটারলির লয়ার") হুতাশনসদৃশ প্রজ্বলিত ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে অনুপ্রেরণিত কণ্ঠে বললেন, "লেখকরাজ লরেন্স এই পুস্তক দ্বারা যৌন সম্পর্ককে অকল্পনীয় স্বর্গীয় স্তরে (স্পিরিচুয়াল লেভেলে) তুলে ধরেছেন।"

এই বিবৃতিটি পড়ে সেই ফরাসী মহিলাটি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "সর্বনাশ! এখন তা হলে যৌন-সম্পর্কের অর্ধেক আনন্দই মাঠে মারা গেল। আতি তো এ্যাদ্দিন জানতুম, এটা পাপাচার!"

মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই
(আল্লার পদপ্রান্তে)

এ লেখাটি আমাকে লিখতে হবে, এবং আজই লিখতে হবে। অথচ অন্তর্যামী জানেন, এটি লিখতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমার অক্ষম লেখনী কতখানি পর্যুদস্ত হচ্ছে। ভাবাবেগে আমি এমনই মতিচ্ছন্ন যে অনেক কিছু একসঙ্গে বলতে চাই, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারি না।

সরল পাঠক ভাবে, সাহিত্যিকের ভাবনা কি? ভাষা তার আয়ত্তে, বেদনা হোক, আনন্দ হোক সে-সব কিছুই সহজ সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে মাত্র একটি ব্যত্যয় আছে।

উপস্থিত আমার কথা ভুলে যান। সার্থক সাহিত্যিকদের কথাই বলবো।

তাঁরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিরহ ঘটান, বিধবার একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটান এবং এগুলোর চেয়েও নিদারুণতর ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেন। তারপর অতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিরহ-কাতরা যুবতীকে, পুত্রহীনা বিধবাকে কখনো যুক্তি, কখনো অনুভূতির মারফতে সান্ত্বনা জানান।

এসব কল্পনারাজ্যের কথা।

কিন্তু যখন সার্থক সাহিত্যিকের আপন জীবনে নিদারুণ শোক আসে তখন তিনি কি করেন? তখন তাঁর অবস্থা হয় সত্যই শোচনীয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আমার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় জনৈক যশস্বী লেখক একদিন ঢুকলেন আমার ঘরে কাঁদতে কাঁদতে। আমি কোনো কিছু বলার পূর্বেই তিনি বললেন, "ভাই আমার ছোট মেয়ে মাধবী কাল বিধবা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তুমি ভাই, আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি কি লিখব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে।"

সেইদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, ব্যক্তিগত বেদনায় সাহিত্যিক কী নিদারুণ অসহায়। অপরের বেদনা সে দূর থেকে দেখে কিছুদিন ধরে সেটাকে মনের ভিতর খিতোয় এবং বেশ কিছুদিন পর সেটাকে সাহিত্য রূপে প্রকাশ করে। কিন্তু নিজের বেলায়? হায়, সে অসহায়। এবং সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জনের চেয়েও সে নিরুপায়। সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জন তখন বিধবা কন্যাকে সাদা-মাটা চিঠি লিখে সান্ত্বনা জানায়। মেয়েও সে চিঠি বুকে চেপে কাঁদে, সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু সার্থক সাহিত্যিক? সে তো অনেক বেশী স্পর্শকাতর। এ রকম সাদা-মাটা চিঠি সে তো লিখতে পারে না। তার তো সে অভ্যাস নেই।

সার্থক যশস্বী সাহিত্য-নির্মাতার যদি এই বিপাক হয়, তবে আমার মতো অতিশয় সাধারণ লেখকের কথা চিন্তা করুন।

আমি যে কি মতিচ্ছন্ন সেটি রচনারম্ভেই নিবেদন করেছি।

ভোরবেলা আমার এক চেলা ঘরে ঢুকলো, 'আনন্দবাজার' হাতে নিয়ে প্রায়ই আসে। আপন মনে খবরের কাগজ পড়ে।

আজ শুধলো, 'আপনি তো বাঙাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা অধ্যাপক আব্দুল হাইকে আপনি চিনতেন?'

আমি বললুম, চিনতুম মানে? এখনো চিনি। আমার চেয়ে বছর পনরো ছোট। তাহলে কি হয়! লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার

সাহিত্যরসে কী সুন্দর স্পর্শকাতরতা। তদুপরি, তুমি যা বললে, ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা, আমার বন্ধু—'

চেলা আমাকে আনন্দবাজার এগিয়ে-দিলে। তাতে দেখি আব্দুল হাইয়ের ছবি এবং নিচে লেখা :

"ঢাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ডক্টর হাই-এর মৃত্যু।"

ভাষা ও ধ্বনিবিদ্ বলতে শেষ পর্যন্ত বিধাতার কৃপায় বেঁচে রইলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৌলানা মহম্মদ শহীদুল্লাহ। এঁরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার কৃতী সন্তান।

দেশ বিভাগের ফলে একজন রইলেন কলকাতায়, অন্যজন ঢাকায়। যেন গঙ্গার এক ভাগ জল এল ভাগীরথী দিয়ে, অন্য হিস্যার পানি চলে গেল পদ্মা দিয়ে পাকিস্তানে। তার পর এই বাইশ বৎসর ধরে বিস্তর পানি জল[১] দু'ধারা দিয়ে বয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত চাটুয্যের উপর নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপ পড়লো। বয়সও হয়েছে। কাজেই তাঁর প্রাণের যে কামনা—ভাষাতত্ত্বের চর্চা—তার জন্য হাতে সময় থাকে অল্পই। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, শব্দতত্ত্বে জ্ঞানার্থীজনকে তিনি সদাসর্বদা পথনির্দেশ করে দেন। ভরতনাট্যেও বলে, একটা বিশেষ বয়সের পর তুমি আর নৃত্যগীত করবে না, তোমার শিষ্যশিষ্যাদের দেহ দিয়ে তোমার নৃত্যকলা দেখাবে।

ওদিকে, ওপারে ঘটলো আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। মৌলানা শহীদুল্লাহ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে বৎসর দুই পূর্বে আচম্বিতে শয্যা নিলেন[২]—বহু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। গত বৎসর যখন তাঁকে ঢাকা হাসপাতালে সেলাম দিতে যাই তখন তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে—যদ্যপি

১ জলপানি বললুম না, তার অর্থ ভিন্ন। বস্তুত আমি 'পানি' শব্দের দুশমন নই। অতি অবশ্যই আমি 'জল-পাঁড়ে' নামক কাল্পনিক সমাস ব্যবহার করবো না। পক্ষান্তরে জমজমের জল না বলে জমজমের পানি বলাই ভালো। 'গঙ্গা পানি' কানে খারাপ শোনায়। কিন্তু সেও না হয় সয়ে নিলুম। মুশকিল হবে 'জলপানি' নিয়ে। কেউ 'জলপানি' পেলে সে কি 'পানি-পানি' পায়? যদিও সে খুশীতে পানি পানি হতে পারে, তার জান ত-র্-র্-র্ হতে পারে।

২ তবে ইনি এখনো সম্পূর্ণ অচল নন। এবং তাঁর গুণগ্রাহী তথা শিষ্যজনকে

আমাদের পরিচয় গত অর্ধ শতাব্দী ধরে।

উভয় বাংলাতে আমরা সকলেই আশা করেছিলুম, আব্দুল হাই একদিন শহীদুল্লাহর আসন গ্রহণ করবেন। আমি কোন সরকারী, বেসরকারী উচ্চপদের কথা ভাবছি নে। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল একদিন তাঁর গবেষণা আরো বিস্তৃত সুপরিচিত হবে, তাঁর পথনির্দেশ গৌড়জনকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

কিম্মৎ, কিম্মৎ—সবই কিম্মৎ! একটি সামান্য উদাহরণ দি:

'হাই' শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জাগ্রত ভগবান'। আব্দুল হাই শব্দদ্বয়ের অর্থ তাই 'জাগ্রত (জীবন্ত) ভগবানের (অনুগত) দাস।'

যিনি তার নামকরণ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আশা পোষণ করেছিলেন এ-শিশু যেন অতি, অতিশয় দীর্ঘজীবী হয়।

সে চলে গেল পঞ্চাশে। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা হয়তো ভাবলেন, পঞ্চাশ তো খুব অল্প বয়স নয়। কিন্তু আমার মতো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ পরিচয়ে চেনবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছিল তাঁরাই শুধু জানেন পঞ্চাশেও এই লোকটি ছিলেন কি অসাধারণ প্রাণবন্ত ('হাই',) বিদ্যাচর্চা রসগ্রহণে সদাজাগ্রত এমন কি মূর্তমান 'চাঞ্চল্য' বললেও অত্যুক্তি হয় না—অবশ্য সদর্থে। এঁরা সকলেই এক বাক্যে বলবেন, আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর মতো অকালমৃত্যু—এ শোক বিধাতা যেন দয়া করে আমাদের অত্যধিক না দেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যখন এক নবীন ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল হাই যখন জ্ঞানান্বেষণে এক নূতন জগতের সম্মুখীন তখন তাঁর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু। আজ শুধু আব্দুল হাইয়ের গুরুই তাঁর সম্বন্ধে সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রশস্তি রচনা করতে পারবেন।

তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়, আমি, আমরা শুধু আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য আমি এ-স্থলে নিবেদন করি।

সানন্দে জানাই তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন একটি তরুণ ডাক্তার—চট্টগ্রামের চিরঞ্জীব বড়ুয়া। মানুষ বুঝি পিতাকেও অতখানি সেবা করে না।

তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই বলে হয়তো আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের এ মহান্ দিকটি অধিকাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অতি সংক্ষেপে নিবেদন করি।

এ-বঙ্গে আমার চেয়েও বেশী যদি আজ কেউ প্রিয়বিয়োগ-কাতর হয়ে থাকেন তবে তিনি—যদিও আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবু তাঁর অবস্থার কিছুটা অনুমান করতে পারি—ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ (ট্রিপল) ডি-লিট (ক্যাল), রিপন, হুগলী মহসিন, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, কিন্তু বহুকাল ধরে এদেশবাসী।

অধুনা তাঁর একখানি অভিধান—'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ'—ডক্টর আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। পূর্বতন 'পঞ্চতন্ত্র'-এ আমি এ-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার কথা থাক। এ অভিধান প্রকাশ করার সময় আব্দুল হাই একটি ক্ষুদ্র 'ভূমিকা' লেখেন। তার থেকে আমি কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি।

হাই সাহেব ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন: 'কয়েক বছর পূর্বে ডক্টর সুকুমার সেন সাহিত্য পত্রিকায় (এ পত্রিকাটি অধ্যক্ষ আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমৃত্যু সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন) প্রকাশের জন্য ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পালের "বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন" নামে একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডক্টর পালের এ প্রবন্ধটি আমি ১৯৬৮ সালের শীত সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় সানন্দে প্রকাশ করি এবং যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে অভিধান আকারে এ-কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

ডক্টর পাল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি সীমান্তপারে বসবাস করছেন।[৩] তাহলেও তিনি মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতিমূলক সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মধ্যযুগ থেকে এ-কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে এ-বিরাট সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করে ডক্টর পাল বাংলা ভাষা-ভাষী সকলকে এবং বিশেষভাবে বাঙালী মুসলমান

৩ আব্দুল হাই মুর্শিদাবাদের লোক। 'অদৃষ্টচক্রে' তাঁকেও 'সীমান্তপারে' বসবাস করতে হল। তাই সমদুঃখীজনব্যথিতবেদন অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা ও স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁর আপন দুঃখ তিনি ডক্টর পালের মারফৎ প্রকাশ করেছেন।

সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমে 'সাহিত্য পত্রিকায়' ও পরে পুস্তকাকারে তাঁর এ মূল্যবান গবেষণামূলক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাঙালী সুধী সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আজ সত্যিই আনন্দিত।

মুহম্মদ আব্দুল হাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ

আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে পেরেছিলুম, পণ্ডিত আব্দুল হাই নিজে, তো জ্ঞানচর্চা করেছেনই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী উৎসাহ দিয়েছেন অন্যজনকে—শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, এ বঙ্গেও।

আর, আজ যে সব যুবক জ্ঞানচর্চা গবেষণা করতে গিয়ে নানাবিধ অন্যায় অসত্য, মনুষ্যকৃত স্বার্থপ্রণোদিত নীচ-হীন প্রতিবন্ধকের সম্মুখে পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে তারা অন্তত এই ব্যত্যয়টি, উৎসাহদাতা আব্দুল হাইয়ের এই চরিত্রমূল্যটি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করবে। আমেন।

সিংহ-মূষিক কাহিনী

চল্লিশ বৎসর বয়সের ঘাটের থেকে যৌবনতরী বিদায় দেওয়ার পরও কখনো আশা করতে পারিনি, স্বপ্নেও সে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে পারিনি যে এ-অধমের জীবদ্দশাতেই স্বরাজ আসবে, স্বাধীন জীবন কাকে বলে তা এই চর্মচোখেই দেখে যেতে পারবো।

কিন্তু প্রভু যখন দেন, তিনি তখন চাল-ছাত চৌচির করে ঐশ্বর্য-বৈভব (নিয়ামৎ গণীমৎ) ঢেলে দেন। হঠাৎ একদিন হুড়মুড়িয়ে স্বরাজ এসে উপস্থিত—বন্যার প্লাবনের মতো। ফলে আমরা সবাই যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ভেসে গেলুম এবং এখনো এমনই যাচ্ছি যে তার দিক্‌চক্রবালও দেখতে পাচ্ছি নে। আমি ইচ্ছে করেই এই অতিশয় প্রাচীন, সাদামাটা তুলনাটি পেশ করলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনা তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে দাঁড়ায়, কিন্তু এ-স্থলে তুল্য ও তুলনীয় এমনই টায়-টায় মিলে গেছে—স্বরাজ এবং বন্যা, যে এটি সত্যি চার ঠ্যাঙের উপর দাঁড়িয়েছে। তুলনাটি যে কী রকম মোক্ষম ড্রেন পাইপ পাতলুনের

মতো টাইটফিট তার আরেকটি নিদর্শন দি। এই প্রলয়জলধিতে যে সব কর্তা-ব্যক্তিরা নৌকো ভেলা পেয়ে গেলেন তাঁরা বানে ভেসে-যাওয়া বেওয়ারিশ মাল (সেশের সম্পদ, "কোম্পানি কা মাল", যদি বেওয়ারিশ না হয় তবে বেওয়ারিশ আর কারে কয়!) আঁকশি দিয়ে ধরে ধরে আপন আপন ভল্টে বোঝাই করলেন। এখানে আরো একটা মিল রয়েছে—অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, গুটি কয়েক অ্যাঙ্‌রি ইয়ং টার্ক এর "অবিমৃষ্যকারিতা"র ফলে ব্যাঙ্ক-ভল্ট বাবদে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া হল যে সেগুলো সেই বানের জলে উৎক্ষিপ্ত-প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। কোন্ কূলে ভিড়বে—আমরা তো অনুমান করতে পারছি নে। তবে মাভৈঃ! এসব ঘড়েল কুমীরগুষ্টি যখন জলের অতল থেকে নির্বিচারে অবলা কুমারী থেকে গোবর-গামার ঠ্যাং কামড়ে ধনে বহ্বান্ন ভক্ষণ করতে পারেন, তখন এই সব বেওয়ারিশ প্রাণহীন ভল্ট কামড়ে ধরে সেগুলোকে নদীর অর্ধনিমজ্জিত গহ্বরে নিয়ে যাওয়া তো এঁদের কাছে শনির অপরাহ্নের পিকনিকের মতো নির্দোষ সহজ সরল, কিংবা বলতে পারেন অত্যাবশ্যকীয় 'রাজকার্যে'র অনুরোধে হাওয়াই দ্বীপে বসন্ত যাপন অথবা শীতে মস্তে কার্লো ভ্রমণ।

সন্দেহপিচেশ পাঠক হয়তো ভাবছো, আমি নিজে সেই হালুয়ার কোনো হিস্যে পাইনি বলে বন্ধ্যা রমণীর ন্যায় শতপুত্রবতীদের অভিসম্পাত দিচ্ছি। মোটেই না। আমার কপালেও ছিটেফোঁটা জুটেছে! ইরানের প্রখ্যাত কবি মৌলানা শেখ সাদী বলেছেন, 'ইহ-সংসারে মহাজন ব্যক্তি মাত্রই (সাদী গুণীজ্ঞানী অর্থে বলেছেন এস্থলে কিন্তু আপনাকে যখ সম্প্রদায়ের বেনেদের কথা ভাবতে হবে) যেন আতরের ব্যবসা করেন। তোমাকে মিন-পয়সায় আতর না দিলেও তাবৎ আতরের বাক্স ডবল তালা মেরে বন্ধ রাখলেও বাড়িময় যে আতরের খুশবাই ম-ম করছে এবং তোমার নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে, সেটা ঠেকাবেন কি প্রকারে?' এস্থলেও তাই। এ মহাজনরা যদ্যপি বাইশ বৎসর ধনদৌলত ভরা গোটা আষ্টেক লোহার সিন্দুকের উপর ডবল ডানলোপিলোতে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছেন তথাপি এগুলো বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে এঁদের খুলতে হয় তখন পাকা বেল ফেটে গিয়ে যে কাককুল প্রবাদানুযায়ী এ রস থেকে বঞ্চিত তারাও তার হিস্যে পেয়ে যায়।

এই ধরুন কিছুদিন আগেকার কথা। এক টাকার-কুমীরের উচ্চাশা হয়েছে তিনি সমাজেও যেন গণ্যমান্যব্যক্তিরূপে উচ্চাসন লাভ করেন। হঠাৎ একদিন আমার কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক বিরাট মোটরগাড়ি। তার

দৈর্ঘ্য এমনই যে সেটার ন্যাজামুড়ো করতে হলে হঠাৎ পিছনের লাগেজ কেরিয়ার থেকে সম্মুখের বনেটের নাক অবধি—সেখানে পদাধিকারলব্ধ পতাকা পৎ পৎ করে, এঁর গাড়িতে অবশ্য পতাকা ছিল না—যেতে হলে আরেকটা মোটরগাড়ি ভাড়া করতে হয়! তা সে যাই হোক, যাই থাক, যেই যক্ষ (অবশ্য ইনি কালিদাসের একদারনিষ্ঠ বিরহী যক্ষ নন—এঁর নাকি ভূমিতে আনন্দ; থাক "শঙ্করে"র চৌরঙ্গী পশ্য) এসে এই অধমকে আলিঙ্গন করে একখানা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

নিম্নলিখিত রসালাপ হল:

যক্ষ॥ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াতে বড়ই আনন্দিত হলুম। আমি বহুকাল ধরে আপনার একনিষ্ঠ পাঠক। আপনার "অগ্নিবীণা" আপনার "বিদ্রোহী" উপন্যাস আমি পড়েছি, কতবার পড়েছি বলে শেষ করতে পারবো না। ওঃ! কী করুণ, কী মধুর!

হরি হে, তুমিই সত্য।

আমি॥ (মনে মনে) সর্বনাশ! ইনি আমাকে কবিবর নজরুল ইসলামের সঙ্গে গোবলেট করে ফেলেছেন! যে ভুল পাঠশালার ছোকরাও যদি করে তবে সে খাবে ইস্কুলের বাদবাকি পড়ুয়াদের কাছে বেধড়ক প্যাঁদানি। তদুপরি যক্ষবর বলছেন, "বিদ্রোহী" কবিতাটি নাকি উপন্যাস এবং সেটি নাকি বড়ই করুণ আর মধুর! এস্থলে আমি করি কী! যে ব্যক্তি গাধাকে (এস্থলে আমি) দেখে বলে এটা রেসের ঘোড়া (এস্থলে কাজী কবি—কবি-পরিবার যেন অপরাধ না নেন, আমি নিছক রূপকার্থে নিবেদন করছি) সে ব্যক্তি গাধাকে তো চেনেই না, ঘোড়াকেও চেনে না। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ॥ (স্মিতহাস্য করে) আপনার বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা শিরাজ—ঐ যিনি তালতলার খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক—তিনিও আমার ছোট ভাইয়ের কাছে প্রায়ই আসেন। বড় অমায়িক বৃদ্ধ। শুনেছি আমাদের বাড়ির পাশেই তাঁর বিরাট তেতলা বাড়ি।

হরি হে, তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!

আমি॥ (মনে মনে) এই আমার জীবনে সর্বপ্রথম আমার পিরামিড-দৃঢ় হরিভক্তিতে চিড় ধরলো। হরি যদি সত্যই হবেন তবে তাঁকে সাক্ষী রেখে এই লোকটা মিথ্যার জাহাজ বোঝাই করে যাচ্ছে আর তিনি টুঁ ফুঁ করছেন না, এটা কি প্রকারে হয়? ওদিকে শিরাজ মিঞা খাঁটি বিদগ্ধ রাঢ়ের ঘটি, আর আমি সিলট্যা খাজা বাঙাল। ওঁর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই—থাকলে

নিশ্চয়ই শ্লাঘা অনুভব করতুম। অবশ্য আমরা সবাই আদমের সন্তান; সে হিসেবে তিনি আমার আত্মীয়। তদুপরি বেচারী পুস্তক প্রকাশক নয়, ঢাউস বাড়িও তাঁর নেই, যদ্দূর জানি আমারই মতো দিন-আনি-দিন-খাই চাকরিতে পুরো-পাক্কা-পার্মানেন্ট। এবং বাচ্চা শিরাজ—যে আমার পুত্রের বয়সী—সে নাকি আমার অগ্রজ এবং বৃদ্ধ! বৃদ্ধ! বুঝুন ঠ্যালা। আশা করি এ লেখন বাবাজীর গোচর হলে তিনিও সব্যসাচীর ন্যায় আমাকে মাফ করে দেবেন। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ ॥ (তাঁর দেওয়া "বিবিধ-ভারতী"র মতো বিবিধ সংবাদ যে আমাকে একদম হতবাক করে দিয়েছে সেইটে উপলব্ধি করে, পরম পরিতোষ সহকারে) আচ্ছা, আপনি কি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছিলেন?

আমি ॥ (মনে মনে, যাক্ মিথ্যের জাহাজ সত্যের চড়াতে এসে কিছুটা ঠেকেছে) আজ্ঞে হাঁ। তবে বিশেষ ফলোদয় হয়নি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।

—আহা কি যে বলেন! আচ্ছা, আপনার হাতের লেখা নাকি রবিঠাকুরের মতো?

—অনুকরণ করেছিলুম। সে সুন্দর লেখার কাছে আমার লেখা কি কস্মিন-কালেও পৌঁছতে পারে?

—আচ্ছা, কিন্তু আপনি নাকি হুবহু তাঁর নাম সই করতে পারেন? একবার নাকি তাঁর নাম সই করে ভুয়ো নোটিশ মারফৎ আশ্রমকে একদিনের ছুটি দেন! পরে নাকি আপনি নিজেই সেটা ফাঁস করে দেন?

আমি "কীর্তিটি" অস্বীকার করলুম না। কিন্তু যক্ষরাজ কোন্ দিকে নল চালাচ্ছেন সেঁটে বসে, তখনও বুঝিনি! জানলা দরজার দিকে ঘুরে এবারে চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশে আমার গা সেঁটে বসে, জানলা দরজার দিকে ঘোর সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন, বাবু, তোমার হাল তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার দু'-পয়সা হবে: আমারও ফায়দা হবে। কিন্তু কাককোকিল পোকাপরিন্দায়ও যেন জানতে না পায়।

আমার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের একখানা সার্টিফিকেট। আমি যে তাঁর জীবিতাবস্থায় গোপনে গোপনে দেশসেবা, পলিটিক্যাল কাজ এবং বিশ্বভারতীকে সাহায্য করছিলুম সেই মর্মে একখানা চিঠি। শেষ বয়েসে তাঁর প্রায় সব চিঠিই ইংরিজিতে টাইপ হত, তিনি শুধুমাত্র সই করে দিতেন।

আপনাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমি সেই জরাজীর্ণ টাইপরাইটার মেলা জাহের সঙ্গে নিলামে কিনেছি, অবশ্যই দালাল মারফৎ। আমার কপাল

ভালো। ঐ সব হাবিজাবির ভিতর তাঁর প্রাচীন দিনের একগুচ্ছা লেটারহেড সমেত হলদে ফ্যাকাশে নোটপেপারও পেয়ে গিয়েছি। টাইপরাইটারটা সযত্নে মেরামত করেছি। এখন এটা ঠিক ১৯৩৮।৩৯।৪১-এর মতোই ছাপা ফোটায়। আমি পাকা লোককে দিয়ে সার্টিফিকেটের মুশাবিদা করাবো, টাইপ করাবো। তারপর কবির দস্তখৎটি হয়ে গেলে দলিলটি রেখে দেব আঁকাড়া চালের বস্তার ভিতর। ব্যস! আর দেখতে হবে না। টাইপের কালি, দস্তখতের কালি সব ম্যাটমেটে মেরে গিয়ে ১৯৪১ সনের চেহারা নিয়ে বেরুবে সেই খানদানী চেহারা নিয়ে।

এই চূড়ান্তে পৌঁছে যক্ষ হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন।

সাংসারিক বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, এহেন অপবাদ যে-সব পাওনাদারদের আমি নিত্যি নিত্যি ফাঁকি দিয়ে অদ্যাবধি বেঁচেবর্তে আছি তাঁরাও বলবেন না। তৎসত্ত্বে এ-নাটকের শেষাঙ্কে আমি যেন অকস্মাৎ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি প্রসাদাৎ কৃষ্ণাবতারের বিশ্বরূপ দেখতে পেলুম।

"সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট!" অর্থাৎ পূর্বোক্ত দলিলে আমাকে জাল করতে হবে কবির সিগনেচর, স্বাক্ষর, দস্তখৎ। দস্ত্ কথা শব্দটির অর্থ হাত (যার থেকে দস্তানা এসেছে); আমাকে দস্তখৎ করতে হবে না, করতে হবে দস্তক্ষত—অর্থাৎ জাল করে হাতে ক্ষত আনতে হবে।

আমার মুখে কোনো কথা যোগালো না।

যক্ষ বললেন, আপনার দক্ষিণা কি পরিমাণ হবে?

আমার মাথায় তখন নলরাজদেহনির্গত কলি ঢুকেছে, অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে। দেখিই না, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

ব্রীড়াময়ী কুমারীর মতো—কিংবা ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতোও বলতে পারেন—ক্ষিতিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিবেদন করলুম, আপনি বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে না তাকিয়েই অনুভব করলুম যক্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ রোমাঞ্চন উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। এত সহজে যে নিরীহ একটা লেখক এহেন ফেরেব্বাজীতে রাজী হবে, এ-দুরাশা তিনি আদপেই করেননি। ভেবেছিলেন আমাকে বহুৎ ভলাইমলাই করতে হবে। সোল্লাসে বললেন পাঁচশ।

আমি তুলসীপাতার কোমল রূপটি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে সুতীক্ষ্ণ তালপাতার আকার ধারণ করে বললুম, আপনি কি ছাগীর দরে হাতি কিনতে চান? তার চাইতে যান না যে-কোনো আদালতের সামনে বটতলায়। পাকা জালিয়াত

পাঁচটি টাকায় ঐ কর্মটি করে দেবে!

আমার চাই পাঁচ হাজার।

আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, যক্ষ প্রফেশনাল জালিয়াতের কাছে যেতে চান না। সেটা মোস্ট ডেনজরস্।

ইতিমধ্যে এই প্রথম তাঁর পরিপূর্ণ সপ্রতিভ ভাব কেটে গিয়ে তিনি হয়ে গেছেন স্তম্ভিত হতভম্ব। কিছুক্ষণ পরে রাম ইডিয়টের মতো বিড়বিড় করে বললেন, পাঁচ হাজার?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, বড়বাজারের নাপিতকে দিয়ে আপনার কান সাফ করাতে হবে না। ঠিকই শুনেছেন।

অতঃপর গৃহমধ্যে সূচীভেদ্য নৈস্তব্ধ্য।

খানিকক্ষণ পর আমিই বললুম, আপনি বাড়ি গিয়ে চিন্তা করুন, স্লীপ ওভার ইট। আমিও তাই করবো।

আমি জানতুম, এ সব ঘড়েলদের সবচেয়ে বড় গুণ এদের ধৈর্য। তাই এই ধৈর্য কাজে লাগাবার ফুরসত-মোকা পেলেই এরা সোল্লাসে রাজী হয়। ধৈর্য দ্বারা ঘষতে ঘষতে এরা অন্যপক্ষের প্রস্তরও ক্ষয় করতে পারে।

আর আমারও তো কোনো স্টক নেই। এদের ধৈর্য যদি অফুরন্ত হয়, তবে আমার ধৈর্য অনন্ত। দেখাই যাক না, শ্রাদ্ধ কদ্দূর গড়ায়!

তাই গোড়াতেই বলছিলুম আমাদের মত নগণ্যগণও এ-সব ছিটেফোঁটার সুযোগ পায়, কিন্তু হায়, যার অদৃষ্টে অর্থ নেই তার কপালে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঠাকুরানীও ফোঁটা আঁকতে এলে সে মূর্খ তখন যায় নদীতীরে, কপাল ধুতে! ফিরে এসে দেখে, লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেছেন। তাই তাঁর নাম চপলা!

রাবাৎ—ইনসল্ট

প্রখ্যাত লেখক রেমার্ক-এর উপন্যাস "পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ (অল কোআএট্)"-এর এক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে কয়েকজন নিতান্ত সাধারণ সেপাইয়ের মধ্যে। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন নিবেদন করছি। একজন সেপাই শুধোলে, "লড়াই লাগে কেন?" আরেকজন বললে, "দূর বোকা! এক দেশ আরেক দেশকে অপমান করে। তখন লাগে লড়াই।" প্রথম সেপাই তখন বললে, "কিন্তু আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। যারা করছে তারা

প্রাণভরে লড়ুক। আমাকে আমার বাড়ি, ক্ষেতখামারে ফিরে যেতে দেয় না কেন?"

রাবাৎ সম্মেলনে নাকি ভারতবর্ষ ইন্‌সল্টেড হয়েছেন। কই, আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। তদুপরি আরেকটা তত্ত্ব এ-স্থলে আমার স্মরণে আসে। আমার বাল্যবয়সে আমার এক গুরুজনের সামনে বাইরের এক ব্যক্তি আমাকে অযথা কড়া কড়া কথা শোনায়। আমি তখন চটে গিয়ে বলি, 'আমাকে অপমান করছেন কেন?' সে ব্যক্তি কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার সেই মুরুব্বী তখন বললেন, "ঐ তো করলে ব্যাকরণে—প্রোতোকলে—ভুল। তুমি স্বীকার করে নিলে তুমি অপমানিত হয়েছ। তারপর যে অপমান করেছে সে মাফ না চেয়ে চলে গেল। তুমি রয়ে গেলে অপমানিত। সুতরাং কক্‌খনো নিজের মুখে মেনে নিতে নেই, 'আমি অপমানিত হয়েছি।' নিতান্তই যদি তখন তোমাকে কিছু বলতে হয়, তবে বলবে, 'আপনি এরকম অভদ্র আচরণ করছেন কেন?' দোষটা চাপাবে তার ঘাড়ে। এবং আরো নিতান্তই যদি অপমান বোধ করে থাকো তবে সেটা জোর গলায় স্বীকার না করে, চুপসে সেটা হজম করে নেবে এবং তক্কে তক্কে থাকবে কখন ব্যাটার উপর মোক্ষম দাদ তুলতে পারবে—যদ্যপি আল্লাতালার আদেশ সব্‌র্ (সহিষ্ণুতাসহ ক্ষমা—যার থেকে বাংলার "সবুর" কথাটা এসেছে।) রাবাতের ব্যাপারটা আগাপাস্তলা "মুসলমানী" ছিল বলে মুসলমানী শাস্ত্রের নজির দিলুম।

এর উপর আরেকটা কথা আছে। অপমান করতে পারে কে, কাকে? আমি গেলুম আপনার বাড়িতে। আপনার চাকর আমাকে খামোখা কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে—বৈঠকখানায় ঢুকতেই দিলে না। এ-স্থলে সে আমাকে অপমান করেনি, করেছে রূঢ় ব্যবহার—আমাকে অপমান করার মত সামাজিক আসন তার কোথায়? আবার দেখুন, অন্য আরেকদিন আপনার ঠাকুরদা বসে ছিলেন বারান্দায়। আমাকে দেখেই খাপ্পা হয়ে আমাকে নাহক বকতে শুরু করলেন। সে-স্থলেও আমি অপমানিত নই। কারণ আমি আপনার বন্ধু। আপনার পিতামহের বিলক্ষণ হক আছে আমাকে কড়া কথা বলার।...অপমান হয় সমপর্যায়ে। যেমন মনে করুন, সন্তোষ ঘোষ। তিনি লেখক, আমিও লেখক। তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন, আমিও তাঁকে অপমান করতে পারি। আরেকটি নজির দিই। যদ্যপি আইনে বারণ তথাপি ইতালি প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে ডুয়েল লড়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

কিন্তু সেখানেও যদি আপনার ভৃত্য ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ডুয়েলে চ্যালেন্‌জ্‌ করে, সে-খবর জানিয়ে দুজন প্রতিভূ চাকরের প্রতিভূদের সঙ্গে দু-মিনিট আলোচনা করেই, একবাক্যে চারজনাই রায় দেবেন, "এ ডুয়েল হতে পারে না। দু'জনার পদমর্যাদা এক নয়। চাকরটা শুধু তার পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেন্‌জ্‌ করেছে।"

মরক্কো দেশ কোথায়, মশাই? শুনেছি সেখান থেকে মরক্কো লেদার নামক পুরু চামড়া রপ্তানি হয়। পুরু চামড়া নিশ্চয়ই। নইলে সেখানকার লোক এই সুদূর ভারতবর্ষের লোককে নিমন্ত্রণ করে—তাদের অর্বাচীন ইতিহাসে (প্রাচীন ইতিহাস এদের নেই) এই বোধ হয় তারা কাউকে কখনো নিমন্ত্রণ করলো—এ রকম পুরু চামড়ার আচরণ করবে কেন? তদুপরি শুনেছি, মরক্কো দেশকে নাকি এখনো বহু বাবতে ফ্রান্স এবং স্পেনের কথামতো চলতে হয়, এবং সর্বশেষে শুনেছি, স্পেন ও ফ্রান্সের ঝগড়ার সুযোগ নিয়েই এ-দেশের যেটুকু "স্বাধীনতা" আছে সেটুকু বেঁচেবর্তে আছে। আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, মুসলিম রাষ্ট্রদের নিমন্ত্রণ করে এরা যেন সেই ইতালীয় ডুয়েলকামীর মতো পদমর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল। আমার তো মনে হয় না, আক্‌সা মসজিদের আগুন মরক্কোর বুকে কোনো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কোথায় মরক্কো, কোথায় ভারত? পদমর্যাদায় কোথায় ভারত আর কোথায় সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর টা-পেনি হে-পেনি মরক্কো! সে আমাদের ইনসল্ট করবে কী করে!

ফখরুদ্দীন সায়েব, দীনেশবাবু, আমাদের ফরেন আপিস যা করলেন সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার দুঃখ, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে চিঠিপত্র ছাপিয়ে এ-দেশের মুসলমানরা এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন না কেন? বলেন না কেন যে, এঁদেরই হয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার ঐ একটা থার্ড ক্লাস দেশে গিয়েছিল।

যদ্যপি-বা স্বীকার করি—আমি করি না—যে ভারত রাবাতে ইনসল্টেড হয়েছে—তথাপি বলবো, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপমানিত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই। ক্ষুদ্র স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে জয়ী হলেও উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কিছু নেই।

অল-মসজিদ্-উল-আক্সা

আজকের দিনে বিশ্ব মুসলিম প্রধানত তিনটি তীর্থ দর্শনে যান। মক্কায় আল্লার ঘর কা'বাতে, মদীনায় পয়গম্বরের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তৃতীয় জেরুজালেমে—যেখানে ইহুদি, খ্রীষ্ট ও ইসলাম তিন ধর্মের সমন্বয় হয়।

প্রকৃত শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে যে-তিনটি পুণ্যভূমি স্বীকার করতে হয় তার একটি মক্কার কা'বা এবং তারপর যে পুণ্যস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তার দুইটিই জেরুজালেমে। এর প্রথমটি একাধিক নামে পরিচিত। ইংরিজিতে একে ডোম্ অব দি রক্ (রক = প্রস্তরের উপর নির্মিত ডোম্ = গুম্বুজ), ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশতঃ ওমর মস্ক্ও বলা হয়; আরবীতে এটিকে কুব্বতুস্—সখরা (কুব্বৎ = ডোম; সখ্রা = প্রস্তর বলা হয়)। এটিকে ইহুদি, খ্রীস্টান, মুসলমান সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ এই তিন ধর্মেরই সম্মানিত রাজা সুলেমানের প্রসিদ্ধ মন্দির একদা এস্থলেই দণ্ডায়মান ছিল। এই সলমনের টেম্পল্ একাধিক বার বিনষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা। ভগ্নস্তূপের উপর তাবৎ শহরের ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বৎসর ধরে। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হজরৎ ওমর খ্রীস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে জঞ্জাল সরিয়ে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর পঞ্চাশ বৎসর পর আমাদের শাহ্-জাহানের মতো বিত্তশালী ও স্থাপত্যে সুরুচিসম্পন্ন খলিফা আব্দুল মালিক সেখানে যে পৃথিবীর অন্যতম অনবদ্য ইমারৎ নির্মাণ করেন সেইটিই ১২০০ বৎসর ধরে সেখানে অটুট অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজনের সৌন্দর্যস্তুতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছে। আমি যতদিন জেরুজালেমে ছিলুম তার প্রায় প্রতিদিন একবার না একবার একা একা ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর বিরাট আরকিটেক্টনিকাল বৈভব থেকে ক্ষুদ্রতম অলংকরণ দেখে মুগ্ধ হতুম।

(১) কা'বা, (২) উপরে উল্লিখিত এই মসজিদ—তারপরই আসে (৩) মস্জিদ-উল্-আক্সা, সংক্ষেপে আক্সা মসজিদ। এই আক্সার উল্লেখ কুরান শরীফে আছে (সুরা ১৭ : ১)।

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

আরব ও ইহুদি একই সেমিতি বংশ (রেস) জাত, একই রক্ত ধারণ করে। আরবী ও হীব্রু (ইহুদিদের এই ভাষাতেই তাদের বাইবেল রচিত) ভাষা দুই

ভগ্নী, অর্থাৎ কগ্‌নেট্‌। এবং সব চেয়ে বড় কথা বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী প্রফেটগণ যথা, আব্রাহম, দায়ুদ, সুলেমান ইত্যাদি কুরান শরীফেও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। হজরৎ নবী তাই যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন তিনি ইহুদি আরবের কেন্দ্রভূমি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু হজরতের মদীনা শহরের বসতি স্থাপনা করার দুই বৎসর পর আল্লার আদেশে মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন—এবং আজও সেই রীতি প্রচলিত আছে। এরই ফলে জেরুজালেমের সলমন-মন্দিরভূমি মুসলিম জগতে দ্বিতীয় স্থান পেল বটে তবু কোনো কোনো জাত্যভিমানী আরব সেটিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রথম স্থানেই রেখেছিলেন—বিশেষত উম্মই (ওমাইয়াড্‌) খলিফারা। অদ্যকার দিনে কিন্তু মুসলিম জহান প্রথম স্থান দেয় মক্কার কা'বা শরীফকে এবং দ্বিতীয় স্থান জেরুজালেমের সলমন মন্দিরকে—যার উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মালিক নির্মিত এমারতের বয়ান এইমাত্র দিয়েছি এবং এর পরেই বলেছি, তৃতীয় পুণ্যক্ষেত্র—মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

কিন্তু তৃতীয় হলে কি হয়, এই আক্‌সার সঙ্গে বিজড়িত আছে বিশ্ব মুসলিমের রোমহর্ষক উত্তেজনাদায়ী ঐতিহ্য, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্মিলিত হবার অবিস্মরণীয় অভিযান এবং তার চরম ফলপ্রাপ্তি—নজাৎ, মোক্ষ, মহা পরিনির্বাণ, যা-খুশী বলতে পারেন।

কুরান শরীফে এ-অভিযানের যে-বয়ান লেখা আছে, হদীসে তার যে টীকা-টিপ্পনী আছে (কুরান হিন্দুদের বেদস্থানীয় শ্রুতি; হদীসকে স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়, আশা করি কোনো মুসলমান এ-তুলনার জন্য অপরাধ নেবেন না)। বস্তুত ইয়োরোপীয় কাব্যের ইতিহাসে ইসলামের এই অনুচ্ছেদটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দান্তের মহাকাব্য "ডিভাইন কমেডি" এর কাছে ঋণী—অপর্যাপ্ত ইয়োরোপীয় আরবী তথা ইতালিয়ান ভাষা-সাহিত্যের গুণীজ্ঞানী আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন।

কুরানে আছে, পয়গম্বর সাহেব মক্কাতে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার কিছু কালের মধ্যেই স্বয়ং আল্লাতালা তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরম সত্যধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রধান ফেরেশতা ("দেবদূত" ইংরিজিতে "আর্কেঞ্জেল" জিব্‌ রাঈল = গেব্রিয়েলকে) পাঠান মুহম্মদকে (দঃ) তাঁর সমীপে

নিয়ে আসতে।[১] কুরান শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে,

"সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাত্রেই তাঁর অনুচরসহ মসজিদ্-উল্-হারাম্ (অর্থাৎ মক্কার কা'বা) থেকে একই রাত্রে মসজিদ-উল্-আক্সা (জেরুজালেম) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।" (কুরান শরীফ; সূরা ১৭ : ১)

অন্বয় এবং টীকা : "সেই ব্যক্তি" হজরৎ। "একই রাত্রে"—তখনকার দিনে যানবাহন যা ছিল তাতে করে মক্কা থেকে জেরুজালেম পৌঁছতে অন্তত (উটে চড়েও) পনেরো দিন লাগার কথা। এটা আমার অনুমান মাত্র। কম তো হতে পারে না; বেশীই হবে।

"আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি"—অর্থাৎ আল্লাতালা স্বয়ং তাঁকে সত্যধর্মের গভীর তত্ত্বে দীক্ষিত করবেন—পূর্বোক্ত নজাৎ মোক্ষ ইত্যাদি।

এস্থলে প্রশ্ন মসজিদ-উল্-আক্সা কোন্ স্থলে অধিষ্ঠিত? মুসলিম অমুসলিম (অমুসলিম এই কারণে বলছি, প্রচলিতার্থে অহিন্দু মাক্সমুলার যে-রকম বেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ঠিক সেই জিনিসই করেছেন একাধিক ইয়োরোপীয় অমুসলিম পণ্ডিত কুরান হদীস নিয়ে) সকলেই তার অধিষ্ঠান জেরুজালেমে ছিল বলে স্থির-নিশ্চয়—তাই আমি অনুবাদ এবং টীকাতে একই রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণের কথা বলেছি।

পণ্ডিতদের বক্তব্য, মক্কা শরীফের বাইরে এমন এক জায়গা যেটি আল্লা স্বয়ং পূতপবিত্র করেছেন সে-শুধু জেরুজালেমই হতে পারে। কারণ ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ই হজরৎ নবী ঐ দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতএব সেই জেরুজালেমের সলমনের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিতেই আছে মসজিদ-উল্-আক্সা।

পূর্বেই বলেছি খলিফা ওমর সলমন মন্দিরের সেই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন ডোম অব দি রক্ এবং তারই অতি কাছে আরেকটি বৃহত্তর বিরাট মসজিদ-উল্-আক্সা।

ডোম অব্ দি রক্ একটা পাথরের চতুর্দিকে গড়া হয়েছিল বলে স্থপতি সেটাকে হাজার হাজার নমাজার্থী মুসলমানের জন্য বিরাট কলেবর দিতে পারেন

১ কুরান শরীফে জিব্রাঈলের উল্লেখ নেই। একাধিক হদীসে সবিস্তর আছে।

নি। তাই তিনি সেটিকে করেছিলেন সুন্দর, মধুর। অবশ্য মসজিদের চতুর্দিকে দিয়েছিলেন প্রশস্ততম অঙ্গন (এদেশের মন্দিরে সঙ্কীর্ণ গর্ভ-গৃহের চতুর্দিকে যে-রকম বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাখা হয়), কিন্তু গ্রীষ্মকালে, জেরুজালেমের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানকার অনাচ্ছাদিত মুক্তাঙ্গনে—যেখানে মস্তকোপরি সূর্যের প্রতাপের চেয়ে পদতলের পাষাণ ঢের বেশী পীড়াদায়ক—সেখানে জুম্মা নামাজ পড়া অহেতুক পীড়াদায়ক হবে বলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ যা চায় সেই পরিমাণে বিস্তৃত, মসজিদ্-উল্-আক্সা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে মসজিদ্-উল্-আক্সা তাবৎ পুণ্যভূমির মধ্যে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর।

কুরান হদীসের সঙ্গে যে মুসলিমের সামান্যতম পরিচয় আছে, সে-ই আপন মনে কল্পনা করে, সেই সুদূর মক্কা থেকে আল্লা তাঁর প্রিয় নবীকে রাতারাতি নিয়ে এলেন মুস্‌জিদ্-উল্ আক্সাতে (শব্দার্থে মক্কা থেকে "সবচেয়ে দূরে পুণ্যক্ষেত্রে"), সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'বুর্‌য়াক্' নামক পক্ষিরাজ অশ্ব এবং তার মুখ মানবীর ন্যায়—সেই অশ্বে সোয়ার হয়ে নবীজী পৌঁছলেন বেহেশ্‌তের দ্বার-প্রান্তে।

এই নিয়ে সে মনে মনে কত না কল্পনার জাল বোনে! স্বয়ং আল্লার সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ!

অবশ্য এ-কথাও সত্য যে বহু মুসলিম দার্শনিক সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত = মিস্টিক) এ প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছেন, এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ এটা কি বাস্তব না স্বপ্ন; তিনি কি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, না তাঁর আত্মা মাত্রই আল্লার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিন্তু মোলাকাত যে হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

যাই হোক্, যা-ই থাক্,—এই মস্‌জিদ-উল্-আক্সা থেকেই, আল্লাতালা হজরৎকে দিয়ে স্থাপনা করলেন মর্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমিতে যোগ-সেতু।

সেই সেতুর পার্থিব প্রান্ত পুড়িয়ে দিয়ে সে-সেতু বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা অজ্ঞ বিজ্ঞ যে-কোনো মুসলমানকেই বিচলিত করার কথা।

ন্যাকামো

প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বর প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠশালার মাস্টার-মশাইদের 'দুরাবস্থা', দেশ থেকে কেন নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না এই নিয়ে বিরাট বিরাট মীটিং হয়, বিস্তর চেল্লাচেল্লি হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয়। তারপর সারা বৎসর নিশ্চুপ।

এ-যেন কঞ্জুস শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার মতো। নিতান্ত না করলেই নয় বলে। তারপর পরিপূর্ণ একটি বৎসর কিপ্টে শ্বশুর নিশ্চিন্দি।

উঁহু! তুলনাটা টায়-টায় মিললো না। শ্বশুর যতই হাড়ে টক শাইলক হোক না কেন, এবং জামাই যতই হতভাগ্য দুঃখী হোক না কেন, সে বেচারী অন্তত একবেলার মতো পেট ভরে খেতে পায় এবং শুনেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একখানা কাপড়ও পায়। আমি সঠিক বলতে পারবো না কারণ আমি মুসলমানী বিয়ে করেছি। যদ্যপি সম্পর্কে তার এক বারেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই কলকাতা শহরেই পুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঝাঁ-চকচকে একাধিক মোটর দাবড়ে বেড়ায় তবু শালা···আমি অশ্রাব্য অছাপা গালিগালাজ করছি নে[১]—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটা সম্পর্কে আমার বড়কুটুম (শ্যালক)—আমাকে জামাই-ষষ্ঠীর দিনে স্মরণ করে না। কারণ তার পিতা—আমার ঈশ্বর শ্বশুর মহাশয় তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে যাওয়ার পর এই শ্যালকটি তার পিতার তাবৎ সব গ্রহণ করেছেন নৃত্য করতে করতে। (সত্যের খাতিরে অনিচ্ছায় বলছি দাতাকর্ণ

১ আমার প্রতি অকারণ সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আশকথা-পাশকথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে অবান্তর একটি ঘটনার উল্লেখ। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ছোট একটি মহকুমার অনারারি হাকিম। একদিন আদালত থেকে ফিরে আমায় বললেন, "সিতু, আজ আদালতে কি হয়েছিল, জানিস? এক মূর্খ আরেক গাধার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছে, ঐ দোসরাটা নাকি তাকে সদর রাস্তায় 'শালা' বলে গালাগালি দিয়েছে (এতদিন পরে আমার মনে নেই সেটা এবুজিভ ল্যানগুইজ না ডিফেমেশন-ছিল—লেখক)।" তারপর বাবা বললেন, "আসামী পক্ষের মোক্তারের বক্তব্য, যাকে সে 'শালা' বলেছে সে সম্পর্কে সত্যিই তার শালা; অতএব কোনো অপরাধ হয়নি। বিপক্ষ কিন্তু বলছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আসামী যখন শালা বলেছে তখন মধুভরা সোহাগ-পোরা সে শালা বলেনি; বলেছে

শ্বশুরমশাই বিশেষ কিছু রেখে যাননি, এবং সামান্য যেটুকু ভদ্রাসন রঙপুরে রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও পার্টিশনের ফলে শ্যালকের হস্তচ্যুত হয়। বেশ হয়েছে খুব হয়েছে !!) কিন্তু পিতৃদেবের দায়দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গেছে। তাই সে জামাইষষ্ঠীর একমাস আগের থেকে এড়িয়ে চলে। হিন্দু কায়দাকানুন আমি জানি নে, কিন্তু আমি যে অঞ্চলের মুসলমান সেখানে রীতি, শ্বশুর গত হওয়ার পরেই তাঁর পুত্র জামাইয়ের শ্বশুর হয়ে যান। হয়তো হিন্দুদের ভিতর এ-রেওয়াজ নেই। আমি জানবো কি করে ? কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় ঐক্যবিধান নিয়ে যখন সব্বাই মাথা ঘামাচ্ছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ লেনদেন গিভ্-অ্যাণ্ড-টেক করা উচিত নয় ?

এই দেখুন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় আমার দু-তিনটি হিন্দু বোন আমাকে নেমন্তন্ন জানায়—নেমন্তন্ন কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমাকে তখন তারা ডাক দেয়—হক্ হিসেবে, অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ রাইট। আমি তখন বিশ-পঁচিশ টাকার শাড়ি নিয়ে যাই।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েলস, ফিরোজ মিঞা বড্ডই ঘোর আত্মাভিমানী। সে নিমন্ত্রণ পায় তার তিন-চার হিন্দু বোনদের কাছ থেকে। আমি বিলক্ষণ বুঝি সেই সরলা হিন্দু কুমারীরা মনে মনে ভাবে, সব হিন্দু ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পরব করছে আর এই ছোট ভাইটি একা একা দিন গোঁয়াবে ? তদুপরি একথাও তো সত্য, এই কুমারীদের কোনো কোনো হিন্দু ভাই মুসলমান ফিরোজের চেয়ে কোনো গুণে শ্রেষ্ঠতর নয়। আমার মনে পড়লো, ঐ ফিরোজই তার কোনো এক দিদির জন্মদিনে তার প্রিয় ফুল কেয়া আনতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে গোয়ালপাড়ার কেয়াবনের মধ্যিখানে গোখরো সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

অপমান করার জন্য।" ইতিমধ্যে বাবার মগরিবের (সন্ধ্যার নামাজের) অন্য অজুর জল এসে গিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি শুধোলুম, "আপনি কি রায় দিলেন ?" বাবা বললেন, "দুই পক্ষকে আদালত থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, "মস্করা করার জায়গা পাও নি !"...আমার মনে এখন সন্দেহ জাগে, বাবার এই হুকুম ঠিক আইনসম্মত হয়েছিল কি না। তবে এ কথা জানি, দুই পক্ষই কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে স্যুস্‌সুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা ছিলেন রাশভারী, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ। আসামী ফরিয়াদী মোক্তার সবাইকে দেখেছেন উলঙ্গাবস্থায় আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করতে।

অতএব বাবু ফিরোজ আমাকে বললেন, "আব্বু, আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে দিদিদের জন্য কিছু শাড়ি কিনতে হবে। আমি দালাল কোম্পানিতে যাচ্ছি।"

সর্বনাশ! দালাল কোম্পানী অকাতরে সব দেবে। অবশ্য, বাচ্চা ফিরোজ কেন, ওরা কাউকেই ঠকায় না। তবে কেনা আমি ওদেরকে একবার ঠকিয়েছি।

কত টাকার বিল এনেছিল জানেন? ১৮০ টাকা!

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম। বুঝিয়ে বলি। এ-লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু'লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হলো আপনাদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই।

ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই সেই রুদ্ররসে।

আমাকে যদি কেউ শুধোয়, আমি কোন্ জিনিসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি তবে নির্ভয়ে বলবো, শিক্ষা।

কোন্ শিক্ষা?

প্রাইমারি স্কুল, অর্থাৎ পাঠশালা।

তারপর?

হাইস্কুল। তারপর? কলেজ, বি. এ. এম. এ.। তারপর? পি. এচ. ডি.। আমার মনে সবচেয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়, যখন ডক্টরেট করার জন্য কেউ আমার কাছে এসে সাহায্য চায়।

পাঠক অপরাধ নেবেন না যদি এ-স্থলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মজীবন প্রকাশ করি।

বঙ্গসাহিত্যে আমার যেটুকু সামান্য লাস্ট বেঞ্চের আসন জুটেছে (অর্থাৎ আমার প্রথম পুস্তক "দেশে বিদেশে" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে) আমি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, মরহুম হুমায়ুন কবীর সাহেবের "চতুরঙ্গে" ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটির নাম "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম, যে যাই বলুক না কেন, আখেরে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হবে। কিন্তু এহ

বাহ্য। আমি তখন প্রাইমারি এডুকেশনের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলি :

'আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা মাঝে-মধ্যে থাকে, কিন্তু সে অতি সামান্য, নগণ্য। কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করার মত ভাষা ও শৈলী আমার নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে এবং অনেক স্থলেই উত্তম বিদ্যার্জন করেছেন, যেটা আমরা শহরে বসে সঠিক বুঝি নে—গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় অনেক বেশী। মহাজনের রূঢ় বাক্য, জমিদার জোতদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়মনে আঘাত দেয় ঢের ঢের বেশী। এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ট্রাজেডি। "ইত্তিহাদ" "আজাদ" (পশ্চিমবঙ্গের বেলায় বলবো, "আনন্দবাজার" "দেশ"—এটা এখানে জুড়ে দিচ্ছি—লেখক) মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহু ক্ষেত্রে নিরাময় হয়, হয়তো তার সবিস্তর আশাবাদী বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর অন্নাভাবে চিকিৎসাভাবে পুত্র অথবা কন্যা যখন যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমার জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছা যায়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পাঠশালার গুরু-মশাইয়ের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না, স্বাস্থ্যনিবাস (সেনেটরিয়াম) সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মারোগকে কিস্মতের গর্দিশ ব'লে মেনে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে। হতভাগা পণ্ডিত পারে না।'

কিন্তু প্রশ্ন, প্রবন্ধের গোড়াতেই জামাইষষ্ঠীর কথা তুলেছিলুম কেন?

শুনেছি, সঠিক বলতে পারবো না, গাঁয়ের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে বছরে এক-দিন শহরে এনে ঐ যে বিরাট বিরাট সভা করা হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয় তখন জামাইষষ্ঠীর দিনের মতো তাদেরকে এক পেট খেতেও দেওয়া হয় না।

এবং তৎপর ৩৬৪ দিনের গোরস্তানের নীরবতা।

এই শেষ নয়। দাঁড়ান না। সুযোগ পেলে আরেকদিন আরেক হাত আমি নেবই নেব!

স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু মেনে, সাক্ষী মেনে।

বিশ্বভারতী প্রাগ্

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য এদেশে বিশ্ববিখ্যাত একাধিক পণ্ডিত আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন অধ্যাপক মরিৎস্ ভিন্‌টার্‌নিৎস। এঁকে এদেশের অনেক সংস্কৃতপণ্ডিত চিনতে পারবেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২২ জুড়ে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। এরই ইংরাজী অনুবাদ বেরয় এদেশে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। এছাড়া আছে, 'গৃহ্যসূত্র' 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ অনুষ্ঠান' 'ভারতীয় ধর্মে রমণী' ইত্যাদি তাঁর প্রচুর গ্রন্থরাজি।

এ সব ক'টি বই-ই পণ্ডিতদের জন্য।

কিন্তু তিনি আমাদের মতো সাধারণজনদের একখানি পুস্তিকা লিখে গিয়েছেন —কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এ-পুস্তিকা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে, অন্য অবকাশে, আমি দু-একটি কথা বলেছি। এ-স্থলে পুনরায় বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে তার ভিতরে আমি এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তার প্রধান কারণ অধ্যাপকের সমস্ত জীবন কাটে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। এদেরই ভিতর দিয়ে যে ঐতিহ্য ভারতবর্ষে চলে আসছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সংযুক্ত, কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমত কিভাবে গড়ে উঠেছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী বলার অধিকার ছিল অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসেরই। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন।

বইখানি অতিশয় সরল জর্মন ভাষায় রচিত। ইংরাজী বা বাংলায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। হওয়া উচিত। বইখানির এক খণ্ড শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয় জর্মন এবং পরবর্তী যুগে খাস জর্মনির জর্মনগণ দ্বারা নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কৃষ্টি সভ্যতার অনেক-খানি জর্মন সভ্যতার কাছে ঋণী। তাছাড়া অনেক জর্মনও চেকোস্লোভাকিয়ায় বাস করতো।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎস চেক নন। তিনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাঁর জন্মভূমি পড়ে নবনির্মিত রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অবশ্য অস্ট্রিয়াই (হিটলারেরও জন্ম এই অঞ্চলে এবং তাঁর ধমনীতে নাকি কিঞ্চিৎ চেক

রক্তও ছিল ; মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, চেকদের যে তিনি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ, ওই করে তিনি তাঁর চেক রক্ত অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন) কিন্তু, সেইটে আসল কথা নয়। তিনি ভালোবাসতেন প্রাগ শহরকে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সেখানে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮/১৯ খ্রীস্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়া জন্মগ্রহণ করে মাতৃ-উদর থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি ইচ্ছে করলেই ভিয়েনা (এইমাত্র বলেছি, তাঁর মাতৃভূমি পড়েছিল অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন প্রাগ ইত্যাদি শহর থেকে তার আপনজনকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যাননি।

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎস ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বরাবর ১৯৩৭—তাঁর পরলোকগমন অবধি প্রাগেই থেকে যান।

তিনি ছিলেন জাতে, ধর্মে ইহুদি।[১] ইহুদিরা কোনো জায়গায় পত্তন জমালে সেখানে যে সব ইহুদি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক হয়ে যায় যে পরে ভিন্ন জায়গায় উৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেলেও এদের ত্যাগ করাটা নিমকহারামী বলে মনে করে। ওই একই কারণে ইজরায়েলের শত ক্রন্দনরোদন সত্ত্বেও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইহুদি পরিবার-সমাজ-দেশ ছেড়ে ওই দেশে যেতে চায় না।[২]

প্রাগ শহর বড় বিচিত্র শহর। সেখানে চেক আছে, জর্মন আছে, ইহুদি আছে, আরো কত জাত-বেজাতের লোক আছে—এবং বড় মিলেমিশে থাকে।

আর, পূর্বেই বলেছি, শহরটি বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

মধ্যিখান দিয়ে মলডাও নদী চলে গিয়েছে। ঠিক যে-রকম ভিয়েনার মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব, প্যারিসের মধ্যিখান দিয়ে শেন, বুডাপেস্ট-এর মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব।

---

১ আমি শুনেছি তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসাররূপে ছিলেন তখন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে সেখানকার ইহুদি ধর্মমন্দিরে তাঁদের বাৎসরিক পূজায় উপস্থিত থাকেন।

২ অন্য কারণও হয়তো আছে। ১৯৩৫ সালে যখন আমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের কেন্দ্রভূমি তেল্‌-আভিভ শহরে যাই তখন এক ইহুদি আমাকে বলেন—মস্করা করে, না কি, বলা কঠিন—'কাকে কাকের মাংস খায় না। সব ইহুদি, সব কাক, এক জায়গায় জড়ো হলে তো উপবাসে মরতে হবে। দুনিয়ার কুল্লে জাত স্বজাতের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা ব্যত্যয়।'

অধ্যাপক ভিন্‌টার্‌নিৎসকে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবো।

হোটেলওলাকে শুধোলুম, হোথায় কোন্ ট্রামে বা বাস-এ যেতে হয়।

সেদিন কি একটা পরব ছিল। ভিড়ে ভিড়ে হুর্জ্জুম।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই বন্ধ। কিন্তু একটা স্কেলিটেন স্টাফ থাকবে তো! তারা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবে।

ইতিমধ্যে এই হুজ্জুম না কাটা পর্যন্ত ট্রাম-বাস তো চলবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকোচ্ছি, এমন সময়ে এক অপরূপ সুন্দরী এসে আমাকে শুধোলে, 'আপনার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন?'

এ শুধু প্রাগেই সম্ভবে!

অন্য দেশের মেয়েরা পুরুষকে মদত দেবার জন্য এরকম এগিয়ে আসে না।

ত্রিমূর্তি

প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক মিখাইল্ গুস্ একটি বড় খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর কথা আজ আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এরকম একটা শিক্ষা হল যে, আমাদের যুগে বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের যে কোনো রকম দাবি এক সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হিটলারের পদানুসরণ যারা করতে চায়, তাদের সকলের প্রতি এ হল এক গুরুতর হুঁশিয়ারি।"[১]

কমরেড পণ্ডিত গুসের কথার পিঠ-পিঠ আমি কোনো মন্তব্য করার দম্ভ ধরি নে। আমি অন্য এক মনস্তত্ত্ববিদের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি মাত্র। দ্বিতীয়

১ ভারতে অবস্থিত বিদেশী একাধিক দূতাবাস একাধিক ভাষায় বিস্তর প্রোপাগাণ্ডা লেখন প্রকাশ করেন, আমার মতো স্বল্পজ্ঞাত লোকও খান-দশেক পায়। এগুলো পড়তে হলে অনেকখানি ধৈর্যের প্রয়োজন কারণ এদের অধিকাংশই বড় একঘেয়ে।...এরই মধ্যে হঠাৎ একখানি উত্তম চটি পুস্তিকা আমার হৃদয়মনকে বড়ই আলোড়িত করেছে। "সোভিয়েত সমীক্ষা" ৯. ৯. ৬৯ সংখ্যা, সম্পাদক কোলোকোলো, যুগ্ম-সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানে প্রকাশিত।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরনবের্গ শহরে যখন গ্যোরিঙ, হেস্, কাইটেল প্রভৃতি জনা বিশেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছিল তখন প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কেলি দিনের পর দিন হাজতে এদের মনঃসমীক্ষণ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে বলেন, "হিটলারের মতো ডিক্টেটর এবং নাৎসি পার্টির মতো পার্টি পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে পুনরায় দেখা দিতে পারে।" তাই আমার মনে ভয় লাগে, কমরেড গুসের "গুরুতর হুঁশিয়ারি" সত্ত্বেও এ-গর্দিশ পুনরায় যে-কোনো দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু যদি রুশ তভারিশ্ গুস্এর এ-হুঁশিয়ারি (অস্তরজ্নো!) মেনে নেন তবে ক্রমে ক্রমে চীন এমন কি মার্কিনও হয়তো রুশের সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন—এ রকম একটা আশা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপের পঞ্চপ্রধান ছিলেন, হিটলার স্তালিন মুস্সোলীনি রোজোভেল্ট্ এবং চার্চিল। এদের প্রথম তিনজন ছিলেন কট্টর ডিক্টেটর; বাকি দুজন গণতন্ত্রের প্রতিভূ। প্রথম তিনজন রণাঙ্গনে নামেননি বটে, কিন্তু তাবৎ যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি (স্ট্রাটেজি; মাঝে-মধ্যে ট্যাক্টিক পর্যন্ত)[২] সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার, কঠিন নির্দেশ দিতেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ জঙ্গীলাটদের।

এই সংখ্যায় আছে দুটি সুলিখিত রচনা: (১) মিখাইল গুস কর্তৃক "ইতিহাসের শিক্ষা" এবং (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের জনৈক মার্শাল কর্তৃক "সোভিয়েত সৈন্যের উদ্দেশে" (মার্শাল জুকভের গ্রন্থ "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তার" সমালোচনা)। বলা বাহুল্য আমি যে সব সময় এঁদের সঙ্গে একমত হতে পেরেছি তা নয়। সান্ত্বনা নিই এই ভেবে যে দেশে-বিদেশের একাধিক কমরেডও হয়তো কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। বাংলা অনুবাদ কে বা কারা করেছেন তাঁদের নাম নেই। অনুবাদ স্থলে স্থলে ঈষৎ আড়ষ্ট হলেও অতিশয় বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গের।

২ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (৩ অক্টোবর '৬৯)-এ জেনারেল শ্রীযুক্ত চৌধুরীর "ডিফেন্স স্ট্রাটেজি" শিরোনামায় লিখিত একটি অতুলনীয় অনবদ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে হয়ত বলবেন, সাধারণজন, (সিভিলিয়ানরা) যতই সংগ্রামশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে মারমুখো হয়ে পদে পদে লড়াই করতে চাইবে—জিঙ্গোইস্ট বনে যাবে। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার বিশ্বাস রাজনীতি কোথায় সমরনীতিতে পরিণত হয়, এ জ্ঞান সাধারণজনের যতই বাড়বে ততই যুদ্ধ সম্বন্ধে তার দায়িত্ব-

রোজোভেল্ট চার্চিল সেরকম করেননি। এঁরা তাঁদের জঙ্গীলাটদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বাদবাকী সব কিছু ওদেরই হাতে ছেড়ে দিতেন। তবে বলা হয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত জঙ্গীলাটদের রুটিন কর্মে নাক গলাতেন (ইনটারফিয়ার করতেন) ডিক্টেটরদের ভিতর হিটলার প্রচুরতম ও গণতন্ত্রের প্রতিভূ চার্চিল অনেকখানি।

এই পঞ্চপ্রধানের যে তিন জঙ্গীলাট খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁরা মার্কিন আইজেনহাওয়ার, ইংরেজ মণ্টগামেরি। ডিক্টেটররা সর্বদাই সর্বকৃতিত্ব সম্পূর্ণ পেতে চান বলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর কোনো সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তৎসত্ত্বেও ডিক্টেটরের অধীনে থেকেও যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি রুশের জঙ্গীলাট মার্শাল গ্রিগরি জুকফ্।

এই তিন জঙ্গীলাট সম্মুখ সংগ্রামে নেমেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই মার্কিন আইজেনহাওয়ার ও ইংরেজ মণ্টগামেরি যুদ্ধক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতা সবিস্তর বর্ণনা করে গ্রন্থ লেখেন। তৃতীয় বীর জুকফ্ এ তাবৎ কিছুই লেখেননি।[৩] (হয়তো স্তালিন চাননি যে জুকফ্ কোনো কিছু লেখেন যাতে করে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মনে হয় সেখানে তিনি করেছিলেন ভুল। সেকথা পরে হবে।)

এই তিনজনই হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন, ইংরেজ (ফরাসীও) যদ্যপি স্বীকার করতে রাজী হন না, আমার নিজের বিশ্বাস হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকফের। সুতরাং গত বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন-ইতিহাস—জুকফের বিবরণীহীন ইতিহাস—যেন হামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক!

বোধও বাড়বে। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন, এ দুনিয়ায় কত শত বার সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ানরা লড়াই করার জন্য যখন হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন সেনাবাহিনীর জঙ্গীলাট জাঁদরেলরা (প্রফেশনাল সোলজাররা) তাদেরকে ঠেকিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দেয়নি এবং পরে দেখা গেল ঐ করে জঙ্গীলাট জাঁদরেল দেশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। অথচ সাধারণজন ভাবে, এরা কথায় কথায় লড়াই শুরু করে দিয়ে পদোন্নতি, মেডেলের জন্য মুখিয়ে আছেন।

৩ কয়েকজন জর্মন জেনরেল লিখেছেন বটে, কিন্তু এঁদের কেউই সব রণাঙ্গনের পূর্ণাধিকার কখনো পাননি। আর ইতালিয়ান "জাঁদরেল"দের সম্বন্ধে "নীরবতা হিরণ্ময়"।

স্তালিনের মৃত্যুর পর জুকফ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থ লিখতে পারতেন। কিন্তু তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্তালিনের চরিত্রের উপর কলঙ্ক-লেপন। রুশের বড় কর্তারা তখন যে-প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করলেন তার মূল বক্তব্য, "স্তালিন ছিল সংগ্রাম-নীতিতে একটা আস্ত বুদ্ধু। তার ভ্রান্ত নির্দেশের ফলেই লক্ষ লক্ষ রুশ সে যুদ্ধে মারা যায়। নইলে যুদ্ধ অনেক পূর্বেই খতম হয়ে যেত।"

যুদ্ধের পর স্তালিন যদিও জুকফকে নানাপ্রকার নিপীড়ন করেন তবু তিনি এই প্রোপাগাণ্ডাতে সায় দিতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই সে সময়েও তিনি কোনো কিছু লিখলেন না।

এরপর স্তালিন-স্মৃতিবিরোধীরাও গদিচ্যুত হলেন।

ধীরে ধীরে স্তালিন সম্বন্ধে রাশার জনসাধারণেরও ধারণা বদলাতে লাগলো।

তাই যুদ্ধের চব্বিশ বৎসর পর জুকফ তাঁর "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তা" প্রকাশ করেছেন ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে। (এক নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধশেষের এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর আইজেনহাওয়ার, মণ্টগামেরি ও জুকফ এই ত্রিমূর্তির কল্যাণে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাতেকলমে এঁরা কোন্ কোন্ রণনীতি রণকৌশল অবলম্বন করে অবশেষে জয়লাভ করলেন তার পূর্ণতর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হবে—কোনো যুদ্ধেরই পূর্ণতম ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি, এ-বেলাও হবে না।

জুকফের মূল গ্রন্থ বা তার পূর্ণ অনুবাদ আমার হাতে কখনো পৌঁছবে না। ইতিমধ্যে রুশ মার্শাল ভাসিলেফস্কি ঐ গ্রন্থের যে পরিচিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়েছেন একমাত্র তারই উপর নির্ভর করে—কথায় বলে অভাবে পড়লে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—ঘরমুখো বাঙালীকে রণমুখো সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা শোনাবার চেষ্টা দেব। একেবারে নিষ্ফল হব না। কারণ "রণমুখো" না হলেও বাঙালী যে ইতিমধ্যে বেশ "মারমুখো" হয়ে উঠেছে সে-তত্ত্ব কি কলকাতা কি মফঃস্বল সর্বত্রই স্বপ্রকাশ। শুনতে পাই এরপর তারা নাকি "রণমুখো" হয়ে লড়াই লড়ে এদেশে "প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র" প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটা আ লা রুস্ (রুশ পদ্ধতিতে রান্না স্যালাড) না, আ লা শীন (চীন পদ্ধতিতে রান্না ফ্রাইড রাইস) হবে সেটি নিয়ে মতভেদ আছে।

রুশ রাজনীতি তথা চীন রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞানগম্যি নেই।

কিন্তু বিস্তর রসানুভূতি আছে উভয়ের সরেস খাদ্যাদি সম্বন্ধে।

তাই ভালোবাসি রাশান স্যালাড, রাশান কাভিয়ার, রাশান বর্শস্যুপ, রাশান পানীয় (আমি কড়া ভোদকা সইতে পারি নে ; পছন্দ করি—এবং স্তালিনও ঐ খেতেন—উত্তম ওয়াইন, তা সে স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ারই হোক বা ককেশাসেরই হোক)।

সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করি চীনা ফ্রাইড রাইস (চীনা হোটেল-বয় বলে "ফ্রাইড লাইস" অর্থাৎ ভাজা উকুন), স্প্রিং চিকিন, ব্যাঙের ছাতার অমলেট ইত্যাদি।

কলকাতার রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা একটা মারাত্মক ভুল করছেন। ওঁদের উচিত এ-শহরে অন্তত দু গণ্ডা রাশান রেস্তোরাঁ বসানো।

কারণ "Love does not go through heart, but through stomach"—"প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না, সঞ্চারিত হয় উদরে"—আপ্তবাক্যটি বলেছেন একটি ফরাসিনী সুরসিকা নাগরিক ॥

রহস্য লহরী

২২ সেপ্টেম্বরের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের "ক্যালকাটা নোটবুক"-এ দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্বন্ধে ঐ "নোটবুকে"র বিদগ্ধ লেখকের করুণ-মধুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুচ্ছেদটি পড়ে আমি সত্যই ঈষৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলুম। "ঈষৎ" বললুম এই কারণে যে, আমিও স্থির করেছিলাম যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর (দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম ২০ আগস্ট ১৮৬৯) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো। তারপর বার্ধক্যে যা হয়, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের জন্মদিন যখন সে ভুলে যায় তখন তরুণ অকরুণ পাঠক তার ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির দিকে কটাক্ষ করে তাকে বিড়ম্বিত করবেন না এই তার ক্ষীণতর আশা।

তরুণ পাঠক যদি ২২ সেপ্টেম্বরের ঐ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডটি যোগাড় করতে পারেন তবে তিনি যেন সেই অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর ঠাকুমা-দিদিমাকে শোনান। আমি কথা দিচ্ছি, তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে, ক্ষণতরে তাঁরা আবার কিশোরী হয়ে যাবেন, দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারেন। কারণ পুনরায় বলছি, অনুচ্ছেদটি—এ লেখকের চৌদ্দ আনা লেখাতে যা হয় তাই হয়েছে—বড়ই সুন্দর হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করছি, আমি লেখক হিসেবে ওঁকে দম্ভপূর্ণ সার্টিফিকেট দিচ্ছি নে—সামান্য পাঠক হিসেবে আমার দিলভরা তারীফ জানাচ্ছি। সে হক সকল পাঠকেরই আছে।

আর লেখক হিসেবে বললেই বা কী! কাগে কাগের মাংস খায় না, এ প্রবাদ জানি। কিন্তু কাগে কাগের মাংস প্রশংসা করে না একথা কখনো শুনিনি।

গুরুজনদের মুখে যা শুনেছি (বিশেষত মমাগ্রজের বাচনিক—কারণ তিনি কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) সে-সব তত্ত্ব ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলেছি। ভুল হয়ে যেতে পারে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম কুষ্টিয়ার কাছেই। সেই জায়গাতেই বা তার অতিশয় কাছে জন্ম নেন বা বিরাজ করেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্যিক জলধর সেন (যাঁকে শরৎচন্দ্র বড়দা বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখাতেন) এবং এ-যুগের প্রথম মুসলমান লেখক মুশর্‌রফ হোসেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "বিষাদসিন্ধু" এখনো মুসলমানদের—এবং অনেক হিন্দুদের কাছে সুপরিচিত।

তদুপরি ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এঁর শ্যামাসঙ্গীত আমি শুনি বাল্যবয়সে, পদকীর্তন শোনার সময়ে—প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বহু পূর্বে। হায়, সে গানের কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। তার বক্তব্য ছিল, "কাঙাল (অর্থাৎ হরিনাথ) যদি ছেলের মত ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে।" গ্রামোফোন কোম্পানির সে রেকর্ড বোধ হয় এখন আর নেই।

এবং এই অঞ্চলেরই মহাত্মা—লালন ফকীর। তাঁর পরিচয় দেবার মতো প্রগল্‌ভতা আমার নেই।

ঐ সময়ে গোপনে গোপনে কেমন যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল নদীয়া জেলায় এবং কলকাতাতে। নদীয়ার লোক তো বলতোই, এখনো বলে, তাদের বাংলা ভাষা সবচেয়ে শুদ্ধ ও মধুর। ওদিকে রাঢ়ের ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম প্রভৃতি তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তাঁরা যে-ভাষা জানেন, বলেন, সেই ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রবর্তিত করেছেন। তাই এখনো নদীয়া তথা পূর্ববঙ্গের বহু গুণী খেদ করেন যে, মীর মুশর্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' যখন প্রকাশিত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে পুস্তকটির পরিপূর্ণ সম্মান দেখাননি।

ঐ সময়ে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে, এ শতাব্দীর গোড়াতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সামান্য কয়েকটি পল্লীচিত্র ("নোটবুকে"র ভাষায় he wrote sketches of village life in a reminiscent mood…. Generally he starts with a festival and goes on to describe its impact

on the different sections of the village population. His pleasant vignettes—পল্লীচিত্রের জন্য এই "ভিন্নেৎ" শব্দটি একদম mot juste—born out of acute personal observation, present a microscopic picture of life.) "ভারতী" পত্রিকাকে পাঠান। তখন সম্পাদিকা ছিলেন খুব সম্ভব সরলা দেবী কিংবা তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। এই ভিন্নেৎগুলো সম্পাদিকা সানন্দে লুফে নেন এবং বহু বহু গুণী এগুলোর সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। এ যেন হঠাৎ এক ঝলক গাঁয়ের মিঠে মেঠো হাওয়া নগরে ঢুকে শহরের নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বাতাসকে মোলায়েম করে দিল। এই চিত্রগুলো ঐ সময়ে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এর পরের ইতিহাস আমি সঠিক কালানুক্রমিক বলতে পারবো না। যতদূর মনে আছে তাই নিবেদন করি।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরি নিয়ে বাঙলাদেশে লিখে পাঠান, তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য যেন একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যে দীনেন্দ্রকুমারকেই পাঠানো হয় এর থেকেই আজকের দিনের পাঠক বুঝে যাবেন, সেদিন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন কতখানি উচ্চ ছিল। এবং হয়তো যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেন তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণটিও যেন খাঁটি ন'দের মিষ্টি উচ্চারণ হয়।[১]

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় খুব বেশীকাল থাকেননি।

১ "বরোদাতে বাঙালী" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যায়। ঔপন্যাসিক, বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নাতি সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরো উত্তম উত্তম বাঙালীকে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও কর্ম দেন।...এস্থলে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আমার আছে। আমার প্রতি দরদী পাঠক ভিন্ন অন্যেরা যেন বাকিটুকু না পড়েন। ১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন ঐ সয়াজী রাও আমাকে 'পাকড়্‌কে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন। মহারাজা একদিন আমাকে রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দের অনেক কাহিনী বলার পর আমি দুঃখ করে বলেছিলুম—"Your Highness! I am your latest and worst choice." মহারাজ তখন গুন গুন করে সেকালের একটি song-hit গান "you are not my first love, but you could be my last love!...এর

কারণ ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা, শ্রীঅরবিন্দ, অন্যতম বরোদাপ্রধান খাসে রাও যাদব এবং (বোধ হয়) দেশপাণ্ডের মধ্যে কি-সব গুপ্ত মন্ত্রণা হয়, সে-সম্বন্ধে আমি সঠিক জানি নে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু এ ভিন্ন কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার বাঙলায় ফিরে এলেন।

এর পর তাঁর জীবন-কাহিনী আমার কাছে আরো অস্পষ্ট।

তবে আমার মনে সন্দেহ হয়, এ-কালেও যখন বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে দগ্ধ-উদর-জ্বালা শান্ত করতে পারেনা[২], তা হলে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। তখন ১৯১৫, এ-রকম সময় দীনেন্দ্রকুমার গত্যন্তর না দেখে ডিটেক্টিভ স্টোরি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। তারই নাম "রহস্য লহরী"। সঠিক অনুবাদ বললে বোধ হয় একটু ভুল হয়। যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ বঙ্গোপযোগী বাঙালী ধরনধারণ ঢুকিয়ে দিতেন।

এই "রহস্য লহরী" এ-দেশে তখন যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তার বয়ান আজ দেবে কে? সাধুবাদ সহ বলি, "নোটবুক" তার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছেন।

কিছুদিন পরেই মহারাজ গত হন। এ-বাবদে শেষ কথা, ঐ সর্বগুণে গুণী মহারাজ ভারতের নানা জাতের ভিতর সব চেয়ে ভালোবাসতেন বাঙালীকে।

২ নবীনরা হয়তো জানেন না এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কি কি মনোবেদনা বাংলা এবং সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থকষ্টে যখন মাইকেল মারা যান তখন হেমচন্দ্র লেখেন :

"হায় মা ভারতী,
চিরদিন তোর কেন এ-কুখ্যাতি ভবে,
যে-জন সেবিবে ও-রাঙা চরণ সেই সে দরিদ্র হবে।"

এবং বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃতে বলেছেন,

"অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥"

অধমের তার অক্ষম অনুবাদ :

"ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
[illegible] মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে।"

কিন্তু এই উন্মাদনার প্রধান কারণ কি ?

আমি দৃঢ়প্রত্যয়, সত্যনিশ্চয় যে-ভাষাতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর "রহস্য লহরী" লিখলেন, ও-রকম ঝরঝরে, ছিমছাম সরল স্বচ্ছ শীতের নদীস্রোতের মতো শান্ত প্রবহমাণ বাংলা ভাষা এই দেড়শো বছরের ভিতর অতি অল্প লোকই লিখেছেন।

তা না হলে বলুন তো, বারো বছরের বাঙাল বালক তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা বিলাতের গল্প পড়ে অর্ধযামিনী অবধি বিনিদ্র অবস্থায় শিহরিত, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে রইল কেন ?

ভাষা, ভাষা, ভাষা ! ভাষা বহু তিলিসমাৎ, বহু মিরাকল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

দ্বন্দ্ব-পুরাণ

মহাপুরুষদের জীবনধারণ প্রণালী, তাঁদের কর্মকীর্তি এমন কি দৈবেসৈবে তাঁদের খামখেয়ালীর আচরণ দেখে তাঁদের শিষ্য-সহচর তথা সমকালীন সাধারণ জন আপন আপন গতানুগতিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কী করে একটা মানুষের পক্ষে এ-রকম কীর্তিকলাপ আদৌ সম্ভবে। এ-প্রহেলিকার সমাধান না করতে পেরে শেষটায় বলে, "ওঃ ! বুঝেছি। এঁরা অলৌকিক ঐশী শক্তি ধারণ করেন।" তখন আরম্ভ হয় এঁদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী বা লেজেণ্ড নির্মাণ। কোন্ পীর ধুলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিবর্তিত করতে পারতেন, কোন্ গুরু চেলাদের আবদার-খাঁইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে রাগের বশে এক কুষ্ঠরোগীকে পদাঘাত করা মাত্রই, তন্মুহূর্তেই, সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়—হরি হে তুমিই সত্য।

ফার্সী ভাষাতে তাই প্রবাদ আছে, "পীরেরা ওড়েন না, তাদের চেলারা ওঁদের ওড়ান" "পীরহা নমীপরন্দ, শাগির্দান উন্‌হারা মী পরানন্দ্"—অর্থাৎ "আমাদের পীর উড়তে পারেন। তবে কিনা সে অলৌকিক দৃশ্য সবাই দেখতে পায় না।"

অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এস্থলে লক্ষণীয় আপনার আমার মতো পাঁচু ভূতোকে নিয়ে কেউ ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র লেজেণ্ডও নির্মাণ করে না। করবার কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

তাই আশ্চর্য হলুম একটা ব্যাপার দেখে। কিছু দিন পূর্বে এই গৌড়ভূমির এক মহাপুরুষকে নিয়ে জনৈক সুপণ্ডিত গভীর গবেষণামূলক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য—থিসিস—ঐ মহাপুরুষকে নিয়ে যে-সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলো নিছক রূপকথা, সোজা বাংলায় গাঁজা-গুল; আসলে উনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা সাধারণ জনের একজন।

এ থিসিস ধোপে কতখানি টেকে কি না টেঁকে সেটা আমি বলতে পারব না —আমার পশ্চাদ্দেশে লোহার শিকলি দিয়ে টাইম বম বেঁধে দিলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্যও না (যদ্যপি পয়গম্বর সাহেব বলেছেন, "জান্ বাঁচানো ফর্জ।" নামাজ রোজার মতোই ফর্জ—অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য কর্ম, না করলে সখ্‌ৎ গুনাহ বা কঠিন পাপ হয়)!

তাই আমি ঐ লেখককে (তিনি যে সত্যই সুপণ্ডিত সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, কারণ আমি তাঁর একাধিক গভীর গবেষণাময় সুচিন্তিত পুস্তক পড়েছি) মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই। সেই আলোচ্য মহাপুরুষ যদি আসলে অতই সাদামাটা সাধারণ জন হন তবে তাঁর সম্বন্ধে অত লেজেণ্ড, অত অলৌকিক কাহিনী নির্মাণ করবার দায় পড়েছিল কোন্ গণ্ডমূর্খ-মণ্ডলীর উপর! লেজেণ্ডগুলো সত্য না মিথ্যা সে বিচারের গুরুভার বিধাতা এ হীনপ্রাণের স্কন্ধে রাখেননি। আমি শুধু জানি, সাধারণ জনকে দিয়ে মানুষ অলৌকিক কর্ম করায় না; যদি বা অতি, অতিশয় দৈবেসৈবে, দু-একজনকে নিয়ে লেজেণ্ড তৈরি করে, তবে প্রথম পরশুরামের "বিরিঞ্চি" স্মরণে এনে তারপর কাশীরামদাসের শরণ নিতে হয়;

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

তাবৎ লেজেণ্ডই যে নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গকারী অলৌকিক কর্ম, মিরাকল হবে, এমন কোনো খুদার কসম বা কালীর কিরে নেই। সাদামাটা, হার্মলেস লেজেণ্ড আজকের দিনেও নির্মিত হয়। পাঠক হয়তো প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু হয়, হয় এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে—অন্তত নব লেজেণ্ডের ফাউণ্ডেশন স্টোন পোঁতা হয়।

ঐ তো সেদিন পত্রান্তরে পড়লুম, জনৈক লেখক লিখেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চা পান করতেন না।" আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আমি তাঁকে বহু বহুবার চা খেতে দেখেছি, এ-দেশী চা, যাকে সচরাচর ব্ল্যাক টী বলা হয়, উত্তম গোত্রবর্ণের অর্থাৎ, উজ্জ্বল সোনালি রঙের চা হলে তারিফ করতে শুনেছি।

একবার চীন দেশ থেকে গ্রীন টী (যদিও গরম জলে ঢালার পর রঙ এর হয়ে যায় ফিকে লেমন ইয়োলো) আসে গুরুদেবের কাছে। সে-চায়ের শেষ পাতাটুকু পর্যন্ত তাঁকে সদ্ব্যবহার করতে দেখেছি।

তা হলে এ-লেজেণ্ডের মূল উৎস কোথায়? এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চা-বাগানের কুলীদের উপর বর্বর ইংরেজ ম্যানেজার (আই. সি. এস.-দের তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক ভাষায় বক্স-ওয়ালা—কারণ তারা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে) কী পৈশাচিক অত্যাচার করত সে-সংবাদ বাঙালী জনসাধারণের কানে এসে পৌঁছয়। তখন চায়ের নামকরণ হয় "কুলীর রক্ত" এবং অনেকেই এই "কুলীর রক্ত" চায়ের পাতা বাড়ি থেকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠান, কাউকে চা পান করতে দেখলে ঘৃণামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে সর্বজনসমক্ষে বলতেন, "লজ্জা করে না মশাই, কুলীর রক্ত পান করতে!" রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের খবর রাখতেন; বিশেষ করে যখন স্মরণে আনি, যে-স্বর্গত শশীন্দ্র সিংহ তাঁর সাপ্তাহিক ইংরেজী খবরের কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অকুতোভয়ে চা-বাগানের "টমকাকার কুটির" লিখে লিখে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন। অতএব আজ যিনি এক লেজেণ্ডের প্রথম চিড়িয়া ওড়ালেন যে রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, তিনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তখন আর পাঁচ জন সহানুভূতিশীল বাঙালীর মতো চা বয়কট করেছিলেন এবং জীবনে আর কখনো চা খাননি। বয়কট হয়তো তিনি করেছিলেন—কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা কিয়ৎকাল (এবং স্মরণে রাখা উচিত সে-যুগে চায়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না—বোধ হয় মোটামুটি গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ স্টীমার প্যাসেনজারদের মুফতে চা পান করান হত), কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আমি তাঁকে বহুবার চা পান করতে দেখেছি।[১] তবে চায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আসক্তি ছিল না।

১ ১৯২১-২২ রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন দেহলী বাড়ির উপরের তলায়, নিচের তলায় সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া নূতন বাড়ি হসটেল ঘর। সেখানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী ইত্যাদিরা বাস করতেন। শেষ কামরায় স্বর্গত অনাথনাথ বসু এবং আপনাদের স্নেহধন্য এ-অধম। সর্বশেষ কামরা রবীন্দ্রনাথের পেন্‌ট্রি রূপে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, কমলাদি (দিনুবাবুর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথের যে দৈনন্দিন আহার্য পানীয় পাঠাতেন সেগুলো প্রথম এ পেন্‌ট্রিতে জড়ো করে (চাকরের নাম ছিল সাধু;

প্রায়ই চা ছেড়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য অন্য কোনো পানীয়তে চলে যেতেন। গরমের দিন বিকালে চা বড় খেতেন না—বদলে খেতেন বেলের, তরমুজের শরবত (নিম পাতার "শরবতের" কথা সকলেই জানেন)। সকাল বিকেল ছাড়া অবেলায় টিপিকাল বাঙালীর মতো তাঁকে আমি কখনো বেমক্কা চা খেতে দেখিনি। এবং

বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।[২]

স্মরণে আনুন। অবশ্য চায়ের নেমন্তন্নে চা খেতেই হবে এমন আইন হিটলারও করেননি—যদ্যপি তিনি দিনে রাতে এণ্ডলেস (অসংখ্য, অন্তহীন) কাপ্‌স্ অব টী পান করতেন—অতিশয় হাল্কা, মিন-দুধ।

বস্তুত কী চা, কী মাছ-মাংস কোনো জিনিসেই রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ছিল না—যা-সামান্য ছিল সেটা মিষ্ট মিষ্টান্নের প্রতি। টোস্টের উপর প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি মধুর পলস্তরা পেতে জীবনের প্রায় শেষ বৎসর অবধি তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ঐ বস্তু খেয়েছেন।[৩] মিষ্টান্ন তো বটেই—বিশেষ করে নলেন

বনমালী পরে আসে) রবীন্দ্রনাথকে সার্ভ করা হত। ঐ ঘর পেরুবার সময় সব সময়ই চোখে পড়ত আহারাদি কি কি। আমার জানার কথা।

২ এই কবিতাটি নিয়ে আমার মনে ধন্দ আছে। এ দু-লাইন থেকে বোঝা যায় কবি ব্যস্ত, চায়ের নেমন্তন্নের জন্য এখনো সাজ করা হয়নি ; অথচ তার ঠিক ষোল লাইন পরেই বলেছেন, বিশেষ কারণে তিনি যে বৃদ্ধ নন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। (তখন তাঁর বয়েস ৬২) এবং বলেছেন,

"এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে ?"

এখন প্রশ্ন, কবি এই বললেন তিনি চায়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন এবং তার পরই নাকি ভোলা খাবার নিয়ে এসেছে! তবে কি লখনৌওলাদের মতো বাড়ি থেকে উত্তম রূপে খেয়ে নিয়ে দাওয়াতে যেতেন যাতে করে সেখানে খানদানী কায়দায় কম-সে-কম খাবেন। কিংবা ফরেসডাঙার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মতো—যেখানে নিমন্ত্রিত মাত্র ভোজ্যবস্তুর প্রতি নজর বুলিয়ে জলস্পর্শ না করে বাড়ি ফিরে যান। বিশ্বাস না হয়, অবধূত রচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়ে" মল্লিখিত মুখবন্ধে এ-বাবদে সবিস্তর বর্ণনা পড়ুন।

৩ সিলেট ও খাসিয়া সীমান্তে এক রকম অতুলনীয় মধু পাওয়া যায়।

গুড়ের সন্দেশ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো ভোজনবিলাসী আমি কমই দেখেছি। এবং প্রকৃত ভোজনবিলাসীর মতো পদের আধিক্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও পরিমাণে খেতেন কম—তাঁর সেই পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও তার সঙ্গে মানানসই দোহারা দেহ দিয়ে—প্রয়োজনের চেয়ে ঢের কম। ফরাসিতে বলতে গেলে তিনি ছিলেন গুর্‌মে (ভোজনবিলাসী, খুশখানেওলা); গুরমাঁ (পেটুক) বদনাম তাঁকে পওহারী বাবা (এই সাধুজী নাকি শুধুমাত্র পও=বাতাস খেয়ে প্রাণধারণ করতেন) পর্যন্ত দেবেন না।

লেজেণ্ড সম্বন্ধে এইবারে শেষ কথাটি বলে মূল বক্তব্যে যাব।

লেজেণ্ডের একটা বিশেষ সুস্পষ্ট লক্ষণ এই; দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গুণীজ্ঞানীরা যতই কট্টর কট্টর অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করুন না কেন যে বিশেষ কোনো একটা লেজেণ্ড সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তবুও তারা সে লেজেণ্ড আঁকড়ে ধরে থাকে। এখনো বিস্তর লোক বিশ্বাস করে পৃথিবীটা চেপ্টা; শ্মশানে ভূতপ্রেত, গোরস্তানে মামদো আছে; ইংরেজ বিশ্বাস করে সে পৃথিবীর—সরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট নেশন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-স্থলে আরো বলে নিই; মহাপুরুষদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তারাও তাদের সম্বন্ধে বিপরীত লেজেণ্ড তৈরি করে। যেমন খ্রীস্টবৈরী ইহুদিরা বলেছে প্রভু খ্রীস্ট ছিলেন মাতাল, তিনি শুঁড়িদের (পাব্‌লিকান্‌স) ইতরজনের সাহচর্যে উল্লাস বোধ করতেন, এবং নর্তকী বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না (মেরি ম্যাগডলীন)।

বাঙলাদেশে একটা দল আছে। সেটা কভু বা বর্ষার প্লাবনে দুর্বার গতিতে বন্যা জাগিয়ে জনপদভূমির সর্বনাশ করে যায় আর কভু বা, বৎসরের পর বৎসর ফল্গুধারা পারা অন্তঃসলিলা থাকে। এ-দল পর পর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করে উপস্থিত ফল্গু-পন্থানুযায়ী অন্তঃসলিলা। মোকা পেলে বুজ্‌বুজ্‌ করে বেরুতে চায়। এদের জন্ম নেবার

এ-মধু মৌমাছিরা সুদ্ধমাত্র কমলালেবুর ফুল থেকে সংগ্রহ করে (সিলেটি কমলালেবুও পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট এবং সবচেয়ে সুগন্ধী, যদিও জাফার নেবুর চেয়ে সাইজে ছোট)। ছুটিতে দেশে যাবার সময় গুরুদেব আমাকে বললেন, "পারিস যদি আমার জন্য কিছু কমলামধু নিয়ে আসিস।" আমি খুশি হয়ে বললুম, "নিশ্চয়ই আনব কিন্তু কাশ্মীরের পদ্মমধু কি এর চেয়ে আরো ভালো নয়?" গুরুদেব স্মিত হাস্য করলেন। ভাবখানা "কিসে আর কিসে।"

কারণ সম্বন্ধে এ-স্থলে আলোচনা করব না।

রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, এটা নিরীহ, হার্মলেস লেজেণ্ড। কিন্তু এই দল প্রচার করে যে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক অক্ষরও জানতেন না, তিনি ছিলেন সুরকানা, মামুলী রাগরাগিণী তিনি ঘুলিয়ে ফেলতেন এবং বিলিতি গাওনা-বাজনার প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ ভক্তি। তাই গোড়ার দিকে তাঁর গানের কথাতে সুর দিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে তাবৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ !!! এস্থলে পুনরায় বলতে হয়, হরি হে তুমিই সত্য।

দ্বিতীয় লেজেণ্ড : আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন রবিঠাকুর রচনা করেন রাজা পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে। এদের "যুক্তি" এই প্রকার :—

(১) জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা একজন রাজা (কারণ রাজাই তো জনগণের ভাগ্যনির্ণয় করেন)।

(২) পঞ্চম জর্জ রাজা।

অতএব জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা স্বয়ং পঞ্চম জর্জ।

কুয়োট এরাট ডেমনস্ট্রাণ্ডুম (Q. E. D.)। আমেন আমেন। সুশীল পাঠক, অবধারিত হোন, যে দল এ-লেজেণ্ডের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তারা সেটা সত্য জানা সত্ত্বেও সজ্ঞানেই করেছিল। এরা জ্ঞানপাপী। এবং এরা বিলক্ষণ অবগত ছিল, সমসাময়িক বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধেয় গুণীজ্ঞানীরা এই কিম্ভূত-কিমাকার থিয়োরীকে দলিলদস্তাবেজ, প্রমাণপত্র, সাক্ষীসাবুদ, যুক্তিতর্ক দ্বারা নস্যাৎ ধুলিসাৎ তো করবেনই, তদুপরি করলারি বা ফাউ হিসেবে আরো প্রমাণ করে দেবেন, এই বিষবৃক্ষ-রোপণকারীরা হস্তীমূর্খ রামপণ্টক (কণ্টক থেকে কাঁটা, পণ্টক থেকে পাঁঠা—জ্ঞানবৃদ্ধ রসসিদ্ধ সুনীতি উবাচ)। কিন্তু এ-দলের চর্ম কাজিরাঙার গণ্ডারবিনিন্দিত বর্মসম স্থূল। তাই আমার যখন একদা চর্মরোগ হয় তখন আমার সখা ও শিষ্য চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ—লি আমাকে সলা দেন, "আপনি পরনিন্দা আরম্ভ করুন। চামড়াটি গণ্ডারের মতো হয়ে যাবে। গণ্ডারের চর্মরোগ হয় না।"

তাই যখন অধুনা খবরের কাগজে দেখতে পাই শ্রীযুক্তা ইন্দিরাকে "জনগণমন অধিনায়িকা" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে তখন আমি রীতিমতো শঙ্কিত হই। আজ ইন্দিরা, কাল জ্যোতিবাবু, পরশু আপনার মতো নিরীহ পাঠককে হয়তো "জনগণমন-অধিনায়ক" বলে বসবে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের পর্যায়ে তুলে দেবে। কিন্তু এ পয়েণ্টটি থাক।

কিন্তু প্রশ্ন এই জাতীয় সঙ্গীতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পঞ্চম জর্জকে

শোনালে কি হিজ ম্যাজেস্টি আপ্যায়িত হতেন? মোটেই না।

আইস পাঠক! গানটি বিশ্লেষণ করহ।

"ভারতভাগ্যবিধাতা" যে তিনি, সে-কথা শুনে রাজা নিশ্চয়ই মনে মনে শুকনো হাসি হাসতেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি তাঁর মাতৃভূমি ইংলণ্ডেরও ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁর আপন ভাগ্যই নির্ণয় করেন তাঁর (হাঁ "তাঁরই"—মস্করা আর কারে কয়?) প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের চূড়োয় বসে। তিনি অবশ্য তখন জানতেন না যে তাঁর যুবরাজ রাজা হবার পর যখন এক এড়িকে (লগ্নচ্ছিন্ন = ডিভোর্সড্ = তালাকপ্রাপ্তা) বিয়ে করতে চাইবেন তখন তাঁর (!) প্রধান-মন্ত্রী তাঁকে কানটি ধরে দেশ থেকে বের করে দেবেন। এবং তাঁর নাতনী যখন রানী হবেন তখন তাঁর স্বামী রানা ("রাজা"র স্ত্রীলিঙ্গ "রানী" কিন্তু রানীর স্বামী যদি রাজা না হন তবে "রানী" শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ নির্মাণ করে "রানা" শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই রানী এলিজাবেথের স্বামী রাজা নন, তিনি রানা) ডূক অব্ এড্‌ন্‌বরা ভিখিরির টোল-খাওয়া মাখমের টিন হাতে করে পার্লামেণ্ট বাড়ির সামনে এসে হাঁকবেন "দুটো চাল পাই মা", আর গেরস্ত গিন্নী প্রধানমন্ত্রী বাড়ির দরজা এক বুড়ো আঙুল ফাঁক করে (অবশ্য অষ্টরম্ভা দেখিয়ে) বিরক্ত কণ্ঠে বলবেন "ঘরে চাল বাড়ন্ত"। প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হলে বলবেন, "ফিরি মাঙো"—অর্থাৎ "অন্য বাড়ি যাও"।

এর পর যখন অনুবাদক চারণ বলবে, "হুজুরকে 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা হয়েছে" তখন তিনি বহুযুগসঞ্চিত রাজগৌরব প্রসাদাৎ তাঁর ঠা ঠা করে অট্টহাস্য করার অদমনীয় উচ্ছৃঙ্খলাচরণ দমন করে মনে মনে মৃদু হাস্য করে বলবেন, "বটো! আমাদের নীতি আমাদের ধর্ম 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' 'দ্বিধা করে সিধা রাখো'। আর এ প্রাইজ ইডিয়ট বলে কি? আমি নাকি 'ঐক্যবিধায়ক'। হোলি জীজস!"

এর পর চারণ কাঁচুমাচু হয়ে বলবে, "হুজুর মধ্যিখানের প্যারা খুঁজে পাচ্ছি নে। দুসরা কপি এখ্‌খনি এল বলে। ইতিমধ্যে শেষ প্যারাটি অনুবাদ করি।" রাজা আন্‌মনে শুনতে শুনতে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবেন। "কি বললে? 'পূর্ব গিরিতে রবি উদিল'? রবি তো রবীনডর ন্যাট ট্যাগোর—ন্যাট নেটিভ?"

চারণ সভয়ে বলবে, "এজ্ঞে হ্যাঁ।" কারণ একথা তো বিলকুল খাঁটি যে রবি কবি পূর্বদেশে, প্রাচ্যে জন্মেছেন, "পূর্ব উদয়গিরিভালে" তিনি রাজটীকা।

রাজা জর্জ তো রেগে টঙ। "কী, কী-আস্পদ্দা। কাউকে যদি পূর্বদেশে, ভারতে উদয় হতেই হয় তবে সে হব আমি।" তারপর গরগর করে বলবেন,

ভাইসরয়টাকে বলো গে, পুবের মণিপুর পাহাড়ের উপর সিংহাসন যেন পাতা হয়। আমি যেখানে উদিত হব। আশ্চর্য, এত বড় একটা ফন্‌কৃশন ডংকিগুলো বেবাক ভুলে গেছে। চীফ অব্‌ প্রটোকল মাস্টার অব্‌ সেরিমনিজকে এক্ষুনি ডিসমিস করো।"

ইতিমধ্যে মিসিং দুই প্যারা এসে গেছে। অনুবাদক তো ভয়ে কাঁপছে। অনুবাদ করে কি প্রকারে? শেষটায় "ভয়ে না নির্ভয়ে" ইত্যাদি ফরমূলা কেতাদুরস্ত করে বললে, "হুজুর, কবি বলছে, আপনি 'চিরসারথি', আপনি শাঁখ বাজাচ্ছেন (হে চিরসারথি তব···শঙ্খধ্বনি বাজে)।"

রাজা তো রেগে টঙ। ক্রোধে জিঘাংসায় বেপথুমান হয়ে হুঙ্কারিলেন, "কি এত বড় বেআদবী, বেইজ্জতী বেত্তমিজী! এ তো 'লায়েসা মাজেস্টাস' (laesa majestas)। হিজ ম্যাজেস্টিকে অপমান। অবশ্য নেটিভটা লাতিন লায়েসা মাজেস্টাস জানে না। কিন্তু এটাও কি জানে না, এর চেয়ে শতাংশের একাংশ অপরাধ করেও, কোনো কোনো স্থলে না করেও ব্রিটিশ রাজে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁসি গেছে।

অসহ্য অসহ্য। আমাকে বলছে সারথি। মোটর ড্রাইভার। আমার বাবা এডওয়ার্ড যখন ইহজগতের স্বপ্নাতীত অকল্পনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রথম ডেমলার গাড়ি নিয়ে তাঁর কাজিন কাইজারকে বার্লিনে দেখতে যান তখন কাইজার বিস্ময়ে অভিভূত ছোট বাচ্চাটার মতো নাগাড়ে সাড়ে তেরো ঘণ্টা গাড়িটার পালিশের উপর হাত বুলিয়েছিলেন। বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা গাড়ির জন্য বারোটা ড্রাইভার। আর আজ আমাকে—রাজাকে—বলছে আমি মোটর ড্রাইভার, শোফার। আমার আস্তাবলে ক'শ ড্রাইভার আছে তার খবর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি পর্যন্ত জানে না। আর আমি নাকি—ওঃ!"

তারপর বিড়বিড় করে যেন আপন মনে বললেন, "আর বলছে কি, আমি নাকি 'চিরসারথি'। আমি চিরকাল ড্রাইভার থাকব। পার্মেনেণ্ট পোস্ট। আমার প্রমোশন তক হবে না। আমি এমনই নিষ্কর্মা চোতা রদ্দী ড্রাইভার! হোলি মৈরি—হ্যা নেটিভরা মাইরি বলে বটে—আমি যদি এ লোকটাকে আমার রোলসের চাকায় বেঁধে—না, আগে তো বলডুইনের এজাজৎ চাই। ড্যাম বলডুইন! আর আমি শাঁখ বাজাই। পণ্টনের বিউগলে ফুঁ দি। ছি ছি।"

চারণ আবার "সভয় নির্ভয়" করে নিয়ে বললে, "হুজুরকে বলেছে স্নেহময়ী মাতা।"

এবারে রাজা লম্ফ দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

সিংহাসনে কোচের মতো স্প্রিং থাকে না। থাকে পাতলা একখানি কুশন। কংগ্রেসের সম্মানিত সিডিশাস মেম্বার ভারতীয় ছারপোকার পাল সেখানে বাসা বেঁধে হুজুরের কোমলাঙ্গে তখন ব্যাংকুয়েট পরবের মাঝখানে।

কম্পিত কণ্ঠে রাজা বললেন, "আমি এখ্খুনি ফিরে যাচ্ছি দেশে। সব সইতে পারি। কিন্তু আমি মা, আমি স্ত্রীলোক! বুঝেছি লোকটার ইনসলেন্স। বলতে চায়, কূটনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য—raison d' etat—আমি মাগী হওয়া সত্ত্বেও মেকডনাল্ড বলডুইন আমাকে মদ্দার বেশে সাজিয়েছে। আমি আসলে মেনি, ওরা আমাকে পরিয়েছে হুলোর ছদ্মবেশ।"

কাঁপতে কাঁপতে রাজা কার্পেটে বসে পড়লেন। প্রায় কান্নার সুরে বললেন, "সেদিন শিকারের সময় এক নেটিভ শিকারী বলেছিল, এক আসামী নাকি দারোগাকে বলেছিল, 'হুজুর, আমার মা বাপ।' দারোগা নাকি বলেছিল, 'বাপ হতে পারি, কিন্তু আমাকে মা বলছিস কেন? আমি কি স্যারি (শাড়ি) পরি।' শিকারী আমাকে বলেছিল, 'হুজুর, আসামী যদি শুধু বাপ বলত তবে দারোগা ছেড়ে দিত। মা বলেছিল বলে সেশনে সোপর্দ করলে। ফাঁসি হল।'... দারোগাকে মেনি বলাতে সামান্য দারোগা ফাঁসিকাঠে চড়ালে। আর আমি ইংলণ্ডেশ্বর, অ্যাণ্ড অব্ দি ডমিনিয়নস বিওণ্ড দী সীজ, ডিফেণ্ডার অব ফেথ, এম্পারার অব ইণ্ডিয়া। আর এই শেষেরটা কী কাষ্ঠরসিকতা! আমি কি বকিংহম পেলেসে নিভৃতে পেটিকোট পরি, ঠোঁটে নখে আলতা মাখি। ওঃ! অসহ্য অসহ্য!"

তারপর রাজা কোর্ট-গেজেট প্রকাশ করলেন, ঐ নেটিভ টেগোরের গান আমার উদ্দেশে লেখা নয়।

তথাপি এ-লেখেও মরে না।

কিন্তু এ-কাহিনী এখানে বন্ধ করি। হালে বঙ্কিমচন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধে একটি রচনা হিন্দীতে অনুবাদিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীর আদালতে ডবল ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়েছে। বঙ্কিমবাবু নাকি বিস্তর ছুটোছুটি করেও একটা বটতলার চার-আনী মোক্তারও পাচ্ছেন না—অথচ একদা তিনি স্বয়ং দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাবৎ ছাতুখোর খোট্টা চুরনবেচনে-ওলাকে বংশধর লালাজী ব্যারিস্টার দারুণ চটিতং।...পাঠক, তিষ্ঠ ক্ষণকাল—টেলিফোন বাজছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম তাই। এক হিন্দীপ্রেমী সোল্লাসে জানালেন, আজ সকালে বঙ্কিমবাবুর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

আমার এ-লেখন হিন্দীতে অনূদিত হলে আমার নির্ঘাত ছ' মাসের ফাঁসি।

মে মাসের ২৯ তারিখ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গাঁধী শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলা বাহুল্য এই তাঁদের প্রথম পরিচয় নয়। গাঁধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন তখন তিনি প্রায় চার মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে ৬ই মার্চ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[৩] এর পর ১৯২১-এর পূর্বে উভয়ের আর কোনো মোলাকাত হয়েছিল কি না জানি নে তবে ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ গাঁধীজী জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। গাঁধীজীর উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছিলেন সেটা বন্ধ করা এবং কবি যেন সত্যাগ্রহকে অন্তত তাঁর আশীর্বাদটুকু জানান।[৪] বলা বাহুল্য, গাঁধীজী অকৃতকার্য হন। এই আলোচনা হয়েছিল রুদ্ধদ্বারে। কবি ও গাঁধীজী ছাড়া এ-আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র আর একজন—দীনবন্ধু এনড্রুজ। বস্তুত তিনিই এ-দুজনকে একত্র করেছিলেন; তাঁর আশা ছিল,

---

৩ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫) লিখেছেন: "দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার হইল (৬ই মার্চ ১৯১৮)।" পৃঃ ৩৭৭। এটা বোধহয় ছাপার ভুল। হবে ১৯১৫।

৪ রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (একুশ বছরের বড়) কিন্তু গোড়ার থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করে গাঁধীকে পত্র লেখেন। গান্ধীজীর ভক্তেরা, আশা করি অপরাধ নেবেন না, যদি বলি, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঙ্গে গান্ধীজীর খুব নিবিড় পরিচয় ছিল না। ওদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বশাস্ত্র তথা সর্বদর্শন বিশারদ। তাই গান্ধীজী খুব একটা বল পেয়েছিলেন যে তাঁর আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত এবং হিন্দু-ঐতিহ্যপন্থী। দ্বিজেন্দ্রনাথকে গাঁধী ডাকতেন "বড়দাদা" বলে। ১৬ই জুলাই (অর্থাৎ গাঁধী ভেটের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ১৯২১-এ) রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোমেরিকা ভ্রমণের পর আশ্রমে ঢুকেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা দেন—কারণ তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের বিরোধী কিন্তু অতিশয় নম্রতার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনার গোড়াপত্তন করতে দিলেন না। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

সামনাসামনি আলাপচারি হলে হয়তো দুজনের মতের মিল হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি এই দুই প্রখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৫]

এ মোলাকাৎ সম্বন্ধে একটি হাফ-লেজেণ্ড আছে। তবে সেটা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে। তিনি বললেন, "এত বড় জব্বর একটা পেল্লাই ব্যাপার এলাহি কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর আমরা দেখতে পাব না, শুনতে পাব না? আচ্ছা দেখি।" অর্থাৎ শব্দার্থেই তিনি দেখে নিলেন কীহোল দিয়ে, কি ভাবে দুই জাঁদরেল ও তাঁদের মধ্যিখানের সেতুবন্ধ এনড্রুজ আসন গ্রহণ করেছেন। বিচিত্রা বাড়িতে বিলিতি কেতায় কীহোল আছে কি না জানি নে; তবে হয়তো তিনজনের আসন নেওয়ার পর বাইরের থেকে দরজায় খিল দেওয়ার পূর্বে তিনি এক ঝলক দেখে নিয়েছিলেন। আপন বাড়িতে ফিরেই তিনি এঁকে ফেললেন একখানা বেশ বড় সাইজের গ্রুপ ছবি। মুখোমুখি হয়ে বসেছেন দু'জনা দু-প্রান্তে। তাঁদের বসার ধরন টিপিকাল—ঠিক এই ধরনেই তাঁরা আকছারই বসতেন। আর গাঁধীর পিছনে একপাশে বসেছেন এনড্রুজ। এর তিন মাসপরে বাৎসরিক কলাপ্রদর্শনীতে অবনবাবু ছবিখানি এক্সিবিট করলেন। দাম দেখে তো বিশ্বজনের চক্ষুস্থির। সেই আমলে—আবার বলছি সেই আমলে—পনেরো হাজার টাকা! কে একজন বললে, "দামটা বড্ড বেশী হয়ে গেল না?" অবনবাবু শেয়ানা বেনের মতো হেসে বললেন, "বা রে! আমি তো সস্তায় ছাড়ছি। এদের প্রত্যেকের দাম পাঁচ পাঁচ হাজারের চেয়ে ঢের ঢের বেশী নয় কি?" এ-ছবি যখন কেউ কিনলো না, তখন অবনবাবু বললেন, "এটা কাকে দেওয়া যায়? রবিকাকা হেথায়, গাঁধী হোথায়। তবে কিনা এনড্রুজের নিবাস বলতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা তো রবিকাকার ছায়াতেই। দু'জন যখন শান্তিনিকেতনে তখন এটা যাক ওখানকার কলাভবনে।" এ-ছবি অনেকেই নিশ্চয়ই কলাভবনে দেখেছেন—তবে দীর্ঘ ৪৮ বৎসর পর রঙ বড্ড ফিকে হয়ে গিয়েছে।

---

৫ এ-আলোচনার বিবরণী কখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে এনড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরে ঘরোয়া বৈঠকে আমাদের একটা প্রতিবেদন দেন কিন্তু আমাদের নোট নিতে মানা করেন। আমি ঘরে ফিরে যতখানি মনে ছিল গরমাগরম লিখে ফেলি। সে পাণ্ডুলিপি কাবুলে বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। তাতে করে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এ-আলোচনার সারাংশ না হোক বিষয়বস্তু পাঠক প্রাগুক্ত পুস্তকের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় পাবেন।

১৯২৫-এর ২৯ মে গাঁধীজী আবার রবীন্দ্রনাথকে স্বপক্ষে টানবার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন এবং দু'দিন সেখানে থাকেন। ইতিমধ্যে "শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে—বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন।" আবহাওয়া তাহলে অনুকূল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "তিনি (গাঁধী) শান্তিনিকেতনে আসিতেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত চরকা সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য। গাঁধীজী জানিতেন কবি তাঁহার সহিত চরকা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবুও বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে নিজের ঐকান্তিকতার বলে তিনি কবিকে তাঁহার পথে আনিতে পারিবেন। দুই দিন তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে, বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলিয়া রাখি, উভয়ের প্রীতি পূর্ববৎই অক্ষুন্ন রহিল।"*

২৯-এ মে গ্রীষ্মাবকাশের মাঝখানে পড়ে। আমি তখন দেশে, সিলেটে।

ফিরে এসে কি আলোচনা হয়েছিল সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কীর্তন শুনলুম। কিন্তু সে-সব রসকষহীন আলোচনা নিয়ে লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না। আমি বলতে চাই অন্য জিনিস।

ফিরে এসেই গেলুম আমার মুরুব্বী গাঙ্গুলীমশাইকে আদাব-তসলিমাৎ জানাতে। শুনেছি, ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বৌদির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর) আত্মীয় ছিলেন। গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। সে আমলে শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে যে পাকা দোতলা বাড়ি (এইটেই আশ্রমে মহর্ষি-নির্মিত প্রথম বাড়ি এবং বর্তমান বোধহয় বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের আস্তানা) সেইটেই ছিল গেস্ট হাউস। তারই নিচের তলায় একটি ছোট্ট কামরায় মিলিটারী বুট তথা হাফ মিলিটারী য়ুনিফর্ম পরিহিত, হীতলাল প্রভৃতি "দাসবংশ" কর্তৃক সমাদৃত হয়ে সাতিশয় ফিটফাট রূপে বিরাজ করতেন মহাপ্রতাপান্বিত মহারাজ প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বা "গাঙ্গুলীমশাই"। বিরাজ করতেন বললে বড্ডই অল্পোক্তি করা হয়—রামায়ণী ভাষায় বলতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গাঙ্গুলীমশাই ম্যানেজার পদে "প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে" অতিথিশালায় পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ তথা অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র থেকে রবিমন্ত্রিত "দেশ দেশ নন্দিত করি" ভেরীর আহ্বানে সমাগত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী অতিথি

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড: পৃঃ ১৬৪

সজ্জনকে যেন "প্রজাপালন করিতেন"। তাঁর দাপট তাঁর রওয়াবের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন লোক আশ্রমে সে-আমলে ছিলেন কমই। লোকে বলে, তিনি যখন গেস্ট হাউসে বসে "হীতলাল!" বলে হুঙ্কার ছাড়তেন তখন এক ফার্লঙ দূরের রতন কুটিতে প্রফেসর মার্ক কলিন্সের ছোকরা চাকর পঞ্চা আঁৎকে উঠত—তার পিলে চমকে উঠে এপেনডিক্সের সঙ্গে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হয়ে যেত।

গাঙ্গুলীমশাই ম্যাট্রিক অবধি উঠতে পেরেছিলেন কি না সেকথা বলতে পারি না। তাই পাঠক পেত্যয় যাবেন না যে এঁর আবাল্য অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র ব্যঙ্গসুনিপুণ অভূতপূর্ব সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সম্পাদক-মণ্ডলীর মুকুটমণি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক ইনটেলেকচুয়েল বা বুদ্ধিজীবী।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর, নিটোল পারফেক্ট "রাকোঁতর" স্টোরি-টেলার মজলিসতোড কেচ্ছাবলনেওলা এ-পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। রাকোঁতর হিসাবে ওসকার ওয়াইল্ড ছিলেন এ-কলার সম্রাট। সে-বাবদে যা-কিছু লেখা হয়েছে বিশেষ করে গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদক, ১৯৪৮-এ নোবেল প্রাইজ বিভূষিত আঁদ্রে জিদ (এই হালে, ২২শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী মহাড়ম্বরে ইয়োরোপে উদ্‌যাপিত হল, কিন্তু হায়, মৌলিক রচনার যে প্রখ্যাত লেখক আপন সৃজনকর্ম স্থগিত রেখে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন—তিনি অন্য কোনো মহান লেখকের রচনা অনুবাদ করে তাঁকে এভাবে সম্মানিত করেছেন বলে শুনিনি—যে আঁদ্রে জিদ ইয়োরোপে অজ্ঞাত বাঙালী নামক জাতের শ্রেষ্ঠ ধন ইয়োরোপের বিদগ্ধতম জাতের প্যারিস সমাজে প্রচার করলেন, তাঁকে এই উপলক্ষে কোনো বাঙালী স্মরণ করেছে বলে কানে আসেনি) তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ওয়াইল্ড সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে-সব পড়ার পর রাকোঁতর হিসেবে গাঙ্গুলীমশাইয়ের প্রতি আমার ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। বস্তুত আ লা রীডারস্ ডাইজেস্ট্ বলতে হলে ইনিই আমার মোস্ট্ অনফরগেটবল্ ক্যারেকটার। এঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার চালু ইডিয়ম, প্রবাদ এবং কলকাতার কক্‌নি শব্দ শিখেছি। আমার মতো তাঁর অন্য এক সমঝদার—সাপুড়ে সম্মোহিত সর্পের মতো মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা—ছিলেন 'আনন্দবাজার' গ্রুপের শ্রীযুত কানাইলাল সরকার। আমার কথা পেত্যয় না গেলে ওঁয়াকে শুধোবেন।

বলা বাহুল্য, বিলকুল বেফায়দা বেকার, আমি গাঙ্গুলীমশাইয়ের সে-বয়ানের বন্যা, টৈটম্বুর রসের ছিঁটেফোঁটাও এই হিম-শীতল, রসকষহীন সিসের ছাপা হরফে

প্রকাশ করতে পারব না। একমাত্র লোক যিনি পারতেন তিনি আমার রসের দুনিয়া-আখেরের পীরমুর্শীদ "পরশুরাম" রাজশেখর বসু।

আমি তাঁকে মায়ের দেওয়া এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট সিলেটি আনারসের মোরব্বা দিলে পর তিনি আমার ললাটে চুম্বন দিলেন, মস্তকাঘ্রাণ করলেন। বেলা তখন একটা। তিনি আহারাদি সমাপন করে খাটে শুয়ে আলবোলায় ফুরুৎ ফুরুৎ মন্দমধুর টান দিচ্ছিলেন। আমাকে আদর করার পর ফের লম্বা হয়ে শুয়ে নলটি তুলে নিলেন। চোখ দুটি বন্ধ করে, কবির ভাষায় "আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু" বললেন, "গেরো হে গেরো। এমন গেরো আমার পঞ্চাশ বচ্ছরের আয়ুতে কখনো আসেনি। পুলিসের সঙ্গে মারপিট করে অসহ্য মশার কামড়ের মধ্যিখানে তেরাত্তির হাজতে কাটিয়েছি, চন্নগর মাহেশের ফেস্তাতে যাবার পথে মাঝগঙ্গায় নৌকোডুবিতে হাবুডুবু খেয়েছি - জলে পড়লে আমি আবার নিরেট পাথরবাটি—থিয়েডারের এক হাফ-গেরস্ত মাগী আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল" ইত্যাকার বহুবিধ যাবতীয় ফাঁড়া-মুশকিল গেরো-গদীশ বয়ান করার পর বললেন, "ওসব লস্তি হে লস্তি। ওঃ! এ-গেরো যা গেল।"

আমি বললুম, "এ-আশ্রম তো শান্তির নিকেতন। এখানে আবার গেরো?"

গাঙ্গুলীমশাই নল ফেলে দিয়ে যুক্তকরে, মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, "তিনি পিরিলী[৬] বংশের প্রদীপ, আর সেই পিরিলী বংশের এ-অধম পিলসুজ-দেলকোর ছায়া। পাপ মুখে কি করে বলি, এখানেও মাঝে মাঝে অশান্তির উপদ্রব দেখা দেয়। কিন্তু বাবা, আমা হেন সামান্য প্রাণীকে বলির পাঁঠার মতো বেছে নেওয়া কেন?"

আমি হুঁকোর নলটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, "হুঁকোটা ল্যান, খুলে কন।"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "গাঁধী হে, গাঁধী! তোমরা মাকে মহাৎমা ঠহাৎমা বলো।" তারপর ফের যুক্তকরে বললেন, "তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা,

৬ পিরিলী খেতাবটি নাকি মুসলমান বাদশা ঠাকুর গোষ্ঠী এবং তাঁদের আত্মীয়দের দেন। কথাটা "পীর" এবং "আলী" শব্দের অশুদ্ধ সন্ধি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলুম তখন গুরুদেবের এক পিরিলী আত্মীয় ছোকরা আমাকে বলে, "ভাই তোর নাম মুজতবা আলী, আর আমার বংশের নাম পীর আলী। দুজনারই পদবী আলী। আর ঐ সিলেটী রাকেশ বলছিল তুই নাকি পীর বংশের ছেলেও বটিস। তবেই ত্যাখ, তুই আমার কাছের কুটুম।"

রক্ষে দাও মা এসব মহাৎমাদের লেক লজর থাকে।"

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, "গান্ধীজী তো অতিশয় নিরীহ, নিরুপদ্রবী, ভালো মানুষ। তিনি আপনার গেরো হতে যাবেন কেন?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে। তোমাকে তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

জানো তো বাপু, দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরা এখানে এলে আকছারই ওঠেন উত্তরায়ণে; বাস করেন হয় গুর্দেবের (প্রাচীন-পন্থীরা "গুরুদেব" না বলে বলতেন "গুর্দেব") পাশে, নয় রথীবাবুর ওখানে। আমি তো নিশ্চিন্দি মনে দিব্য গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উত্তরায়ণের নায়েব গোমস্তা চাকরবাকরদের দেখলেই মনে মনে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ভাবি, সব ব্যাটা বলির পাঁঠা। গাঁধী মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু মা কালীকেই কি তাঁর উদ্দেশে বলি দেওয়া পাঁঠা কেউ কখনো খেতে দেখেছ? গাঁধী খাবেন না, সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে চাকর নফরের বলি নির্ঘাত। তখন কেমন জানি, কিংবা জানি নে, একটা অহেতুক অজানা শঙ্কা আমার ব্রেন-বক্সের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমারই মুখে শোনা,

পাঁঠার বলি দেখে পাঁঠী নাচে।

(পাঁঠা বলে) 'ও পাঁঠী তোমার লাগি বীবীর শীরনী আছে॥'

আমি তখন পাঁঠীর মতো আপন মনে ফিক্‌ফিক্ হাসছি, বিলকুল খেয়াল নেই যে পীর বীবীর দর্গাতে পাঁঠা বলি হয় না, বলি হয় পাঁঠী, শীরনী চড়াবার জন্যে। সাদামাটা রাঢ়ীতে বলে, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে।'[৭] উত্তমরূপে প্রবাদটি হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই ছ্যাখ-তো-না-ছ্যাখ সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলাফরমান উপস্থিত। আমি কি তখন আর জানতুম যে এই ফরমান-পুষ্পগুচ্ছের ভিতর লুকিয়ে আছে গোখরোর বাচ্চা। আমি তো নাপাতে নাপাতে উত্তরায়ণ পৌঁছলুম। পকেট থেকে ডাস্টার বের করে বুটজোড়া পরিষ্কার করে খোলা দরজায় হাফ মিলিটারি মোলায়েম টোকা দিয়ে গুর্দেবের ঘরে ঢুকলুম।

গুর্দেব লেখা বন্ধ করে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'বসো

৭ শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে'র অত্যুত্তম "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থে আছে (নং ৪৯৯৯) "পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে মগধেশ্বরী আছে।" সুশীলবাবু এর টীকা লিখতে গিয়ে জে. ডি. এনডারসেন-এর উপর বরাত দিয়ে বলছেন, মগধেশ্বরীর পুজোতে চট্টগ্রামে পাঁঠী বলি দেওয়া হয়।

গাঙ্গুলী।' আমি সিভিলিয়ান কায়দায় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মিলিটারি কেতায় দাঁড়িয়েই রইলুম।

গুর্দেব অত্যন্ত প্রসন্ন বদনে আমাকে বললেন, 'যবে থেকে তুমি এখানে এসেছ, বুঝলে গাঙ্গুলী, আমার ঘাড় থেকে অন্তত একটা বোঝা নেমে গেছে, ভিজটারদের আরাম-আয়েসের জন্যে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। তুমি একাই একশ; সব সামলাতে পারো। আমি তো মনস্থির করে বসেছিলুম গান্ধীজীকে এই উত্তরায়ণেই গেস্ট-রুমে তুলব। কিন্তু আজ এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলুম, তিনি দুটি দিন এখানে নির্জনে শান্তিতে বাস করতে চান। তুমি তো জানো, আমার এখানে উদয়াস্ত ভিজটারের ভিড় লেগেই আছে। তাদের আনাগোনা, বারান্দায় চলাফেরা, আঙ্গিনায় হাঁকডাক গাঁধীর শান্তিভঙ্গ করবে। তাই স্থির করেছি, তোমার গেস্ট হাউসের দোতলাই তাঁর জন্য সবচেয়ে ভালো আবাস হবে; আর তুমি যা-তা ভিজটারকে ঠেকাতে যে কতখানি ওস্তাদ সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হাতে গাঁধীকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' "

গাঙ্গুলীমশাই সেই ফাঁসির হুকুমের স্মরণে একটুখানি কেঁপে উঠে কাঁপা গলায় বললেন, "বাব্বা! আমি আমার ঐ গেস্ট হাউস আস্তাবলে গাঁধীকে রাখব কি করে? একটা শোবার ঘরে আছে দু'খানা স্প্রিঙের খাট। সে এমনই স্প্রিং যে তার উপর রামমূর্তি সার্কাসের ফেদার-ওয়েট বামনাবতার শুলেও সে-স্প্রিং ক্যাঁচর-ম্যাঁচর করে মেঝের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের পাড়াতে এক পাদ্রী সাহেব লেকচার দিতে গিয়ে বলেন, "প্রফেট নোআর আমলে সর্ববিশ্বব্যাপী এক বিরাট বন্যা হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট তাবৎ প্রাণী, বৃক্ষ, তৈজস-পত্রাদি যাতে সেই বন্যায় লোপ না পায় তাই তিনি নোআকে আদেশ দেন, তিনি যেন একটা বিরাট নৌকা গড়ে তার উপর প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বীজ, এমন কি প্রত্যেক আসবাবপত্র জোড়ায় জোড়ায় হেপাজতীর সঙ্গে তুলে রাখেন।" গুরুগম্ভীর হয়ে এতখানি শাস্ত্রালোচনা করার পর গাঙ্গুলীমশাই ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জিরিয়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমার মনে রত্তিভর সন্দ নেই যে আমার গেস্ট হাউসের উপরের তলায় যে দুটি খাট আছে সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বময় ঘোরাঘুরি করে শেষটায় আশ্রয় পেল দেবেন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে। আফটার অল্ তিনি তো প্রফেট —নোআরই মতোন গত শতাব্দীর প্রফেট।"

এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন, গাঙ্গুলীমশাই ছেলেবেলা থেকেই সে-যুগের বিলিতি—এদেশে একদম বেখাপ্পা—ডবল খাট, ড্রেসিং টেবিল, এস্‌ক্রিতোয়ার,

বিদে, চায়না ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তাঁর ধনী ঠাকুদ্দা তাঁর ভিলাটি সাজিয়েছিলেন ন'সিকে বিলিতি কায়দায়—একমাত্র ডাব্‌ল সী টা ছিল ব্যত্যয়, নেটীভ স্টাইলে গোড়ালির উপর বসে কর্মটি সমাধান করতে হত। তা সে যাই হোক, গাঁধীজীর অভ্যর্থনার জন্য যেটুকু মিনিমামেস্ট দরকার সে তিনি পাবেন কোথায়, গাঙ্গুলীমশায়ের ভাষায় "আফটার অল লোকটা তো বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেছে।"

গাঙ্গুলীমশাই বলে যেতে লাগলেন, "গুর্দেব বোধ হয় আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভরসা দেবার জন্য বললেন, 'তোমার যা যা দরকার আমার এখান থেকে, রথী আর বউমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেয়ো।' আঃ! কথাটি শুনে পেরানটি জুড়িয়ে গেল। ওঁয়ার আছেটা কি? এ-রকম কম আসবাবপত্র নিয়ে তাঁর ক্রিচারস কম্ফর্ট পোষায় কি করে জানেন ব্রহ্মময়ী।[৮] অবশ্য রথীবাবুর বাড়িতে এটা-সেটা আছে, কিন্তু একটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো আর লাজারসের গুদোম ঘর নয় যে প্রত্যেক আইটেম্ দু'তিন দফে করে থাকবে। ও বাড়ি থেকে আমার যা দরকার—খাট সোফা কোচ, নূতন পর্দা, লেখা-পড়ার জন্য উত্তম টেবিল-চেয়ার, একটা পেনট্রির আসবাবপত্র যেখানে খাবার জড়ো করা হবে, ডাইনিং রুমের জন্য একটা সাইডবর্ড যেখানে পেনট্রি থেকে আসা খাবারের ডিশ ডিনার টেবিলে সার্ভ করার পূর্বে রাখা হয়, হল-মার্কওলা উত্তম রুপোর ছুরি-কাঁটা—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "অবাক করলেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি আমাকে সেই বুদ্দু স্নব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ফরাসী ভাষা জানে না; প্যারিসের রেস্তোরাঁয় তাই আঙুল দিয়ে মেনুতে দেখিয়ে দিলে প্রথম পদ। এল স্যুপ। এবার স্নব আঙুল দিলে মেনুর মধ্যিখানে। ভাবলে, মাছ-মাংস ঐ

৮ কথাটা খুবই সত্য। প্রাগুক্ত দেহলী বাড়িতে যখন কবি থাকতেন তখন দেখেছি তাঁর ছিল (১) দু'খানা তক্তপোশ জুড়ে একটি ফরাস—তার গদি কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু হয় কি না হয় (২) মেসে পড়াশোনার জন্য যে-রকম মিনিয়েচার টেবিল দেয় তারই এক প্রস্থ ও একখানা চেয়ার (৩) সামনের ন্যাড়া ছাতের উপর দু'-একখানা বেতের কুশনহীন চেয়ার এবং (৪) বোধ হয় উপাসনা করার জন্য একখানা হেল্যানো-হাতাহীন জলচৌকির মতো কাষ্ঠাসন। গোসল-খানায় কি কি মহামূল্যবান জিনিস ছিল দেখিনি, তবে এমনই একটা সঙ্কীর্ণ করিডরের মতো ফালি জায়গায় সেটা ছিল যে সেখানে নূরজাহানের হাম্মাম থাকার কথা নয়।

ধরনের কিছু একটা সলিড্ সাব্স্টেনশাল আসবে—ফরাসীতে যাকে বলে "পিয়েস দ্য রেজিস্তাঁস" অর্থাৎ যে বস্তু (পীস) আপনার ক্ষুধাকে মোক্ষম রেজিসটেন্স দেবে। ও হরি! ফের এল সুপ। খানাপীনা বাবদে হটেনটট গোত্রের ইংরেজ জানবে কি করে বিদগ্ধ ফরাসী জাত মেনুতে নিদেন ত্রিশ রকমের সুপ রাখে (হটেনটট গোরা বলে, উয়ি ঈট টু লিভ, আর বিদগ্ধ ফরাসী বলে, উয়ি লিভ টু ঈট)। এদিকে ইংরেজের রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে। পুডিং মুডিং-এর আশায় দেখালে সর্বশেষ আইটেম। এল টুথ পেক—খড়কে। বুঝুন ঠ্যালা। তরলতম দু-কিস্তি সুপ খেয়ে, 'পান করে' বললে সঠিকতর হয়, খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁটা! আপনি যে ইংরেজটাকেও হার মানাতে চললেন। করমচান্দের সুযোগ্য সন্তান মোহনদাস গাঁধী তো শুনি খান—বা পান করেন—প্যাজের শুরুয়া বা সুপ, সেও অতি হাল্কা আর বকরীর দুধ। ঐ দুই তরল দ্রব্য মুখে পৌঁছে দেবার জন্য আপনি ওঁকে হাতে তুলে দেবেন হামিলটন কোম্পানির হল-মার্কওলা রুপোর ছুরি আর কাঁটা! ভাগ্যিস আপনি চীনের ইম্পিরিয়াল পেলেস থেকে হীরে পান্না বসানো চপ স্টিক রেকুইজেশন করেননি।"

গাঙ্গুলীমশাই ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "তোমার যেমন আক্কেল। যে-ভিখিরি কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে ডাস্ট-বিন থেকে খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে অখাদ্য খায়, তাকে খেতে ডাকলে কি রাস্তা থেকে বাড়িতে একটা ডাস্ট-বিন তুলে এনে সেই ময়লার ভিতর সেই অখাদ্যই রাখো নাকি যেটা সে নিত্যি নিত্যি খায়? আর দু-তিনটে ঘেয়ো কুকুর লড়াই করার জন্য?

আরে বাপু, যার যা বেস্ট, মেহমানকে সেইটে দিতে হয়। আমি তাই দিন তিনেক উদয়াস্ত খেটে উপরের তলার তিনখানা ঘর সাজালুম। খুব যে মন্দ হল তা বলব না। অবশ্য দুর্গা নাম জপ এক সেকেণ্ডের তরেও কামাই দিইনি।

মহারাজ আসবার আগের দিন বেলা প্রায় দশটার সময়—গমি তখন নিদেন ১১২ ডিগ্রী—দেখি, কে যেন মিন ছাতায় রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে আসছে। কে? চোখ কচলে দেখি—সর্বনাশ—জাব্বাজোব্বা পরা গুর্দেব। প্রথমটায় ভেবেছিলুম মহর্ষিদেবের ছায়া-শরীর। জানো বোধহয়, অনেকেই জ্যোৎস্না রাতে দেখেছে, সাদা আলখাল্লা পরা তাঁর ছায়াকায়া মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁর মর্তের বাসভবন এই গেস্ট হাউসের দিকে আসছেন। এবারে বুঝি ঠা ঠা রোদ্দুরে। তবে ভরসা এই কাছে গেলেই উপে যাবেন।"

আমি বললুম, "যত সব গাঁজা। মহর্ষিদেব এ-মন্দির কখনো দেখেননি।

শুনেছি, মহর্ষির আদেশে হাভেল সাহেব না কে যেন আর অবন ঠাকুরে মিলে এটার প্ল্যান করেন। এটার প্রতি পরলোকে গিয়েও তাঁর মোহ থাকবে কেন?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "আমি তো পড়িমরি হয়ে ছুটলুম গুর্দেবের দিকে, রঙ-চটা বাঁশের ছাতাখানা নিয়ে। তিনি ছাতাখানা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখি গাঙ্গুলী, অতিথি সৎকারের কি ব্যবস্থা করেছ'।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্বাঙ্গে সভয় কম্পনের শিহরণ খেলে গেল—গুরুদেবের ঐ অত্যন্ত হার্মলেস ইচ্ছা প্রকাশের স্মরণে। বললেন, "সবাই আমাকে ভরসা দিয়েছিল, গাঁধী কিছুতেই গুর্দেবকে এ-বাড়িতে তকলীফ বরদাস্ত করে আসতে দেবেন না। তিনি যাবেন স্বয়ং—যতবার প্রয়োজন হয়—উত্তরায়ণে, যাত্রী যে-রকম ভক্তিভরে তীর্থস্থলে যায়। কাজেই গুর্দেব আমার জোড়াতালির ঘর-সাজানো দেখতে পাবেন না। এখন উপায়?—এক ঝটকায় মা কালীর ঘুষ ডবল করে দিলুম—দুটোর বদলে চারটে মোষ।

হায়, হায়, হায়। গেরো, গেরো, গেরো। গুর্দেব ঘরে ঢুকেই বললেন, 'এসব করেছ কি হে! সব যে বিলিতি মাল। ব্রাস রডওলা স্প্রিং খাট! সর্বনাশ। বের কর, বের কর টেনে। এখ্খুনি। আর লোক পাঠাও, দেরি করো না—অমুকের বাড়িতে। বিয়ের সময়ে সে পেয়েছিল চীনে মিস্ত্রীর হাতে খোদাই করা করা একখানা জবরদস্ত কাঠের পালঙ্ক। আনাও সেটা। আর এসব যে এক্কেবারে বিলিতি বেড্‌শীট, বালিশের ওয়াড়। তুমিই যাও, গাঙ্গুলী, হ্যাঁ তুমিই যাও, বৌমার কাছে। তাঁর গুদোমঘরে আমার একটা মস্ত বড় সিন্দুক আছে। তার ভিতর খদ্দরের সব জিনিস পাবে। আমি যখন গেলবার আহমদাবাদ গিয়েছিলুম তখন সবাই আমাকে চেপে ধরল খদ্দর পরার জন্য। আমি বললুম অত মোটা কাপড় আমার সয় না। তারা যেন চ্যালেন্‌জ্‌টা তুলে নিলে। ধুতি, পাঞ্জাবির অতি মিহিন কাপড় থেকে আরম্ভ করে বিছানার চাদর, ওয়াড়—এমন কি খদ্দরের মশারি। না হে না, তুমি ভাবছ ওর ভিতর মানুষ দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। মোটেই না। এমনই মিহিন যেন মসলিন। ভিতরে যে শুয়ে আছে তার দিকে বাইরের থেকে তাকালে মনে হয় মাঝখানে কোনো মশারি নেই।'

হঠাৎ কার্পেটের দিকে নজর যেতে ফের হুকুম, 'ফেলে দাও এটাও।' তারপর কি যেন ভাবতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিজলি বাতির বাল্‌ব। চিন্তিতভাবে যেন আপন মনে বল্লেন, 'এটাকে নিয়ে কি করা যায়?' আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, বউমার ওখানে যাবার সময় নন্দলাল আর

ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।' আমি সর্ব আদেশ তামিল করার সময় ভাবলুম, হনুমানজীকে কে বলে সরল? তিনি তাঁর মুনিবটিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। এখন বলছেন, 'লে আও বিশল্যকরণী'। আনা মাত্রই হয়তো ফের হুকুম—'ঐ য্-যা। বিবজ্রতারিণীর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। যাও তো বৎস পবননন্দন হনুমান পবনগতিতে। নিয়ে এসো ঐ বস্তুটি।' তখন ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে যাও ফের ঐ মোকামে। ক'বার যেতে আসতে হবে সে কি স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রই জানেন? অতএব নিয়ে চল সমূচা গন্ধমাদনটাকে। আর এ-স্থলে স্মরণ কর, আমাদের গুর্দেবের বাবামশাই কি করতেন? ঘড়ি ঘড়ি মত বদলাতেন বলে তাঁর খাস সহচর দু'দিন অন্তর অন্তর বিদেশ থেকে টেলি পাঠাতেন, 'বাবু চেন্‌জেস্ হিজ মাইণ্ড।' পুত্রে যে সেটা অর্সায়নি কি করে জানব? আমি নিয়ে চললুম গন্ধমাদন প্রমাণ সেই বিরাট সিন্দুকটাকে। আমার অবশ্য সুবিধে, আমাকে তো ওটা বইতে হবে না। বইবে ব্যাটা হীতলাল, কালো, ভোলা, বঙ্কা গয়রহ।

গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেখি, চীনা পালঙ্ক তখনো আসেনি। খবর পেলুম সক্কলের পয়লা এসে পৌঁচেছেন ঠানদি (৺ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী)। সেটা অতিশয় স্বাভাবিক। তাঁর নাম কিরণ। তাঁর টাট্টু ঘোড়ার মতো চলন দেখে ক্ষিতিবাবুই একদিন বলেছিলেন, 'সার্থক নাম কিরণ! কী-run দেখেছ?'

উপরে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। ঠানদি এবং জনা তিন-চার এক্সপার্ট মহিলা লেগে গেছেন ঠিক সেনট্রাল বাতিটার নিচে দুনিয়ার যত কঠিন কারুকার্য ভরা বিরাট গোল একটা আল্পনা আঁকতে। গুর্দেব এক কোণে চুপ করে বসে বসে সব দেখছেন। এমন সময় নন্দলাল এলেন। গুর্দেব তাঁকে বললেন, 'এক কাজ কর তো নন্দলাল। ঐ বাল্‌বটাকে আড়াল করতে হবে। তুমি এটার নিচে একটা পেতলের চেপ্টা ফ্লাওয়ার ভাজ্ ছাত থেকে সরু সরু চেন দিয়ে ঝুলিয়ে দাও তো। ঠিক মানানসই সাইজ ও শেপের ও-রকম একটা ভাজ্ বৌমার আছে। আর ভাজ্ ভর্তি করে দাও পদ্মফুল দিয়ে, কুঁড়িগুলো যেন গোল হয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দেয়। বিজলির আলো আসবে পদ্ম পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে। কি বললে? পদ্ম নাও পাওয়া যেতে পারে! নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু দূরে লোক পাঠালেই হবে। নইলে মানানসই অন্য ফুল।' নন্দলাল মাথা নেড়ে জানালেন হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সেই মানওয়ারি জাহাজ সাইজের পালঙ্ক এল।

আমি এ-কাপড়, ও-শীট দেখাই। তিনি নামঞ্জুর করেন। শেষটায় না

পেরে বললুম, 'সিন্দুকটা নিচে রয়েছে। উপরে নিয়ে আসব কি?' এক ঝলক হেসে বললেন, 'না, আমি নিচে যাচ্ছি।' সেখানে চেয়ারে বসে শেষ রুমাল অবধি নেড়ে-চেড়ে পরখ করলেন, বাছাই করলেন। তারপর ফের উপরে এসে চেয়ারে বসে বিছানা তৈরী করা বাবদে পই পই করে বাৎলালেন, কোন শীটটা উপরে যাবে, কোন্‌টা নিচে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো মেলা মেলা বায়নাক্কা ঝামেলা। জলের কুঁজোটা কোথায় থাকবে, নাইট-টেবিলের পাশে ছোট্ট শেলফে কি কি বই থাকবে—সে সব কথা বলতে গেলে বাকি দিনটা, চাই কি রাতটাও কাবার হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে সারি। হঠাৎ বললেন, 'চল গাঙ্গুলী, স্নানের ঘর দেখে আসি।' ঢুকেই বললেন, 'এ কী কাণ্ড! সরাও এখখুনি ঐ জিনক্ টাব্‌টা। নিয়ে এস আমার স্নানের ঘর থেকে পেতলের বড় গামলাটা। আর ওখানেই একটা বোয়ামে আছে বেসন। নিয়ে এসো একটা রুপোর কৌটোতে করে। সাবানটা সরাও।' আমি বললুম, 'ওটা গডরেজের ভেজিটেবল সোপ।' 'তা হোক। ফেলে দাও ওটা। আর ঐ টার্কিশ টাওয়েলটাও সরাও। সিন্দুক থেকে নিয়ে এস খদ্দরের তোয়ালে, আর একখানা সব চেয়ে সরেস গামছা। নিমের দাঁতন কই?' আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'ওঁর তো দাঁত নেই, আর্টিফিসিয়াল আছে কি না জানি নে।' 'তা হোক, নিয়ে এস দাঁতন। আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে বলো, আজই যেন সুপুরি পুড়িয়ে—বাকি সব তিনি জানেন—টুথ পাউডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে।' বুঝলুম, কোনো নবীন দশনসংস্কারচূর্ণ—ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী বদ্যি-গিন্নী তো।

করে করে সব কটা ঘর তৈরি হল। সেই ১১৪ গরমে আর ক্লান্তিতে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বৃদ্ধ প্রভু কিন্তু খুট খুট করে দিব্য এ-ঘর ও-ঘর করছেন।'

দম নিয়ে গাঙ্গলীমশাই বিরাট এক তাওয়া সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার প্রাণ যা চায় সেই দিব্যি, কসম, কিরে আমাকে কাটতে বললে আমি এখখুনি সেইটে কেটে বলব আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস কোনো বধু তার বরের জন্য, কোনো প্রেমিক তার প্রিয়ার জন্য কস্মিনকালেও এ-রকম বাসরঘর মিলনশয্যা তৈরি করেনি। আর গুর্দেবও এ-কর্ম পূর্বে কখনো করেননি সে-বিষয়ে আমি আদালতে তিন সত্যির দোহাই দিয়ে কসম খেতে রাজি আছি।

আরেকটা কথা শোন, সৈয়দ। গুর্দেবের মতো স্পর্শকাতর, সুন্দরের পূজারী যখন সব হৃদয় ঢেলে দিয়ে কোনো কিছু সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান—এই যেমন এ-বাড়িটাকে তার চরম সুন্দর রূপ দেওয়া—তখন তাঁর হাজার মাইল কাছেও

আসতে পারে কোন্ প্রফেশনাল ডেকোরেটরের গোসাঁই!

আর সমস্ত জিনিসটা ছিল অত্যন্ত সিম্‌পল অথচ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে উথলে উঠছিল সৌন্দর্য।"

আমি শুধালুম, "তারপর?"

গাঙ্গুলীমশাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "এখানেই কাহিনীটি শেষ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তুমি যখন আদ্যন্ত শুনতে চাও তবে কি আর করি? বলি।

গাঁধীজীকে উপরের তলায় নিয়ে গেলেন স্বয়ং গুর্দেব। আমি তাঁর ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে,—যদি বা কোনো কিছুর দরকার হয়। তাই সব দেখেছিলুম, সব শুনেছিলুম। দুই হিমালয়ের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে গভীরতম প্রীতি—এমন কি সংঘাত। সেই মোকা ছাড়ব আমি! হেঁঃ!

বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, গাঁধী যেন দু'চারটে জিনিস দেখলেন, কিন্তু কোনো কিছুই লক্ষ্য করলেন না। আল্পনা, মাথার উপরে ফুলের ডালি, তাজমহলের মতো খাটবিছানা, বেডকাভারের ঠিক মাঝখানে বাতিকে কাজ করা নিটোল গোল মেডালিয়নের ভিতর সেই অজন্তার ছবি, যেখানে একটি তরুণী দু'ভাঁজ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রভু বুদ্ধের পদতলে পদ্মফুলের অঞ্জলি দিচ্ছে।

কোনো-কিছুই যেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

তারপর তিনি আস্তে আস্তে উত্তরের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি যেন মন্দির পেরিয়ে টাটা বিলডিং ছাড়িয়ে কোন্ সুদূরে চলে গেছে। হঠাৎ গুর্দেবের দিকে ফিরে বললেন, 'এরই কাছে ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে না? চলুন।' ছাতে গিয়ে দু'জনাতে অল্প একটু পাইচারি করার পর গাঁধী একগাল হেসে বললেন, 'আমি এই ছাতেই বাসা বাঁধব। ভারী চমৎকার!"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "তার মানে?"

"মানে আর কি? পড়ে রইল সব নিচে। আমি তাঁকে ককখনো ঐ বেড-রুমের একটিমাত্র জিনিসও ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য এ কথা ঠিক, যে দুটি দিন এখানে ছিলেন তার অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন উত্তরায়ণে, গুর্দেবের সঙ্গে আর বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) সান্নিধ্যে। বড়বাবুর কাছ থেকে বুড়ো ফির-ছিলেন হাসিখুশি ভরা ডগমগ মুখে, আর গুর্দেবের কাছ থেকে চিন্তাকুল বদনে। রাত্রি কাটাতেন ছাতে।" গাঙ্গুলীমশাই থামলেন।

অনেকক্ষণ গভীর চিন্তা করার পর বললেন, "আমি পলিটিক্স এক বর্ণও

বুঝি নে। গাঁধীর লেখা এক ছত্রও পড়িনি আর গুর্দেবের সামান্য যে-টুকু পড়েছি সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই। তবু বলি, এবারও গাঁধী-গুর্দেবে মনের মিল হল না। কিন্তু আমার মনে হয় এবারেই ছিল বেস্ট চান্‌স্। আমার মনে হয়, গাঁধী যদি ঐ আল্পনা, পদ্মফুলের আলো এবং গুর্দেবের আরো পাঁচটা সযত্নে সাজানো নেড়ে-চেড়ে দেখতেন, একটুখানি কদর দেখাতেন তাহলে গুর্দেবের দিলটা একটু মোলায়েম হত। লোকে বলে গাঁধী সত্যের পূজারী আর গুর্দেব নাকি সুন্দরের পূজারী! কিন্তু গুর্দেব যে সত্যেরও পূজারী সেও তো জানা কথা। গাঁধীও নিশ্চয়ই সুন্দর জিনিস ভালোবাসেন—কে বাসে না, কও! কিন্তু তার কোনো লক্ষণ আমার পাপ চোখে পড়েনি। তাই আমার মনে হয় গাঁধী যদি তাঁর জন্য সাজানো ঘরটাকে একটু পূজো করতেন—মানে একটু আদর করতেন—তা হলে গুর্দেব ভাবতেন, 'এ-লোকটা ভিতরে ভিতরে সুন্দরেরও পূজা করে। আমার বংশের না হোক আমার গোত্রেরই লোক।' তাই হয় তো একটা সমঝাওতা হয়ে যেত।

আবার দেখ, গাঁধীজী তাঁর সত্য-উপলব্ধির প্রতীক চরকা সবাইকে বিলোচ্ছেন। আমরা হাত পেতে নিচ্ছি কিন্তু আমরা কোনো প্রতিদান দিচ্ছি নে —কারণ আমাদের মতো সাধারণ লোকের কীই বা আছে যে তাঁকে দেব? কিন্তু গুর্দেবের বেলা তো সে-কথা নয়। তিনি সুন্দরের পূজা করে অনেক-কিছু পেয়েছেন। কই, গাঁধী তো তাঁর কাছ থেকে নিলেন না! এমন কি এই যে সামান্য সাজানো কামরা কটি—তার ফুল, কিছু আল্পনা কোনো-কিছুই লক্ষ্য করলেন না—গ্রহণ করলেন না।

তাই বলি, সৈয়দ, সংসারটা চলে গিভ অ্যান্‌ড্ টেকের উপর।"

উপসংহারে নিবেদন, বলা বাহুল্য, গুরুদেবকে দিয়ে যে আমি উত্তম পুরুষে কথা বলিয়েছি তার অধিকাংশই আমার কল্পনাপ্রসূত। কারণ যদিও গাঙ্গুলীমশাই গুরুদেবের কথাবার্তার চোদ্দ আনা আমাকে সে-সময়ে ঠিক ঠিকই বলেছিলেন তবু ভুললে চলবে না, পূর্বেই নিবেদন করেছি, গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন পয়লা নম্বরী কীর্তনিয়া—রাকোঁতর। নিশ্চয়ই তাঁর বর্ণনায় বেশ খানিকটে রঙচঙ চড়িয়ে ছিলেন—ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

তদুপরি তিনি আমাকে কাহিনীটি বলেন, ১৯২৫-এ। আর আমি এ-কাহিনী লিখছি ১৯৬৯-এ!! কিন্তু মূল ঘটনাগুলো যে সত্য তার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি (কারণ এ-ঘটনা পরে আরেকবার ঘটে—তবে সেখানে পাত্র গাঁধী ও মুসসোলিনির

প্রতিভূ এক জাহাজ-কাপ্তান)।

অবশ্য আমি দুই লাইনেই এ-কাহিনী শেষ করতে পারতুম। যথা :

"গুরুদেব অতিশয় সযত্নে ঘর সাজালেন। তার সৌন্দর্য গাঁধীজীর চোখে পড়ল না।" কিন্তু তাহলে তো লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না—"রবিপুরাণ" দ্বন্দ্বকাহিনী নির্মিত হয় না।

আরেকটি কথা বলার খুব যে একটা প্রয়োজন আছে তা নয়। তবু বলি। সুচতুর পাঠক অতি অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন, গুরুদেবের মুখে আমি যে ভাষা বসিয়েছি, অতি অবশ্যই গুরুদেব ও-রকম কাঁচা বাংলা বলতেন না। এবং সহৃদয় পাঠক বুঝে গিয়েছেন বলেই আমাকে মাফও করে দিয়েছেন। প্রবাদ আছে—"টু আন্‌ডারস্টেণ্ড ইজ টু ফরগিভ্"।

এবং গাঙ্গুলীমশাইয়ের ভাষারও জেল্লাই জৌলুস জ্যান্ত জিন্দা করতে পারিনি আমি—দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর।

সর্বশেষে বক্তব্য এটা লেজেণ্ড, রূপকথা, পুরাণ। ইতিহাস নয়।

"দ্বন্দ্বপুরাণ" উপরেই শেষ হল। কিন্তু গাঁধী-পুরাণের অন্য এক কাহিনীর ইঙ্গিত আমি এই মাত্র দিয়েছি। সেটি বলিনি। সেও মজাদার।

দ্বন্দ্বপুরাণের ছ'বছর পরের ঘটনা। ১৯৩১, রাউণ্ড-টেবিল সেরে গাঁধীজী দেশে ফেরার জন্য বেছে নিলেন একখানা ইতালীয় জাহাজ। ইল্ দুচে বেনিতো মুসসোলিনি তো ড্যাম্ গ্ল্যাড্। (ওদিকে জর্মন জাত বড় নিরাশ হয়েছিল। গাঁধী বলেছিলেন, রাউণ্ড-টেবিলে তিনি যদি সফলতা লাভ করেন তবে ইয়োরোপে যে একটি মাত্র জায়গা দেখার তাঁর ঐকান্তিক কামনা আছে সেটিকে তিনি তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে ফিরবেন—ভাইমার, কবি গ্যোটের লীলাভূমি ও সমাধিস্থল। কিন্তু গোলটেবিলে নিষ্ফল হলেন বলে সোজা দেশে ফেরেন।) মুসসোলিনি খবর পাওয়া মাত্র বললেন, "যে জাহাজে গাঁধী যাবেন সেটা অত্যুত্তম, কিন্তু তার সেরার সেরা 'কাবিনা লুস্‌সোরীয়োজা' (সাধু সাবধান!—ইতালীয় ভাষার সঙ্গে আমার অতি সামান্য নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পরিচয়—ভুল হতে পারে। অর্থ হচ্ছে কাবিন দ্য ল্যুক্স্, লাকশারি কেবিন, সব চেয়ে আক্রা ভাড়ার বিলাস কেবিন) নিশ্চয়ই রাজা মহারাজা ফিল্মস্টারের পক্ষে যথেষ্টরও বেশী, কিন্তু গাঁধী?" এখানে এসে তিনি যে অলঙ্কার ব্যবহার করলেন তার ইংরেজি আছে—"গাঁধী? হি ইজ নট এভরিবডিজ কাপ অব্ টী"—বাংলাতে মেরেকেটে বলা যেতে পারে, "ভিন্ন গোয়ালের একক গোমাতা, মা-

ভগবতী" কিংবা আমরা যে-রকম বলি "কানু ছাড়া গীত নেই", তার সঙ্গে মিলিয়ে "গাঁধী ছাড়া নর নেই।" আরবরা বলে, "গাঁধী মহারাজের কাহিনী সব কাহিনীর মহারাজা।" তার পর হুকুম দিলেন, "গাঁধীকে সবসে বঢ়িয়া কেবিন দাও—একটা না, সুইট অব কেবিন্‌স্‌। বেডরুম, ড্রইংরুম, এণ্টিরুম (ভিজিটারদের জন্য প্রতীক্ষা-গৃহ), আপন খাস ডাইনিং রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষপতিদের বুকিং কেনসেল করে। আর তোমাদের দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিনের সোফা কোচ বিছানা বাথরুম লক্ষপতিদের জন্য গুড ইনাফ, মলটো বুয়োনো (ভেরি গুড্‌) কিন্তু গাঁধীর জন্য নয়। পালাদসো ভেনেদসিয়া (ভেনিস পেলেস—ইটালীর প্রায় সর্বোত্তম প্রাসাদ) থেকে তাবৎ ফার্নিচার পাঠাও।" সর্বশেষে বললেন, "ঔর অচ্ছী অচ্ছী তাগড়ী বকরী, দুধকে লীয়ে।" এই ফার্নিচার পাঠানোর পিছনে হয়তো বা কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। এখানে আবার গুরুদেব প্রধান পাত্র।

যাঁরা কবিগুরুর মৃত্যুর পর তাঁর বধূমাতা স্বর্গীয় প্রতিমা দেবীর "নির্বাণ" পুস্তিকা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, অসুস্থাবস্থায় তিনি কিছুদিন কাটান তাঁর এক প্রিয়া শিষ্যার বাড়িতে, দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটিনায়। এঁর নাম ভিকতরিয়া (অর্থাৎ "বিজয়া" এবং কবি দেশে ফিরে এঁকেই তাঁর পরের গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। কবির সঙ্গে তোলা এঁর ছবি পাঠক পাবেন "পূরবী" কাব্যে, বিশ্বভারতী সংস্করণ "রবীন্দ্ররচনাবলী" চতুর্দশ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠার মুখোমুখি। এঁকে উদ্দেশ করে কবি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন। "পূরবী"তে "বিদেশী ফুল" "অতিথি" ও অন্যান্য কবিতা দ্রষ্টব্য) ও-কাম্পো। কবি দেশে ফেরেন ইটালিয়ান "জুলিয়ো চেজারে" (জুলিয়াস সীজারের ইতালীয় উচ্চারণ) জাহাজে করে। জাহাজে বিদায় দিতে এসে ভিকতরিয়া দেখেন (পূরবীর "বদল" ও গীতবিতানের "তার হাতে ছিল" গান দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য) যে, যদিও কবিকে সর্বোত্তম দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিন দেওয়া হয়েছে তবু সদ্য রোগমুক্ত জনের জন্য হেলান দিয়ে বসার আরাম-কেদারা সেখানে নেই। তিনি তদ্দণ্ডেই লোক পাঠালেন বাড়িতে; সে আরাম কেদারায় অসুস্থ কবি বসতে ভালোবাসতেন সেইটে নিয়ে আসতে। বিরাট সে কেদারা, তাই কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে না। ভিকতরিয়া ডেকে পাঠালেন জাহাজের কাপ্তানকে। বিরাট জাহাজের কাপতেন হেজিপেজি লোক নয়—তাকে "ডেকে পাঠানো" যে সে লোকের কর্ম নয়। তাই এস্থলে বলে রাখা ভালো, তাঁর অর্থসম্পত্তি ছিল প্রচুরতম এবং তাবৎ আর্জেনটাইনের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তাঁর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারিত। তিনি সুসাহিত্যিকা, প্রভাবশালী মাসিকের সম্পাদিকা এবং পরবর্তীকালে তিনি ইউনাইটেড নেশনসের

একাধিক বিভাগে তাঁর দেশের প্রতিভূ হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। "টাইম" সাপ্তাহিকে আমি সে-বিবরণী পড়েছি ও তাঁর ছবি সেখানে দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আরজেনটাইন-ডাকবিভাগ কবির ছবিসহ বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করে ভিকতরিয়ারই জোরদার প্রস্তাবে। এবং তিনি নির্দেশ দেন, ডাকবিভাগ যেন কবির কোন্ ছবি ছাপা হবে তাই নিয়ে মাথা না ঘামায়। ভারত যে-ছবি ছাপাবে সেটা তিনি কবিপুত্রের কাছ থেকে আনিয়ে ডাকবিভাগকে দেবেন। ডাকবিভাগ মাতার সুপুত্রের মতো তাবৎ নির্দেশ মেনে নেয়। ঐ স্ট্যাম্প খামে সেঁটে ভিকতরিয়া কবিপুত্রকে একখানা চিঠি লেখেন; আমি সেটি দেখেছি। যা বলছিলুম: কাপতানকে ভিকতরিয়া হুকুম দিলে কেবিনের দরজা কেটে কেদারা ঢোকাও।* বলে কি? ত্য ল্যাক্স কেবিনের দেয়াল বরাত দিয়ে কেটে তার অঙ্গহানি করা! কাপতান গাঁইগুঁই করছে দেখে জাতে দজ্জাল সেই স্পেনিশ রমণী আরম্ভ করলেন ভৎর্সনা, অভিসম্পাত, কাপতানের আসন্ন পতনের ভবিষ্যদ্বাণী—মুষলধারার বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করতে। এ-ঘটনা স্বয়ং কবি কনফার্ম করেছেন। তিনি পুরো ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে এস্থলে বলেন, "আমি স্পেনিশ ভাষা জানি নে। কিন্তু ভিকতরিয়ার সেই জ্বালাময়ী ভাষার কটুবাক্যের রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধা হয়নি।"

কাপতান পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বংশরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেয়।

হয়তো এ-ঘটনা মুসসোলিনির কানে পৌছয়। হয়তো তাই এ-ঘটনার ছ' বছর পর গাঁধীজী যখন তাঁর জাহাজে চড়লেন তখন তিনি পালাদসো ভেনেদসিয়া থেকে সেরা সেরা আসবাবপত্র পাঠান।

যে-জাহাজ করে গাঁধী দেশে ফেরেন তার এক ইতালীয় স্টুয়ার্ড আমাকে এ-কাহিনীটি বলে। আমি তার সবিস্তর বর্ণনা আমার "বড়বাবু" গ্রন্থে "গান্ধীজীর দেশে ফেরা" নাম দিয়ে লিখেছি। এস্থলে সংক্ষেপে সারি।

গাঁধীজী জাহাজে উঠলেন। ভয়ে আধমরা (কারণ নির্মম ডিক্টেটর

---

* এ-কেদারার শেষ ইতিহাস পাঠক পাবেন, কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "শেষলেখা"তে। এ ঘটনার দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে, কবি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে রোগশয্যায় সেই কেদারখানা খুঁজে নিয়ে (ছাপাতে আছে "খুঁজে দেব"—হবে "খুঁজে নেব") তার উদ্দেশে একটি মধুর কবিতা লেখেন। "শেষলেখা" কাব্যের ৫নং কবিতা পশ্য।

মুসসোলিনির কানে যদি খবর পৌঁছয়—গুজোব হোক আর না-ই হোক, লেজেণ্ড হোক আর সত্য ইতিহাসই হোক—যে গাঁধীর পরিচর্যায় ত্রুটি-জখম ছিল তা হলে বারোটা রাইফেলের গুলি খেয়ে তাঁকে যে ওপারে যেতে হবে সে-বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয়) তথাপি সগর্বে সদম্ভে গাঁধীজীকে দেখালেন তাঁর জন্য স্পেশালি রিজার্ভড্ প্রাসাদসজ্জায় গৌরবদীপ্ত আরাম-আয়েসের ইন্দ্রপুরী সদৃশ কেবিনগুলো। গাঁধীজীর অনুরোধে তারপর তিনি তাঁকে দেখালেন বাদবাকী তাবৎ জাহাজ।

সর্বশেষে গাঁধী শুধোলেন, সব চেয়ে উপরের খোলা ডেক-এ (ছাতে) যাওয়া যায় কি না ?

কাপ্তান সানন্দে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিরাট বিস্তীর্ণ ডেক।

গাঁধী বললেন, "আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করব।"

কাপ্তান বদ্ধ পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোঙরাতে গোঙরাতে বলল, "অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভূমধ্যসাগরে রাত্রে তাপমাত্রা নামবে শূন্যে। সুয়েজ খাল আর লোহিত সাগরে দুপুরের গরমী উঠবে ১১৪ তক্। এমন কর্ম থেকে আপনাকে ঈশ্বর রক্ষতু।"

গাঁধী ঝাড়া তেরোটি দিনরাত্রি কাটিয়েছিলেন উপরে। প্রতি সকালে মাত্র একবার নেমে আসতেন নিচে। প্রার্থনা করতে। সর্বশ্রেণীর প্যাসেনজার নিমন্ত্রিত হতেন। শুনেছি খালাসীরাও বাদ যায়নি।

কিন্তু গাঁধীজীর এই দুই প্রত্যাখ্যানের ভিতর অতলস্পর্শী পাতাল এবং গগন-চুম্বী আকাশের পার্থক্য রয়েছে।

মুসসোলিনির ভেট ছিল আরাম-আয়েস [illegible] ঐশ্বর্য। গাঁধী যে সেগুলো সবিনয় প্রত্যাখ্যান করবেন সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রবি কবি গাঁধীর সামনে ধরেছিলেন সরল, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। কবিরই ভাষায় বলি,

"দুয়ারে এঁকেছি
রক্তরেখায়
পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?"

হায়, বলেনি।

মাভৈঃ!

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এ রকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেণ্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি-ঘেঁষা পোশাক পরেন, ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজি আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজি এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্ক্যু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজি বলে সেটা কিছু 'আ-মরি' 'আ-মরি' করবার মতো নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজিজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও 'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক কিন্তু ঐসব বুঝে না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাঙ্ক্যু', 'পার্ডন', 'আই এম এফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর) চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারি চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার), বখ্‌শী (একাউণ্টেণ্ট জেনারেল—পে মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনিস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়স্থরা। ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন। বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটেনি।

তা সে যাই হোক্, আমরা বাঙালী প্রথমেই সাততাড়াতাড়ি ইংরিজি শিখেছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলাদেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলাদেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী।[১] দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজি ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলাদেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। (ক) দোয়াবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারেনি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করেনি, (খ) বৌদ্ধ-জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করেনি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলাদেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

আল্লায় বলিছে "মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে করলুম রসুল প্রকাশ।"
"যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥")

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সব-চেয়ে বড় ইংরিজ (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লিতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এসময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজি বইয়ের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবার সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজি ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সেভিয়েট—পায় না।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি।

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সী এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্রভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করিনি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজি বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজ-কারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজি জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মাভৈঃ!

হিটলারের শেষ প্রেম

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে রাত দশটার সময় হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করলো—

"আমাদের ফ্যুরার আডলফ হিটলার বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

যে-সময়ে এ নিদারুণ ঘোষণাটি করা হয়, তখন প্রোগ্রামমাফিক কথা ছিল, "ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়।" এই নিয়ে হিটলার-বৈরীরা এখনো ঠাট্টা-মস্করা করেন।

যে সব জর্মন বেতার-ঘোষণাটি শুনেছিল, তাদের অনেকেই যে বিরাট শক্ পেয়েছিল, সে-নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এদের অনেকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করতো, আশা রাখতো—যে-হিটলার ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর বহু উৎকৃষ্ট সংকটে যেন ভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে, অবলীলাক্রমে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করে সে-সব সংকট উত্তীর্ণ হয়েছেন এবারেও তিনি আবার শেষ মোক্ষম ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। তার অর্থ; যে-সব রুশ সৈন্য বার্লিন অবরোধ করেছে তারা স্বয়ং হিটলারচালিত আক্রমণে খাবে প্রচণ্ডতম মার, ছুটবে মুক্তকচ্ছ হয়ে মস্কো বাগে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ইংরেজ সৈন্যও পড়ি-মরি হয়ে ফিরে যাবে আপন আপন দেশে। রাহুমুক্ত ফ্যুরার —পথপ্রদর্শক সর্বোচ্চ নেতা পুনরায় ইয়োরোপময় দাবড়ে বেড়াবেন।

এরা যে মোক্ষম শক্ পেয়েছিল সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষমতর শক্ পেল কয়েকদিন পর যখন বেতার ঘোষণা করলো, হিটলার আত্মহত্যা করার পনেরো ঘণ্টা পূর্বে এফা ব্রাউন নামক একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। কারণ, জর্মনির দশ লক্ষের ভিতর মাত্র একজন হয়তো জানতো যে, হিটলারের একটি প্রণয়িনী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীরূপে বছর বারো-তেরো ধরে জীবনযাপন করছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ যে কয়েকজন এই "গুপ্তি প্রেমে"র খবর জানতেন, তাঁরা এ-বাবদে ঠোঁট সেলাই করে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে পুরো পাক্কা নিশ্চুপ থাকতেন। কারণ হিটলারের কড়া আদেশ ছিল, তাঁর এই গুপ্তিপ্রেম সম্বন্ধে যে-কেউ খবর দেবে বা গুজব রটাবে, তিনি তার সর্বনাশ করবেন। তার কারণও সরল। তাঁর প্রপাগাণ্ডা মিনিস্টার গ্যোবেল্স্ দিনে দিনে বেতারে খবরের কাগজের মারফতে হিটলারের যে মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন (আজকের দিনের ইংরেজিতে "তাঁর যে 'ইমেজ' নির্মাণ করেছিলেন") সেটি

সংক্ষেপে এই : হিটলার আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর ধ্যানধারণাসাধনা সর্বশক্তি তিনি নিয়োগ করেন একমাত্র জর্মনির মঙ্গলসাধনে। হিটলার স্বয়ং অন্তরঙ্গ জনকে একাধিকবার বলেছেন, "জর্মনিই আমার বঁধু" (বাগদত্তা দয়িতা)। এমন কি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরও তত্ত্বতাবাশ করেন না। এটা সত্য, এ নিয়ে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিধবা একমাত্র সৎদিদিকে মিউনিকের নিকটবর্তী তাঁর বের্ষ্‌টেশগার্ডেনের বাড়ি বের্গহফে গৃহকর্ত্রী রূপে রাখেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সে-বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এফা ব্রাউন। যা আকছারই হয়—ননদিনী ঠাকুরঝির সঙ্গে লাগল কোঁদল। হিটলারের অন্যতম বন্ধু বলেন এ স্থলে আরো আকছারই যা হয় তাই হল। পুরুষমানুষ, তায় হিটলারের মতো কর্মব্যস্ত পুরুষ, এ-সব মেয়েলী কোঁদলে কিছুতেই প্রবেশ করে একটা ফৈসালা করে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি চুপ করে বসে "যাত্রাগান দেখলেন"—অবশ্য অতিশয় বিরক্তিভরে। শেষটায় দিদিই হার মানলেন। হিটলার-ভবন ত্যাগ করে মিউনিকে আপন একটি ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। হিটলার এর পর তাঁকে আর কখনো তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি। তার কিছুদিন পর সৎদিদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিটলার এটাতে ভয়ঙ্কর চটে যান। কেন, তা জানা যায়নি। বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত তো হলেনই না, সামান্য একটি প্রেজেন্টও পাঠালেন না। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র চিরতরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

হিটলারের আপন মায়ের পেটের একটি সুন্দরী বোনও ছিল। তাঁকেও তিনি একবার তাঁর বাড়ি বের্গহফে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ বাড়ির আরাম-আয়েসে এতই সুখ পেলেন যে, কাটালেন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘকাল। হিটলার বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোনের বিদায় নেওয়ার পর তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি। এ-ননদীর সঙ্গে এফা ব্রাউনের কলহ হয়েছিল কি না সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নীরব। ভাইবোন বলতে ইনিই হিটলারের একমাত্র মায়ের পেটের বোন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা আডলফ হিটলারের মৃত্যুর পরও অবহেলিত এই বোন কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন।

এই আপন বোন ও পূর্বে বর্ণিত সেই সৎদিদি ছাড়া হিটলারের ছিলেন একটি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঐ সৎদিদির বড় ভাই। নানা দেশে বহু কর্মকীর্তি করার পর ইনি এলেন বার্লিনে—তাঁর সৎভাই জর্মনির কর্ণধার হয়েছেন খবর শুনে। নাৎসি পার্টির দু-একজনকে চিনতেন বলে তাঁদের কৃপায় পারমিট যোগাড় করে খুললেন বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা মদের দোকান—বার্। পার্টি-মেম্বাররা

সেখানে যেতেন তো বটেই, তদুপরি বিশেষ করে সেখানে হুল্লোড় লাগাতেন দুনিয়ার যত খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওনাদের মতলব, হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তস্য অগ্রজ ভ্রাতার কাছ থেকে গোপন তথ্য, রসালো চুট্‌কিলা সংগ্রহ করে আপন আপন কাগজে টকঝাল পরিবেশন করা।

কিন্তু ব্রাদার আলওয়া হিটলার ছিলেন ঝাণ্ডু শুঁড়ি। পাছে তাঁর কোনো বেফাঁস কথা কনিষ্ঠ ফ্যুরার আডলফের কানে পৌঁছে যায় এবং তিনি চটেমটে তাঁর মদের দোকানের পারমিটটি নাকচ করে দেন সেই ভয়ে তিনি ফ্যুরার সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলতে রাজি হতেন না। অনুজ যে কারণে-অকারণে ফায়ার হয়ে যান সেটা বড় বেরাদার বিলক্ষণ জানতেন।...হিটলারও তাঁর সম্বন্ধে কখনো কোনো কৌতূহল দেখাননি।

পূর্বেই বলেছি, হিটলারের দাদা দিদি বোনের সঙ্গে তাঁর যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না, সেটা দিদি বোনের পাড়াপ্রতিবেশী সখাসখী সবাই জানতেন। তাঁরাও সেটা আর পাঁচজনকে বলতেন। "আহা! ফ্যুরার জর্মনির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই আকণ্ঠ নিমগ্ন যে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অচেতন।" ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে "মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে", এ-স্থলে জর্মনিরও নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদটি রটে গেল, আবাল্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় প্রভু হিটলার তাঁর সর্ব আত্মজনকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র জর্মনির জন্য আত্ম-বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রপাগণ্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স্ ঠিক এইটেই চাইছিলেন। তিনি সেই গুজবের দাবাগ্নিতে দিলেন ঘন ঘন কুলোর বাতাস। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এ 'সত্য তত্ত্ব'। বিশ্বজন আগের থেকেই জানতো, হিটলারের জীবনধারণ পদ্ধতি ছিল চার্চিল এবং স্তালিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্চিলের মুখে জাগ্রতাবস্থায় সর্বক্ষণ অ্যাম্মোটা সিগার এবং বেলা-অবেলায় এক পেট খাঁটি স্কচ হুইস্কি। স্তালিনের ঠোঁটেও তদ্বৎ—তবে সিগারের বদলে খাঁটি রাশান পাপিরসি (সিগারেট) এবং স্কচের বদলে তিনি অষ্টপ্রহর পান করতেন, হুইস্কির চেয়েও কড়া মাল ভোদকা শরাব। দুজনাই সর্ববিধ গোস্ত গব গব করে গিলতেন। পক্ষান্তরে হিটলার ধূম্র এবং মদ্যপান করতেন না এবং তিনি ছিলেন ভেজিটারিয়ান। কাজেই তাঁকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বজনের সম্মুখে তুলে ধরতে ডঃ গ্যোবেল্‌সের কল্পনার আশ্রয় অত্যধিক নিতে হয়নি।

হিটলারের মৃত্যুসংবাদ জর্মন জনগণকে যে শক্ দিয়েছিল, তারপর তারা যে মোক্ষমতর শক পেল তার সঙ্গে এটার কোনো তুলনাই হয় না।

যুদ্ধ-শেষে কয়েক দিন পর (মে ১৯৪৫) যে-রুশ সেনাপতি জুকফ বার্লিন অধিকার করেন তিনি প্রচার করলেন, আত্মহত্যা করবার পূর্বে হিটলার তাঁর এক রক্ষিতাকে বিয়ে করেন।

সর্বনাশ! বলে কি! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী যিনি

"দারাপুত্র পরিবার
কে তোমার তুমি কার?"

কিংবা "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ধ্যানমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর জর্মনির জন্য বিনিদ্র ত্রিযামা যামিনী যাপন করলেন তিনি কি না শেষ মুহূর্তে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যবশতঃ "ধর্মচ্যুত" হয়ে বিবাহ করলেন একটা "রক্ষিতাকে"! এ যে মস্তকে সর্পদংশন।

আজ যদি শুনতে পাই (এবং এটা অসম্ভব তথা আমি মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি) যে-ডিউক অব উইনজার তাঁর দয়িতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনার্থে অবহেলে ইংলণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সেই বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে প্যারিসের কোনো গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তবে কি সেটা পয়লা ধাক্কাতেই বিশ্বাস করবো?

জর্মনির জনসাধারণ প্রথমটায় এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছে এই: যতক্ষণ ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতী খেল দেখায় ততক্ষণ দর্শক বেবাক নির্বাক হয়ে তাই দেখে, কিন্তু যে-মুহূর্তে বাজিকর "গুড নাইট" বলে অন্তর্ধান করে তন্মুহূর্তেই আরম্ভ হয় বিপুল কলরব। কী করে এটা সম্ভব হল, কী করে ওটা সম্ভব হল?—তাই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা! এবং দু'একটি লোক যারা ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত তারা অল্পবিস্তর পাকা সমাধানও তখন দেয়।

এস্থলেও তাই হল। হিটলার ম্যাজিশিয়ান যখন তাঁর শেষ খেল দেখিয়ে ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেন তখন আরম্ভ হল তুমুলতর অট্টরোল। এবং এস্থলেও যাঁরা হিটলারের অন্তরঙ্গজন—হিটলারী ম্যাজিকের অর্থাৎ এফা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানতেন—তাঁরা এ-বাবদে ঈষৎ ছিটেফোঁটা ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এঁদের কাহিনী অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

ইতিমধ্যে হিটলারের খাস চিকিৎসক ডাক্তার মরেল ধরা পড়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন সেটা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এফা ব্রাউন আর হিটলার একসঙ্গে বাস করতেন বই কি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এবং কিছু-একটা হত হয়তো—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।"

এ সময়ে হিটলারের উইল দলিলটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তিনি তাঁর বিবাহের পরমুহূর্তেই ডিকটেট করে টাইপ করান এবং আপন স্বাক্ষর দেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের ভিতর আছে :

"যদ্যপি আমার সংগ্রামের সময় বিবাহ এবং তজ্জনিত দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো আস্থা আমার ছিল না, তথাপি এখন, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি মনস্থির করে একটি রমণীকে বিবাহ করছি। আমাদের ভিতর ছিল বহু বৎসরের বন্ধুত্ব (ফ্রেণ্ডশিপ = জর্মনে ফ্রয়েণ্টশফট) এবং বার্লিন যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবার জন্য এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রীরূপে আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলুম বলে যে ক্ষতি হয়েছিল (অর্থাৎ একে অন্যের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম—অনুবাদক) তার ক্ষতিপূরণ এর দ্বারা হবে।"[১]

এই এফা ব্রাউন রমণীটি কে ?

আমি ইতিপূর্বে 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' তথা 'হিটলারের প্রেম' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সময় উল্লেখ করি যে আমার জানামতে হিটলার তাঁর জীবনে সবসুদ্ধ ½ + ১ + ½ = দুইবার ভালোবেসেছিলেন। প্রথম হাফ প্রেমকে ইংরাজিতে 'কাফ্ লভ্' বলে। বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো আর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুরে মরা। কারণ হিটলার তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে কখনো সাহসভরে আলাপচারী তো করেনইনি, এমন কি চিঠিপত্রও লেখেননি। হিটলার তখন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'টীন এজার'। এ-প্রেমটাকে সত্যকার রোমান্টিক প্লাতনিক প্রেম বলা যেতে পারে।

এর প্রায় বাইশ বৎসর পরে, যৌবনে, হিটলার পুরো-পাকা ভালোবেসেছিলেন গেলী রাউবাল নামক এক কিশোরীকে। এটিকে আমি পুরো এক নম্বর দিয়ে পূর্বোল্লিখিত "হিটলারের প্রেম" প্রবন্ধ রচনা করি। এটি স্থান পেয়েছে মল্লিখিত 'রাজা উজির' পুস্তকে। এ-অধম পারতপক্ষে কাউকে কখনো আমার

১ বৈদিক যুগে আমাদের ভিতর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তার সমাধান এখনো হয়নি। এস্থলে লক্ষণীয়, হিটলার নিজেকে আর্য বলে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তাই হয়ত প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানানোর পর এই সতীদাহে সম্মত হন। পাঠক এ-নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

নিজের লেখা পড়ার সলা-উপদেশ দেয় না, তবে যাঁরা রগরগে রোমান্টিক প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য রচনা পড়তে পারেন না, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও হয়ত সেই শোকে আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাঁর ফোটোগ্রাফার বন্ধু, হফ্‌মান প্রধানত—যদি তাঁকে শব্দার্থে তিন দিন তিন রাত্রি চোখে চোখে রাখতেন।

এই দুটি—½ + ১ প্রেম হয়ে যাওয়ার পর হিটলার আরেক ½ প্রেমে পড়েন—জীবনের শেষ বারের মতো। এফা ব্রাউনের সঙ্গে। এটাকে আমি হাফ প্রেম বলছি এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত উভয়ের কোনো অন্তরঙ্গজনই এঁদের ভিতর সঠিক কি সম্পর্ক ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী। হিটলার ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি তিনি কদাচ আকৃষ্ট হননি। যে-রমণী তার দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে, তাকে "রক্ষিতা" আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে এ-তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। তিনি অবশ্য তার জন্য একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সব কটা ভুয়ো নয়। এবং হিটলার সর্বদাই এ-জাতীয় আলোচনার সর্বশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে বলতেন, "জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড" = জর্মনি আমার (জীবনমরণের) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

অতএব এফা না ছিলেন হিটলারের রক্ষিতা, না ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সর্ব ঐতিহাসিক তাই বলেছেন, 'এ মোস্ট আনডিফাইণ্ড স্টেট'—অর্থাৎ এঁদের ভিতর ছিল এমন এক সম্বন্ধ যেটা কোনো সংজ্ঞার চৌহদ্দীতে পড়ে না।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঘা ঐতিহাসিক (যদ্যপি আমার বিচারে তিনি ট্রেভার রোপার, বুলক, নামিরের ইত্যাদির কাছেই আসতে পারেন না) শয়রার—যাঁর নাৎসিদের সম্বন্ধে বিরাট ইতিহাসের উপর নির্ভর করে নির্মিত একটা অতিশয় রসকষহীন ফিল্ম ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে কলকাতা তক পৌঁচেছিল—ইনি বলছেন, যে গেলী রাউবালের সঙ্গে হিটলারের প্রণয় হয় তাঁর আত্মহত্যার এক বা দুই বৎসর পর হিটলারের সঙ্গে এফা ব্রাউনের পরিচয় হয়। এ তথ্যটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। কারণ একাধিক ঐতিহাসিক বলেন আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে গেলী তার মামা (সম্পর্কে) হিটলারের

স্যুট সাফসুৎরো করার সময় পকেটে হিটলারকে লিখিত এফা ব্রাউনের একখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে যায়। গেলী আত্মহত্যা করার পর তার মা বলেন, এই চিঠিই গেলীকে আত্মহত্যার দিকে শেষ ঠেলা দেয়,—অবশ্য এ-কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না গেলীর মা এফাকে এমনই উৎকট ঘৃণা করতেন যে পারলে তার চোখ দুটো ছোবল মেরে তুলে নিয়ে, রোস্ট করে তাঁর প্যারা কুকুরকে খেতে দিতেন।

গেলী হয়ত চিঠিখানা পেয়েছিল কিন্তু সে-চিঠি যে তার হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে-বিশ্বাস আমার হয় না। কারণ গেলীকে যিনি সবচেয়ে বেশী চিনতেন সেই হফ্‌মান বলেছেন, গেলী ভালবাসত ভিয়েনাবাসী এক কলেজের ছোকরাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কখনো তার মামার প্রেম নিবেদনের প্রতিদান দেয়নি। তদুপরি আরেকটি কথা আছে, হিটলার তখন গেলীর প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এফার সঙ্গে এমনি গতানুগতিক আলাপ হয়েছে। সে মজে গিয়ে হিটলারকে প্রেমপত্র লিখেছে—তরুণীরা আকছারই এ-রকম করে থাকে—এবং হিটলার এ-ধরনের চিঠি পেতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এবং নিশ্চয়ই এফার এ-চিঠি সিরিয়াসলি নেননি।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হল হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী কন্যা যতখানি লেখাপড়া করে সেইটে সেরে তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে অ্যাসিসটেণ্টের কর্ম নেন। তাঁর কাজ ছিল, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ডার্করুমে কিছুটা সাহায্য করা। সেই সূত্রে হফ্‌মান নিতান্ত প্রফেশনালি হিটলারের সঙ্গে এফার আলাপ করিয়ে দেন।

হিটলারের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে ভিয়েনা নগরে। সে-নগরের নাগরিকরা ডানসিং, ফ্লার্টিং, প্রণয়-মিলন, পরকীয়া শিভালরিতে অনায়াসে প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। হিটলারও রমণীসঙ্গ খুবই পছন্দ করতেন। জর্মনির সর্বময় কর্তা হওয়ার পর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গজনকে একাধিকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন, "এসব বড় বড় হোটেলের গাড়োলরা যে পুরুষ ওয়েটার রাখে, তার মত ইডিয়টিক আর কী হতে পারে! এটা তো জলের মত স্বচ্ছ যে সুন্দরী যুবতী ওয়েট্রেস রাখলে ঢের ঢের বেশী খদ্দের জুটবে। আমার জীবনে ট্র্যাজেডি যে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে যখন আমি কোন স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটে বসি, আমাকে বাধ্য হয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে বসাতে হয় এই বুড়ী-হাবড়ীকে। কারণ তাঁদের স্বামীরা দুই বুড়ো-হাবড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।...ওঃ, সে কি গব্বযন্ত্রণা।

খুশ-এখতেয়ার থাকলে তার বদলে আমি যে-কোন অবস্থায় ছোট্ট একটি নাম-না-জানা রেস্তোরাঁয় একটি ডবকী ওয়েট্রেসের সঙ্গে (মেয়েদের বেতন কম বলে কন্টিনেন্টে ছোট রেস্তোরাঁই শুধু ওয়েট্রেস রাখে) দু'দণ্ড রসালাপ করতে করতে না হয় সামান্য ডাল-ভাতই (ওদেশের ভাষায় দুই পদী খানা) খাবো—জাহান্নামে যাক স্টেট ব্যাঙ্কুয়েটের বাহান্ন পদী কোর্মা-কালিয়া, বিরয়ানি-তন্দুরী (ওদের ভাষায় শ্যাম্পেন কাভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি)।"

তাই হিটলারের অ্যারোপ্লেনে রাখা হত খাবস্থুরৎ হুরী, স্টুয়ার্ডেস। কিন্তু এ-কথা সবাই বলেছেন, হিটলার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন না।

এস্থলে নাগর পাঠককে সবিনয় নিবেদন করি, এফা ব্রাউন ছিলেন সত্য সত্যই চিত্তহারিণী অসাধারণ সুন্দরী। কিশোরী-যুবতীর সেই মধুর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু এ-বেসরিক লেখক নারী-সৌন্দর্য বর্ণনে এযাবৎ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে নাগর রসিক পাঠককে এস্থলে সে-রস থেকে সে বঞ্চিত করতে বাধ্য হল।

এফা সুন্দরী তো ছিলেনই তদুপরি স্টুডিয়াতে যে-সব খানদানী বিত্তশালিনী তরুণী যুবতী ছবি তোলাতে আসতেন, এফা তাদের আচার-আচরণ থেকে অনেক-কিছু শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বেশভূষা এবং অলঙ্কারাদি।... পরবর্তীকালে যখন তাঁর অর্থের কোনই অভাব ছিল না তখনো তাঁর বেশভূষাতে রুচিহীন আড়ম্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়নি। তাঁর অর্থবৈভব শুধু একটি অলঙ্কারে প্রকাশ পেত। তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা থাকত মহার্ঘ্য বিরল হীরেতে বসানো একটি ছোট্ট রিস্টওয়াচ। জর্মনির মত দেশের ফ্যুরার যদি প্রিয়াকে তাঁকে জন্মদিনে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন, তবে সেটি কি প্রকারের হবে, সেটা কল্পনা করার ভার আমি বিত্তশালী পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গোড়ার দিকে হিটলার এফাকে খুব বেশী একটা লক্ষ্য করেননি।

এদিকে গেলীর মৃত্যুর পর হিটলারের জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সখা হফ্‌মান তখন তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ পেলে হিটলারের প্রিয় অবসর যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। হিটলারকে নিয়ে যেতেন মিউনিকের আশপাশের হ্রদবনানীতে পিকনিকে। সঙ্গে থাকতেন হফ্‌মানের স্ত্রী, ফোটো স্টুডিয়োর দু-একজন কর্মচারী এবং এফা ব্রাউন।

ক্রমে ক্রমে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এর পর দেখা গেল, হফ্‌মান যদি পক্ষাধিককাল কোন পিকনিকের ব্যবস্থা না করতেন তবে স্বয়ং হিটলার তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে বলতেন, "হেঁ হেঁ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই আপনার এখানে ঢুঁ মারলুম।" তারপর কিঞ্চিৎ ইতিউতি

করে বলতেন, "যা ভাবছিলুম···একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয়, আপনারা তো আছেনই, আর হেঁ হেঁ ঐ ফ্রলাইন ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও মন্দ হয় না,—কি বলেন ?"

তখনো হিটলার এফার প্রেমে নিমজ্জিত হননি—এবং কখনও হয়েছিলেন কি না, সে-বাবদে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। পরবর্তী কাহিনী পড়ে সুচতুর—অন্তত আমার চেয়ে চতুর—পাঠক-পাঠিকা প্রেম বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত কূটবুদ্ধি দ্বারা আপন আপন সুচিন্তিত এবং/কিংবা সহৃদয় অভিমত নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে কিন্তু শ্রীমতী এফা হিটলার প্রেমের অতলান্ত সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে বিলীন হচ্ছেন। আর হবেনই না কেন ? যদ্যপি হিটলার তখনো রাষ্ট্রনেতা হননি, তথাপি তাবৎ জর্মনির সবাই তখন জানত, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ যে-কোনো দিন তাঁকে ডেকে বলবেন প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। তদুপরি, পূর্বেই বলেছি, হিটলার ছিলেন রমণীচিত্তহরণের যাবতীয় কলাকৌশলে রপ্ত।···এবং সর্বোপরি তিনি প্রায়ই অবরেসবরে এফাকে দিতেন ছোটখাটো প্রেজেণ্ট। বিত্তশালীজন তার দয়িতাকে যে-রকম দামী দামী ফার কোট, মোটর গাড়ি দেয়, সে রকম আদৌ ছিল না—তিনি দিতেন চকলেট, ফুল বা ভ্যানিটি কেস (আমাগো রাষ্ট্রভাষায় যারে কয় "ফুটানি কী ডিবিয়া")।

সব ঐতিহাসিক বলেছেন, এফা ছিলেন "রাদার এম্‌টি-হেডেড" অর্থাৎ সরলা বুদ্ধিহীনা। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? অস্মদ্দেশীয় এক বৃদ্ধ চাটুয্যে "মহারাজ"কে জনৈক অর্বাচীন শুধিয়েছিল প্রেমের খবর তিনি রাখেন কি, তিনি বৃদ্ধ, তাঁর ক'টা দাঁত আর এখনো বাকি আছে ? গোস্‌সাভরে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা—"ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস ? প্রেম হয় হৃদয়ে।" বিলকুল হক কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে পারতেন, প্রেম নামক আদিরসটি মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চারিত হয় না।

তাই এফা ঐ সব চকলেটাদি সওগাৎ বান্ধবী, সহকর্মীদের ফলাও করে দেখাত, পিকনিকের বর্ণনা ফলাওতর করে সবিস্তর বাখানিত এবং ভাবখানা এমন করত যে, হিটলার তার প্রেমে রীতিমত ডগোমগোজরোজরোমরোমরো।

এস্থলে ইয়োরোপীয় সরলা কুমারীরা যা সর্বত্রই করে থাকে (এবং অধুনা কলকাতা-ঢাকাতে তাই হচ্ছে) এফা তাই করলেন। নির্জনে একে অন্যে যখন হুঁহুঁ হুঁহুঁ, কুঁহুঁ কুঁহুঁ তখন আশ-কথা পাশ-কথার মাঝখান দিয়ে—যেন টেবিলের

ফুলদানির দেখা-না-দেখার ফুলের মাঝখান দিয়ে জর্মনে একে বলে 'থ্রু দ্য ফ্লাওয়ারস' —বিবাহ নামক সেই প্রাচীন সনাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা দিলেন। নিশ্চয়ই একাধিকবার।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে কসম খেয়ে বসে আছেন, বিবাহ-বন্ধন নামক উদ্বন্ধনে তিনি—কাট্যাফালাইয়েও—দোদুল্যমান হতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এবং ঝাণ্ডু ডিপ্লোমেট এই অস্বস্তিকর বাক্যালাপ কি করে এড়াতে হয়, সেটা খুব ভাল করেই জানতেন।

এটা বুঝতে সরলা, নীতিশীল পরিবারে পালিতা এফার একটু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে তাঁর রক্ষণশীল পিতামাতা এফার সঙ্গে হিটলারের 'ঢলাঢলি'র খবর পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন হয় হিটলার তোমাকে বিয়ে করুক, নয় তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ কর।

পিতামাতার প্রতি বিনম্রা এই কুমারী তখন কি করে?

হঠাৎ ঐ সময়ে একদিন হফ্‌মান সখা হিটলারকে টেলিফোন করলেন, "যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে আসুন।"

হিটলার: "কেন, কি হয়েছে?"

হফ্‌মান: "আসুন না; সব কথা এখানে হবে।" হফ্‌মান এবং হিটলার দুজনেই জানতেন তাঁদের টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিস ট্যাপ্ করে।

হিটলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হফ্‌মানের ফ্লাটে পৌঁছলেন। শুধোলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

হফ্‌মান: "বড় সিরিয়াস। একা পিস্তল দিয়ে বুকে গুলি মেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা নেয়। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হিটলার বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু জানাজানি হয়নি তো—তাহলেই তো সর্বনাশ!"

এস্থলে লক্ষণীয় যে হিটলার দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। তাঁর পার্টি এবং বিশেষ করে গ্যোবেল্‌স্ সাধারণ্যে তাঁর যে "ইমেজ" গড়ে তুলছিলেন, সেটা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর। এখন যদি তাঁর দুশমন কম্যুনিস্টরা জেনে যায় যে, তিনি গোপনে একটা মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতেন এবং সেই সরলা কুমারী যখন যুক্তিসঙ্গত নীতিসম্মত পদ্ধতিতে হিটলারকে সেই ভাব-ভালোবাসার অন্তে যে প্রতিষ্ঠান থাকে, অর্থাৎ বিবাহ, সেটা প্রস্তাব করে তখন তিনি ধড়িবাজ, কাপুরুষ, বেইমানের মতো মেয়েটাকে ধাপ্পা মারেন, এবং ফলে ভগ্নহৃদয়া কুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তবেই তো চিত্তির! যে নাৎসি

পার্টির নেতা এ-রকম একটা পিশেচ সে পার্টির কী মূল্য? এই বেইমান পার্টিতে আস্থা রাখবে কোন্ ভদ্র ইমানদার জর্মন? এবং ভুললে চলবে না, মাত্র বছর দুই পূর্বে গেলী রাউবালও আত্মহত্যা করে—যদিও সে সময় কম্যুনিস্টরা সেই সুবর্ণ-সুযোগের সিকি পরিমাণ ফায়দাও ওঠাতে পারেনি, অর্থাৎ একসপ্লয়েট করতে পারেনি।

কিন্তু মাভৈঃ! কন্দর্প নির্মিত এ-সব সংকটে প্রায়শ তিনি বিধাতার ন্যায়-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রেমিক-প্রেমিকার তাবৎ মুশকিল আসান করে দেন।

হফ্‌মান সঙ্গে সঙ্গে হিটলার তথা নাৎসি পার্টির জীবনমরণ সমস্যা সমাধান করে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। জানাজানি হয়নি। কারণ এফাকে অচৈতন্য অবস্থায় যে সার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি আমার নিকট-আত্মীয়। তাকে এমনভাবে কড়া পাহারায় রেখেছেন যে, পুলিস পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বয়ং আমাকে খবরটা জানিয়েছেন।"

তখন, এই প্রথম হিটলার প্রেয়সীর অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। না—ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তবে এফা রক্তক্ষরণহেতু বড্ডই দুর্বল।

শুধু এফার ফাঁড়া কেটে গেল তাই নয়, স্বয়ং হিটলার এবং নাৎসি পার্টিরও ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য কিছুটা কানাঘুষো হয়েছিল, কিন্তু জানাজানি হয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে হিটলার যে খুব একটা নেমকহারাম ছিলেন তা নয়। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে হিটলার বুঝে গেলেন এফার প্রেম কতখানি গভীর—বল্লভার ব্রেন-বাক্সে কিছু থাক আর নাই থাক, তার গলা থেকে নাভিকুণ্ডলী অবধি জুড়ে বসে আছে একটা বিরাট হৃদয়—সেখানে না আছে ফুসফুস না আছে লিভার স্প্লীন কিডনি না আছে অন্য কোনো যন্ত্রপাতি।

এ-হেন হৃদয়কে তো অবহেলা করা যায় না।

এতদিন হিটলার যে-প্রেম করতেন এফার সঙ্গে সেটার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি জর্মন কলেজ-স্টুডেন্টরা তাদের বান্ধবীর (ফ্রয়েণ্ডিন=গার্ল ফ্রেণ্ডের) সঙ্গে যে ভাবে করে থাকে। অর্থাৎ সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এফা তাঁর নাইট গাউন ইত্যাদি রাত্রের পোশাক একটি অতি ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে চুপিসাড়ে ঢুকতেন হিটলারের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়ির পাঁচজন জেগে ওঠার পূর্বেই, ভোরবেলা, ফের চুপিসাড়ে চলে যেতেন আপন ফ্ল্যাটে।

এবারে হিটলার করলেন ভিন্ন ব্যবস্থা। ততদিনে তিনি রীতিমত বিত্তশালী হয়ে গিয়েছেন। হিটলারের আপন কর্মস্থল ম্যুনিক শহরে তিনি এফার জন্য

ছোট্ট একটি ভিলা, মোটর কিনে দিলেন এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থাৎ তিনি হিটলারের একমাত্র রক্ষিতা হিসাবে হিটলারমণ্ডলীতে আসন পেলেন। এস্থলে "রক্ষিতা" বলাটা হয়ত ঠিক হল না। কারণ ইয়োরোপের প্রায়ই অনেকে কয়েক বৎসর পরে এই রক্ষিতাকে বিয়ে করে তাকে সমাজে তুলে নেন। এবং সমাজপতিরাও বধূর অতীত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই: এদেশে যদি বিয়ের তিন চার মাস পর কোনো রমণী বাচ্চা প্রসব করে, তবে হইচই পড়ে যায়। ইয়োরোপে আদৌ না। আমার যতদূর জানা গির্জা পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন না তুলে বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টিস্ট করে তাকে ধর্মতঃ সমাজে তুলে নেয়।

অবশ্য হিটলার সমস্ত ব্যবস্থাটা করলেন অতিশয় গোপনে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর এবং এফার চাকর মেড্ তথা অতিশয় অন্তরঙ্গজন হাড়ে-মাসে জানতেন যে তাঁরা যদি এই প্রণয়লীলা নিয়ে সামান্যতম আলোচনা করেন—বাইরের লোককে খবরটা জানাবার তো কথাই ওঠে না—তাহলে তিনি পার্টির জব্বর পাণ্ডাই হন আর জমাদারণীই হোক, তাঁরা যে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত বহিষ্কৃত হবেন তাই নয়, কপালে গুম-খুনও অনিবার্য। কারণ হিটলার বহু বিষয়ে নির্মম। দেশের কর্ণধার হওয়ার পূর্বে এবং পরেও হিটলার হিমলার বিস্তর গুম-খুন করিয়েছেন।

ওদিকে এফার যে ধার্মিক চরিত্রশীল জনক-জননী হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কুমারী কন্যার অন্তরঙ্গতার কঠোর কঠিনতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এ-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন। এটাকে প্রতিরোধ করলে একগুঁয়ে মেয়ে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং যদি সফল হয়ে যায়!

আমার দুঃখ শুদ্ধ-পাঠটি আমার মনে নেই: মোটামুটি যে মেয়ে—

"মরণেরে করিয়াছে জীবনের প্রিয়।
কারো কোনো উপদেশ কান দিবে কি ও?"

এফার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন ছাড়া আর সবাই বিশ্বাস করতো, এফা ফোটোগ্রাফ দোকানে কাজ করেন। তিনি হফ্মানের স্টুডিয়োতে প্রতিদিন হাজিরা দিতেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৩৩-এর ৩০-এ জানুয়ারি হিটলার হয়ে গেলেন জর্মনির কর্ণধার—প্রধানমন্ত্রী চ্যানসেলার। তাঁকে তখন স্থায়ীভাবে বাস করতে হল বার্লিনে—ম্যুনিক পরিত্যাগ করে। এখন তিনি এফাকে নিয়ে পড়লেন বিপদে।

এতদিন শুধু কম্যুনিস্টরাই তাদের আধা-পাকা গোয়েন্দাগিরি করেছে হিটলারের। এবারে জুটলো তাবৎ মার্কিন খবরের কাগজের দুঁদে দুঁদে রিপোর্টার—পূর্বোক্ত "ঐতিহাসিক" শায়রারও তাদেরই একজন। এদের চোখ দু-নলা বন্দুকের মতো গভীর অন্ধকারেও এক্স-রে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে জানে শিকারের দিকে। এবং কারো যে কোনো ব্যক্তিগত জীবনের প্রাইভেসি থাকতে পারে সেটা তাদের শাস্ত্রে —আদৌ যদি তাদের কোনো শাস্ত্র থাকে—লেখে না। পাঠক শুধু স্মরণে আনুন ইংলণ্ডের রাজা যখন মিসেস সিমসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তখন সে "কেচ্ছা"কে তারা কী কেলেঙ্কারির রূপ দিয়ে দিনে দিনে রসিয়ে রসিয়ে মার্কিন কাগজে প্রকাশ করেছে! তার তুলনায় হিটলার কোন্ ছার। ব্যাটা আপস্টার্ট যুদ্ধের সময় ছিল নগণ্য করপরেল—তার আবার প্রাইভেট লাইফ! সেটাকেও আবার রেহাই দিতে হবে! ছোঃ!

কাজেই এফাকে বার্লিনে আনা অসম্ভব।

ফলস্বরূপ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এ হিটলারের আত্মহত্যা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর—কবির ভাষায় নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর—এফা পেলেন আগের তুলনায় অল্পই, এবং ক্রমশঃ হ্রাসমান। তাই সহমরণের বহু আগের থেকেই এফা একাধিক বন্ধুবান্ধবীকে বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন, "১৯৩৩-এর জানুয়ারি (অর্থাৎ হিটলার যেদিন চ্যানসেলর হন) আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্মম দিবস (ট্র্যাজিক ডে, 'ট্রাগিশা টাখ')।"

যেদিন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অবতরণ করে কালক্রমে জর্মনি জয় করে সেটাকে বলা হয় ডী-ডে (D-Day)। সেটা ৬ই জুন ১৯৪৪। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারিতেই কিন্তু আরম্ভ হয় অভাগিনী এফার ডী-ডে। কিন্তু এসব কথা পরে হবে।

বার্লিনে কর্মব্যস্ত হিটলার ম্যুনিকে আসার সুযোগ পেতেন কমই। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যুনিকে ট্রাঙ্ককল করে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করে নিতেন। এবং টেলিফোন লাইনটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যে, এফা হিটলার কনেকশন হয়ে যাওয়া মাত্রই দুই প্রান্তের টেলিফোন অপরাটেররা কিছুই শুনতে পেত না।...এবং যে স্থলে ট্রাঙ্ককলের অষ্টপ্রহর ব্যাপী এহেন সুবিধা সেখানে চিঠিচাপাটির বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না—ওদিকে আবার চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে হিটলার ছিলেন হাড় আলসে। (জর্মনে "স্টিওঙ্কেতের শ্রাইবফাউল"দু=গন্ধময় লেখন-আলসে)। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আক্ষরিক অর্থে হিটলারের দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ক্রমাগত একটার পর আরেকটা মিলিটারি কনফারেন্স হচ্ছে—

তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতম ভ্যালে লিঙেকে বলতেন, "হে লিঙে, তুমি ঝপ করে এফাকে দুটি লাইন লিখে দাও না।" তখন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিটলারের কোনো-না-কোনো কর্মচারী প্লেনে করে ম্যুনিক যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর চিঠি এফার হস্তগত হত।

ভ্যালে বলতে ভৃত্যও বোঝায়। কাজেই পাঠক নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়ে শুধাবেন, "কী! চাকরকে দিয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে চিঠি লেখানো! সখ্‌ৎ বেআদবী তো বটেই—তার চেয়ে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' থেকে দু-পাতা কেটে নিয়ে খামে পাঠিয়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশী শৃঙ্গাররসসম্মত!" কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই—হিটলার, এফা ও ভ্যালে লিঙে তিনজনই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এমন কি লিঙের সামাজিক (রাজনীতির কথা হচ্ছে না) প্রতিষ্ঠা ছিল হিটলারের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের। তদুপরি, হিটলারের হাজার হাজার খাস সেনানীর (এস-এ) মাঝখান থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিঙেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন প্রায় কর্নেলের কাছাকাছি। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, হিটলার ম্যুনিকে এলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো রাষ্ট্রকার্যে। সে-সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এফাতে লিঙেতে সময় কাটাতেন গালগল্প করে। এফা জানতেন, পুরুষদের ভিতর লিঙেই দশ-বারো বছর ধরে হিটলারের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হিটলারও তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। এফা মেয়েদের ভিতর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী। অতএব দুজনার ভিতর একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এফা এই লিঙেকে তাঁর হৃদয়বেদনা যতখানি খুলে বলেছেন, অন্য আর কাউকে অতখানি বলেননি।[২]

অন্যত্র সবিস্তর লিখেছি, হিটলারের মৃত্যুর পর লিঙে রুশহস্তে বন্দী হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর রুশ-কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার পর জর্মনিতে ফিরে এসে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। এফা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই

২ এফার সঙ্গে লিঙের আরেকটা মিল আছে। বার্লিন যখন প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত, শেষ পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু পালাবার পথ তখনো ছিল, সে-সময় হিটলার লিঙেকে ডেকে বলেন, "তুমি আপন বাড়ি চলে যাও।" লিঙে অসম্মতি জানান এবং সংক্ষেপে যা বলেন তার মোদ্দা: যাঁকে আমি এত বৎসর ধরে সেবা করেছি তাঁকে তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি ত্যাগ করতে পারবো না। এবং সবাই জানেন, এফাও হিটলারের কড়া আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

পুস্তিকায়ই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে বিশ্বাস্য খবর পাবেন। হিটলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু এফা সম্বন্ধে লিখেছেন বড়ই দরদ-ভরা ভাষায়। তিনি ইচ্ছে করলেই হিটলার এফার সম্পর্ক সম্বন্ধে রগরগে মার্কিনী ভাষায় "কেলেঙ্কারি কেচ্ছা" লিখতে পারতেন—কোনো সন্দেহ নেই তিনি রুশ দেশ থেকে পশ্চিম জর্মনিতে ফেরা মাত্রই মার্কিন রিপোর্টাররা তাঁকে চেপে ধরে, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিটলার এফার নব "বিদ্যাসুন্দরে"র জন্য আপ্রাণ পাম্প করেছিল কিন্তু সে-সময় বিশেষ কিছু তো বলেনই নি, পরেও পুস্তিকা রচনাকালে লিখেছেন যেটুকু নিতান্তই না লিখলে সত্য গোপন করে এফার প্রতি অবিচার করা হয়। এই অন্তর্নিহিত শালীনতাবোধ ছিল বলেই হিটলার ও এফা উভয়েই তাঁকে বন্ধুর চোখে দেখতেন। এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজগুবী ব্যাপার নয়। এ দেশের পাঠান দাসবংশের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই এর সত্যতার নজীর সে-ইতিহাসে পাবেন। এবং লিঙে তো কিছু ক্রীতদাস নন !!

তাই এফাতে লিঙেতে এমনিতেই চিঠিপত্র চলতো। হিটলার সেটা জানতেন। তাই তিনি যে কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তিনি যে ফোন করার জন্য মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করে পাঁচ মিনিটের তরেও আপন খাস কামরায় যেতে পারছেন না, এটা তাঁর গাফিলতি নয়, বস্তুত তাঁর এই অপারগতা সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন—এসব কথা লিঙেকে গুছিয়ে লিখতে বলতেন।

হিটলার যে এফাকে কখনো বার্লিনে আসতে দিতেন না তা নয়। অবশ্য অতিশয় কালেকস্মিনে। জব্বর পার্টি-পরবের স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট না থাকলে অন্তরঙ্গজন তথা এফার সঙ্গে তিনি ডিনার-লাঞ্চে বসতেন। এফাকে তাঁর বাঁ-দিকের চেয়ারে বসাতেন। এফা ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না, তাঁর পছন্দসই খানা তৈরি হয়েছে কি না তাই নিয়ে পুতু-পুতু করতেন এবং সবাই বুঝতে পারতো তিনি এফাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট বা বাইরের লোক খানা খেতে আসতো, সেদিন এফাকে উপরের তলায় হিটলারের চারজন মহিলা সেক্রেটারি ও তাঁর খাদ্যরন্ধনের অধিকর্ত্রীর[৩] সঙ্গে খানা খেতে হত। অবশ্য এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল, যখন হিটলারের দফতরের এক উচ্চ

৩ ইংরেজের স্বারির "বামনাই"য়ের দুটি চূড়ান্ত বেশরম, বেহায়া উদাহরণ পাঠক এ-স্থলে পাবেন। হিটলার নিরামিষাশী ছিলেন ও তদুপরি তাঁকে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে হত ; অর্থাৎ তিনি ডায়েট খেতেন। সে-সব বিষয়ে রান্না বড়

অফিসার, ফেগেলাইন বিয়ে করলেন এফার এক বোনকে। তখন হিটলার-সমাজের একটুখানি বৃহত্তর চক্রে এফাকে পরিচয় দেওয়া হত, সম্মানিত অফিসার ফেগেলাইনের শ্যালিকারূপে! মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর মেয়ের বর!

বিরাট বিরাট লক্ষজন পরিপূর্ণ সভাতে, যেখানে হিটলার ওজস্বিনী বজ্রভাষিণী থাণ্ডারী লেকচার ঝাড়বেন, সেখানেও তাঁকে বিশেষ আসন দেওয়া হত না। তাঁর এবং হিটলারের আর পাঁচজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে দয়িতের জনগণমনচিত্তহারিণী বক্তৃতা শুনতেন।

হায়! একে কি বলবো—"বড় দুঃখে সুখ" বা "বড় সুখে দুঃখ"? আমি এ-বাবদে মূর্খ—আবার বিদগ্ধ, সম্মানিত সখা "শিব্রাম" এ রকম একটা মোকা পেলে ঝপ্ করে একটা অকল্পনীয় পান করে খপ্ করে একটা আরো অচিন্তনীয় সুমধুর সুভাষিত ম্যাক্সিম বানিয়ে ফেলতেন পুরো দেড় গণ্ডা শব্দ ব্যবহার না করেই। এই একটা ব্যাপারে লোকটা মকৃথী-চোস্ কঞ্জুস। অভিধানের শব্দ-ভাণ্ডার যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে লুকানো চিত্র-তারকাদের—সক্কলের না কারো-

---

বড় হোটেলের "শেফ"-রাও রাঁধতে জানে না। তাই ডাক্তারদের আদেশে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয় একটি অতিশয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে। ইনি সর্বোচ্চ সম্মানসহ এম. ডি. পাস করার পর বিশেষভাবে স্পেশালাইজ করেন কিভাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে রুগীকে সারানো যায়। (আমাদের কবিরাজ ঠাকুমা-দিদিমারা যা করে থাকেন) এবং যারা শীতের দেশে নিরামিষাশী তাদের খাদ্য কিভাবে তৈরি করতে হয়—যাতে করে মাছ-মাংসের অভাব পরিপূরণ করা যায়। ইংরেজ এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বার বার "কুক", "পাচিকা", "রাঁধুনী বামনী", "বাবুর্চী" বলে তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। তিনি প্রায়ই এঁর সঙ্গে ডিনার খেতেন। ভাবটা এই, ছোট জাতের হিটলার—আর "রাঁধুনী", "বাবুর্চী" ছাড়া কার সঙ্গে হৃদ্যতা করবে! এবং সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইংরেজের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং মহিলার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বেবাক ভুলে যায়। এবং ভুলে যায় বলতে, মহিলাতে হিটলারেতে খেতে খেতে "মোচার ঘণ্টে কতখানি গুড় দিতে হয়" সে নিয়ে আলোচনা হত না। আলোচনা হত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিয়ে। ...এবং পূর্বেই বলেছি, লিঙের শিক্ষাদীক্ষা পদমর্যাদা "ভুলে গিয়ে" ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে "ভ্যালে চাকর" নামে তাকে হীন করার চেষ্টা করেছে।...হিটলারের আদেশ সত্ত্বেও তিনি লিঙেরই মতো হিটলারকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। আমার যতদূর জানা, তিনি বার্লিনে নিহত হন। প্রভুভক্তির ফলস্বরূপ।

কারোর—ইনক্যাম-ট্যাক্স অফিসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শক সম্পদ।

আমি কিন্তু দেখছি, এর ট্র্যাজিক দিকটা। পিতামহ ভীষ্মের পরই যে-বীরকে এ-ভারত সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি একচক্রা ভদ্রোত্তম কমাণ্ডর-ইন-চীফ্ ফীল্ড-মার্শাল কর্ণ। তিনি যখন কুরুপ্রাঙ্গণে শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছেন, তখন মাতা কুন্তী তাঁর প্রতি-সাফল্যে কি তাঁর মাতৃগর্ব, মাতৃশ্লাঘা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিতে পারবো না, তবে বাল্যবয়সের আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম গুরু আমাকে সঙ্গোপনে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, মাতা কুন্তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়সন্তান ছিলেন কর্ণ।

এফা ব্রাউনের ঐ একই ট্রাজেডি। সবজনসমক্ষে তিনিও গাইতে পারেন না—"বঁধু তুহাঁরি গরবে গরবিনী হম, রূপসী তুহাঁরি রূপে।"

অভিমানিনী পাঠিকা, তুমি হয়তো শুধোবে, এ-হেন ভণ্ডামীর অপমানজনক পরিস্থিতি এফা মেনে নিলেন কেন? এর উত্তরে আমার নিজের কোনো মন্তব্য না দিয়ে শুধু নিবেদন:

"চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়ে
সারা নিশি কাটাইয়ে
প্রভাতে এসেছ, শ্যাম,
দিতে মনোবেদনা॥"